ভূমিকা

আমাদের দেশের বর্তমান মাধ্যমিক শিক্ষাব্যবস্থা পর্যবেক্ষণের [illegible] এক শিক্ষাবিদকে প্রশ্ন করা হইয়াছিল—নূতন পাঠ্যসূচী গুরুভার বলিয়া দেশের সর্বত্র অভিযোগ উত্থাপিত হইয়াছে; আপনারও কি তাহাই মনে হয়? তিনি কিছু চিন্তা করিয়া উত্তর দিয়াছিলেন—both yes and no, হাঁ এবং না—দুই-ই। অর্থাৎ syllabus cover করার প্রশ্ন হইলে—সত্যই গুরুভার আর যদি syllabus শেখানোর কথা হয়, তাহা হইলে নিশ্চয় গুরুভার নয়। কথাটি প্রণিধান-যোগ্য।

আমেরিকায় দেখিলাম শ্রেণীশিক্ষায় প্রায় প্রতি পিরিয়ডের শেষে কিছু সময় ফিল্ম দেখানো ও আলোচনার জন্য নির্ধারিত রাখা হইয়াছে। এগুলি সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচী-অনুগ ফিল্ম—প্রত্যেক বিষয়ের উপর এই জাতীয় বিভিন্ন ফিল্ম রচিত হইয়াছে। Disney Technique-এর এইরূপ তিনটি ছবিতে একদিন আমাদের আধুনিক বিজ্ঞান-পরিকল্পিত বিচিত্র গঠন ও উহার ভিত্তিতে রসায়ন ও পদার্থবিদ্যার কয়েকটি মূল নীতির চিত্রধর্মী ব্যাখ্যা দেখিলাম। পুঁথির হরফে অধ্যায়ের পর অধ্যায় পড়িয়াও যাহা সুস্পষ্টরূপে ধারণা করিতে পারিতেছিলাম না, হঠাৎ তাহা জীবন্ত সত্যরূপে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। মনের মধ্যে abstract ও concrete-এর সীমারেখা অস্পষ্ট হইয়া গেল। বুঝিলাম—তথ্য বা তত্ত্বের দুরূহতা অনেকটা আপেক্ষিক ব্যাপার। তাহার পিছনে যে ভাব বা ধারণা বর্তমান, এবং যাহাই প্রকৃত সত্য, উহা অনেক ক্ষেত্রেই দুরূহ নহে, দুরূহতা রহিয়াছে উহার প্রকাশ-মাধ্যমের মধ্যে, শব্দের কুহেলিকার আবরণে। সকল শিশুরই গ্রহণের ও ধারণার অসীম শক্তি রহিয়াছে, তাহা তাহাদের পাঠ্যাতিরিক্ত কতকগুলি বিষয়ে অনুরাগের ব্যাপ্তি ও গভীরতা হইতে বোঝা যায়। কিন্তু শিশু যে হৃদয়-মন দিয়া গ্রহণ করিবে তাহাই যদি প্রথমে মুখভার করিয়া বসে তবে সেই বিলাতী প্রবচনের কথাই মনে হয়—ঘোড়াকে জলের সান্নিধ্যে লইয়া যাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে জল পান করানো চলে না।

জ্ঞ বিজ্ঞান রচনায় ইহাই লেখকের মূল প্রেরণা অর্থা[illegible]
যাহে শিশুর নিকট সবপ্রকার অস্পষ্টতা-মুক্ত, স্বয়ং-সম্পূর্ণ [illegible]
[illegible] সর্বোপরি আকর্ষণীয় করিতে হইবে। জ্ঞানের পসরা [illegible]
[illegible]দার পুঁথির পাতায়, বক্তৃতা-আলোচনায় ছড়াইয়া রহিয়াছে, কিন্তু
তাহা [illegible] গ্রহণ করিবার জন্য শিশুর মাথাব্যথা কোথায়? গল্পচ্ছলে, সরস
ভঙ্গীতে, একটি সমস্যার ক্রম-উন্মোচনের কৌতূহল ও বিস্ময়ের পটভূমিকায়
বিজ্ঞানের সত্যগুলি শিশুর মনের দুয়ারে উপস্থিত করিতে পারিলে তবেই
তাহাদের সাদর অভ্যর্থনা ঘটে। প্রসঙ্গতঃ, প্রদর্শনী (exhibition) ও ধাঁধার
(quiz) আঙ্গিকের উল্লেখ করিয়া বলা যাইতে পারে—সেখানে পুরাণো
তথ্যও উপস্থাপনার কৌশলে নূতন সত্যের আলোকে প্রদীপ্ত [illegible],
বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত সমস্যার ঈষৎ-আভাসিত রহস্য-ঘেরা, সকৌতুক চ্যালেঞ্জ
আমাদের মনের সমস্ত সঙ্কল্প ও শক্তিকে সন্দীপিত করিয়া তোলে

নানা কারণে (তাহার মধ্যে অধীত বিষয়ের অস্পষ্টতা [illegible]
ভাবিয়া দেখা প্রয়োজন) আজ শুধু অপরের সাহায্য ও নিজের [illegible]
উপর নির্ভর করা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের এক সংক্রামক ব্যাধি হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। তাই শিক্ষককে প্রতি পদে শিশুর হাত ধরিয়া পথ দেখাইয়া
চলিতে হয়—syllabus COVER করিতেই তাঁহার সমস্ত শক্তি ও সময়
অতিবাহিত হইয়া যায়, শ্রেণীশিক্ষার সম্পূরক ও পটভূমি হিসাবে ব্যাপকতর
শিক্ষাপ্রয়াসের অবকাশ শিক্ষক বা শিক্ষার্থীর থাকে না। এই পর-নির্ভর
শিক্ষায় আনন্দ ও স্বাধীন চিন্তার প্রাণরসে বঞ্চিত হইয়া শিশুর মনও
পরিপুষ্ট ও পরিণত হইয়া উঠিতে পারে না।

বিজ্ঞান কতকগুলি বিচ্ছিন্ন তথ্য, সংজ্ঞা বা সূত্রের একত্র সমাবেশমাত্র
নহে—উহাদের আশ্রয় করিয়া, কিন্তু উহাদের ঊর্ধ্বে, বিজ্ঞান একটি মানসতা
বা দৃষ্টিভঙ্গী, যাহা প্রাকৃত-জগতের সমস্ত বস্তু ও ঘটনাবলীকে কার্যকারণ-
সূত্রের ঐক্যবন্ধনে গ্রথিত একটি অখণ্ড, বুদ্ধিগ্রাহ্য সত্তারূপে প্রত্যক্ষ করে।
এই মানসতা ক্রমশঃ পরিণতি লাভ করিয়া জীবনের সকল কার্যে ও চিন্তায়
সঞ্চারিত হয়—বিজ্ঞান হইয়া উঠে জীবন-দর্শন। বিজ্ঞানের এই স্বরূপ ও
ভূমিকার উপলব্ধি ধীরে ধীরে, ক্রম-পরিণতির মধ্য দিয়া শিশুর মনে বিকশিত

হইলেও প্রথম হইতেই এই উদ্দেশ্যে শিশুকে একমাত্র বি... অন্যদিকে সব কিছু গ্রহণ করিবার সুযোগ ও শিক্ষা দিতে হইবে।

গৃহের পরিবেশ ও আবেষ্টনী হইতে বিজ্ঞান-শিক্ষার ক্ষেত্র ... পর্যন্ত প্রসারিত। প্রতিপ্রভ আলো (fluorescent light), প্রে..., ইলেকট্রিক ট্রেণ, জেট-প্লেন, স্পুটনিক, গ্রহান্তরে যাত্রা এখন রোজ আলোচনার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আমাদের নিত্যদিনের জীবনে বিজ্ঞান নিজেকে কখনও এমন নিবিড়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নাই; শিশুর মনের জগতেও তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার ইহাই পরম সুযোগ।

সাধারণ বিজ্ঞান (General Science) এই শুভ আদর্শ ও সঙ্কল্পের বাহন হইয়া আজ বিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচীতে অবশ্যপাঠ্য বিষয়রূপে অধিষ্ঠিত হইয়াছে; শুধু ছাত্রছাত্রীদের জন্যই বা কেন, তাহাদের শিক্ষার ভোজে একত্র আসন-গ্রহণকারী পিতামাতা, অভিভাবক—সকলের জন্যই বোধ হয় সাধারণ বিজ্ঞানের এই আমন্ত্রণ। কারণ এই বিজ্ঞান প্রতিটি মানুষের সমগ্র জীবনে বিধৃত হইয়া রহিয়াছে, ইহা আমাদের প্রাত্যহিক জীবনের পথ-চলার পাথেয়-বিশেষ, আমাদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে ইহার নীতি আমাদের প্রতিটি কার্য প্রভাবিত করিতেছে। তাই আবার বলিতেছি, এ বিজ্ঞানের আলোচনাকে জীবনের সহজ, স্বচ্ছন্দ গতির ন্যায়ই সাবলীল ও অনায়াসলভ্য করিতে হইবে, যেন শিশু ছাড়াও শিশুর শিক্ষা-অভিযানে সহযাত্রী সকলেই ইহার পূর্ণ সম্পদ আহরণ করিতে পারেন। তাই বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ করিয়া পাঠ্যপুস্তক হইলেও ইহার আবেদনের সর্বজনীনতার প্রতি দৃষ্টি রাখা হইয়াছে।

বিজ্ঞান-শিক্ষা মূলতঃ পাঠ্যপুস্তকের বিষয় না হইলেও এখানে পাঠ্য-পুস্তকের স্থান নগণ্য নহে। বিজ্ঞান-সেবার যুগসঞ্চিত ফল, বিজ্ঞান পাঠের নীতি ও পদ্ধতি, বিজ্ঞান-সাধনার নিষ্ঠা ও প্রেরণা—সকলই পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর অন্তরে আভাসিত হইতে পারে। তারপর—বিদ্যালয়ের গণ্ডী ছাড়িয়া পুস্তকই শিশুর পরিণত জীবনের বিজ্ঞান চর্চা ও চর্যার প্রধান অবলম্বন হইবে। তাই পুস্তকের সহিত শিশুর হৃদয়ানুভূতি যদি প্রথম হইতেই অনুকূল সম্পর্কে জড়িত হয় এবং বিজ্ঞান অনুশীলনের প্রধান আদর্শ ও

গুলি যদি পুস্তকের মাধ্যমে শিশুর চিত্তে প্রতফলিত করিতে পারা যায়, তবে শিশুর বিজ্ঞান-জীবনের শুভ উদ্বোধন ঘটিবে, সন্দেহ নাই।

দীর্ঘকাল ট্রেণিং কলেজে শিক্ষণ-শিক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীগণের সহিত বিজ্ঞান-শিক্ষণের নীতিগুলির আলোচনা করিয়াছি এবং সেই নীতিগুলির এক বৃহৎ অংশের রূপায়ণ যে পাঠ্যপুস্তকের পটভূমিতে সম্ভব—ইহা অনুভব করি। কিন্তু সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান প্রচেষ্টার দুরূহতাই পদে পদে প্রবল হইয়া লেখককে অভিভূত করিয়াছে। তথাপি অভীপ্সিত পথে আমাদের পদসঞ্চারের ভিতর দিয়া জাতির শিক্ষা-অভিযানে এক নূতন দিগন্তের সন্ধান মিলিতে পারে—এই বিশ্বাস লেখকের চেষ্টায় প্রেরণা যোগাইয়াছে।

উপরিউক্ত লক্ষ্যগুলির চরিতার্থতা বিধানের প্রয়াসে পুস্তকটি রচনায় যে উপায় বা পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে নিম্নে তাহাদের কয়েকটি নির্দেশ করা হইল :—

ক। বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ডায়নামো, টেলিফোন প্রভৃতি যন্ত্রগুলির কার্যপ্রণালী, বা যে কোনও সমস্যামূলক বিষয়ের নীতিগুলি, সোজাসুজি বর্ণনা বা ব্যাখ্যা না করিয়া অবরোহী প্রণালীতে পূর্ব-অধীত প্রাথমিক নীতিগুলি হইতে ধাপে ধাপে (কল্পিত পাঠকের সহযোগিতায়) উহাদের আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। 'পরীক্ষা' ও 'পর্যবেক্ষণ'-এর ভিত্তিতে 'সিদ্ধান্ত' গ্রহণ ও 'সামান্যীকরণ'-এর (generalization) বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিও নমুনা হিসাবে একটি ক্ষেত্রে নির্দেশিত হইয়াছে (৭৮ পৃষ্ঠা)।

খ। যেখানেই সম্ভব, আলোচ্য বিষয়-প্রসঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যাপক ও বৃহৎ তথ্যগুলি ('big facts' of science) সংকলন করিয়া উহাদিগকে পাঠকের মনের সম্মুখে তুলিয়া ধরা হইয়াছে। যেমন, প্রাণি জগতে 'দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য' (bilateral symmetry), প্রাকৃত-জগতে 'streamlining'-এর নীতি, প্রাণিজগতে ভাইটামিনগুলির জীবন-ভিত্তিক ভূমিকা ইত্যাদি।

গ। আলোচনার সর্বত্র, উপযুক্ত স্থানে, পূর্ব বা পরের পৃষ্ঠা ও চিত্রের উল্লেখ করিয়া সদৃশ বিষয়গুলি সম্পর্কান্বিত করিয়া দেখাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে (cross references)।

ঘ। সম্ভবস্থলে পারিভাষিক শব্দগুলি পাঠককে যান্ত্রিকভাবে শিক্ষা

ভূমিকা

অধ্যায় উত্তীর্ণ হইতে সাহায্য করে। ২৫৮ খানি চিত্রে (ইহাও হয়তো নহে) এই আলোচনার রূপদানের চেষ্টা করা হইয়াছে।

এই প্রয়াসে আমার প্রীতিভাজন বন্ধু, চিত্রশিল্পী শ্রীরামকৃষ্ণ দত্ত আমার পূর্ণ সহযোগিতা করিয়াছেন, সেইজন্য তাঁহাকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি। সবিশেষে ওরিয়েন্ট লংম্যান্স-এর কর্তৃপক্ষ ও কর্মী, বিশেষ করিয়া ইহার প্রকাশন বিভাগের শ্রীপরিমল হোম—যাঁহারা আমাকে অকুণ্ঠিতচিত্তে সর্ববিধ সুযোগ ও সুবিধাদান করিয়া সযত্নে আমার প্রচেষ্টার বাস্তব রূপায়ণ করিয়াছেন, তাঁহাদের সকলকে আমার অন্তরের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

টিচার্স ট্রেণিং কলেজ,
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
২১শে ডিসেম্বর, ১৯৬৩

[illegible]কার

পৃষ্ঠা

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ

দ্বিতীয় ভাগ

সহজ বিজ্ঞান

প্রথম ভাগ

প্রথম অধ্যায়

বলবিদ্যা (Mechanics)

কাজ (Work)

কাজ কাহাকে বলে

সাধারণ ভাষায় কোনও উদ্দেশ্য লইয়া কিছু **করাকে কাজ বলে।** যেমন—বই পড়া, মাছ ধরা, রান্না করা প্রভৃতি। ইহাদের আবার দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—শারীরিক ও মানসিক। বিজ্ঞানের ভাষায় কিন্তু **কাজ**-এর একটি বিশেষ অর্থ আছে। এখানে অবশ্য শারীরিক কাজই বোঝায়, কিন্তু একটি নির্দিষ্ট অর্থে। **যখন আমরা কোনও বস্তুকে টানিয়া বা ঠেলিয়া এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাই তখনই আমরা কাজ করি।** ব্যাপারটি আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

কাজের পরিমাণঃ কাজ কঠিন বোধ হয় কেন

ক। **ওজন**—বস্তু বলিলেই একটি স্থূল পদার্থ বোঝায়—সুতরাং উহার **ওজন** আছে। এই ওজন জিনিসটি কি? পৃথিবী সকল বস্তুকেই তাহার কেন্দ্রের দিকে **আকর্ষণ** করিতেছে। ইহাকে আমরা **অভিকর্ষ** (gravity) বলিয়া থাকি। ইহার বিপরীত দিকে বস্তুটিকে নড়াইতে হইলেই **বল** (force) প্রয়োগ বা আয়াস (চেষ্টা) করিতে হইবে এবং তখনই কাজ করা হইবে। মনে কর চৌবাচ্চা বা কুয়া হইতে এক বালতি জল তুলিতেছ। এখানে

জলভরা বালতির ওজন যত বেশী হইবে, তোমার কাজ করাও তত কঠিন মনে হইবে। খুব বেশী বড বালতি হইলে হয়তো তুমি তুলিতেই পারিবে না।

আরও একটি বিষয় লক্ষ্য কর। একটি বড বালতিকে কুয়ার ভিতর হইতে উপরে তোলা এবং একটি ছোট বালতিকে ঐ ভাবে তোলা—সমান **পরিমাণ** কাজ হইবে না। বড বালতির ক্ষেত্রে বেশী কাজ করা হইবে। আবার যদি একই বালতিকে একবার গভীর কূয়া হইতে এবং আর একবার অগভীর কূয়া হইতে জল ভরিয়া তোলা যায়—তাহা হইলেও দুইটি ক্ষেত্রে একই পরিমাণ কাজ করা হইবে না, গভীর কূয়ার বেলায় বেশী কাজ করা হইবে, কারণ একই ওজনকে বেশী দূরত্বে লইয়া যাওয়া হইয়াছে, যদিও কাজটি পূর্বের চেয়ে বেশী **কঠিন** বোধ হইবে না। ইহা হইতে আমরা বুঝিতে পারি—

কাজের পরিমাণ = বল (এখানে ওজন) × **দূরত্ব**
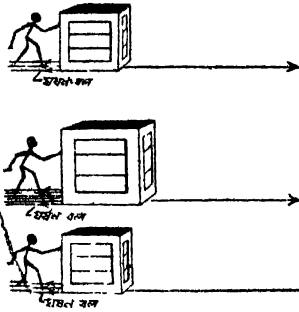
চিত্র নং ১ : প্রথম ক্ষেত্রে তৃতীয় ক্ষেত্রের অর্ধেক পরিমাণ কাজ করা হইতেছে ; দ্বিতীয় ক্ষেত্রে কাজের পরিমাণ তৃতীয় ক্ষেত্রের সমান, কিন্তু দ্বিগুণ কঠিন

সুতরাং (১) বলের পরিমাণ বাডাইয়া এবং দূরত্ব কমাইয়া, বা (২) বলের পরিমাণ কমাইয়া এবং দূরত্ব বাডাইয়া—উভয় প্রকারেই সমান পরিমাণ কাজ করা যায়, কিন্তু প্রথম ক্ষেত্রে কাজটি বেশী **কঠিন** বোধ হইবে কারণ শক্তি প্রয়োগ করিতে হইবে অধিক।

উপরোক্ত সূত্র হইতে আরও একটি কথা আমরা বুঝিতে পারি—

(১) একটি অতিরিক্ত ভারী বস্তুকে টানিয়া বা ঠেলিয়া আমার ক্ষমতায় সরাইতে না-ও পারি—ইহাতে পরিশ্রম কম হইল না, কিন্তু বিজ্ঞানের ভাষায় ইহাকে কাজ করা বলা চলিবে না।

(২) আবার মনে কর, হাতে একটি ভারী ব্যাগ লইয়া রেলের টিকিট ঘরের সামনে প্রায় এক ঘণ্টা "কিউ" (queue) করিয়া দাঁড়াইয়া আছ—ইহাতেও পরিশ্রম কম হয় না জানো, কিন্তু ভারটি হাত হইতে একই স্থানে একই ভাবে ঝুলিতে থাকিলে কাজ করা হইল না। উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী এই উভয় ক্ষেত্রে দূরত্ব হইল শূন্য (0) সুতরাং—

কাজ = বল (ওজন) × 0 অর্থাৎ 0 বা কিছুই নহে।

তাহা হইলে দেখ—বল বাড়িলে কাজের পরিমাণ বাড়ে, আবার দূরত্ব বাড়িলেও কাজের পরিমাণ বাড়ে। যদি অল্প ওজন বেশী দূর টানিয়া লইয়া যাই তাহা হইলে যে কাজ হইবে, বেশী ওজন অল্প দূর লইয়া গেলেও একই পরিমাণ কাজ হইবে। কিন্তু দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুটির বেশী ভারের জন্য বল প্রয়োগ করিতে হইবে বেশী এবং সহজেই পরিশ্রম বোধ বা ক্লান্তি বোধ হইবে। সুতরাং কাজটি বেশী **কঠিন** মনে হইবে, যদিও মোট কাজের পরিমাণ একই থাকিবে।

খ। **ঘর্ষণ**—এইবার মনে কর বস্তুটি শূন্যে না ঝুলিয়া মেঝে বা টেবিলের উপর অবস্থান করিতেছে। ধর একটি কাঠের বাক্সকে ঠেলিয়া ঘরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে লইয়া যাইতেছ। এখানে বাক্সটির ওজনের বিরুদ্ধে তোমাকে বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে না বটে, কিন্তু আর একটি **বাধা** উপস্থিত হইয়া তোমার কাজকে কঠিন করিতেছে। ওজনের ন্যায় ইহাও এক প্রকার **বল**। ইহা হইল—বাক্সের তলা ও মেঝের মধ্যে **ঘর্ষণ** (friction)। এই ঘর্ষণ একটি বস্তুকে অপর একটি বস্তু স্পর্শ করিয়া চলিয়া যাইতে বাধা দেয়। ইহার মধ্যে একটু মজার ব্যাপার আছে। অভিকর্ষ সব সময় একই দিকে অর্থাৎ পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টান দিতেছে। কিন্তু ঘর্ষণ যে কোনও দিকে বাধা দিতে পারে। বাক্সটিকে উত্তর দিকে টানিয়া বা ঠেলিয়া লইয়া যাও—ঘর্ষণ উলটা টান মারিবে, আবার বাক্সটিকে দক্ষিণ দিকে সরাইলে ঘর্ষণ উত্তর দিকে টান দিবে। অর্থাৎ সব সময় তোমার কাজে পূর্ণ বিরোধিতা করার জন্যই যেন এই ঘর্ষণের চেষ্টা।

সাধারণ বুদ্ধিতে বোঝা যায়—বস্তু দুইটির মধ্যে যত বেশী স্থান পরস্পর

স্পর্শ করিয়া থাকিবে ঘর্ষণ ততই প্রবল হইবে। নৌকার মত বাঁকা তলদেশ—এরূপ বস্তুকে অপেক্ষাকৃত সহজে মেঝে বা টেবিলের উপর দিয়া নড়ানো যাইবে, কারণ উহা অল্প স্থানের উপর টেবিল বা মেঝেকে স্পর্শ করিবে। আবার পরস্পর-সম্বদ্ধ তল দুইটি যতই মসৃণ হইবে ঘর্ষণও তত কম হইবে। এই উভয় কারণে **স্লেজ গাড়ীকে বরফের উপর দিয়া দ্রুত গতিতে টানিয়া লইয়া যাওয়া সহজ হয়।**

চিত্র নং ২ : স্লেজ গাড়ী—তলদেশ কত অল্প স্থানে বরফকে স্পর্শ করিয়া আছে দেখ

আবার সাধারণভাবে ঘষিয়া না লইয়া গড়াইয়া লইয়া গেলেও এক প্রকার **আবর্ত-ঘর্ষণ** (rolling friction) হয় বটে, কিন্তু তাহার শক্তি যে অনেক কম তাহা আমরা সাধারণ অভিজ্ঞতা হইতে জানি। ইহার একটি সহজ পরীক্ষা করা যাইতে পারে—
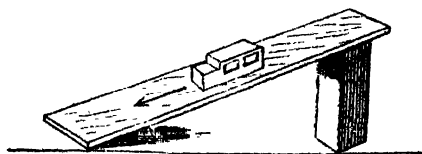
চিত্র নং ৩ : চাকার জন্য প্রথম ক্ষেত্রে গাড়ীটি কত অল্প হেলাইলে গড়াইয়া যায়

পরীক্ষা : একটি কাঠের পাটা বা কাচের শিটের (sheet) উপর একবার একটি চাকা-দেওয়া খেলনা গাড়ী ও আর একবার একটি চাকাবিহীন গাড়ী (মোটামুটি

একই ওজনের) রাখিয়া আস্তে আস্তে পাটা বা শিটুটিকে হেলাইয়া দেখ। অল্প একটু হেলাইলে চাকা দেওয়া গাড়ীটি গড়াইয়া যাইবে। চাকাবিহীন গাড়ীটিকে ঐ ঢালু তলের উপর দিয়া পিছলাইয়া নামিয়া যাইতে হইলে পাটা বা শিটুটিকে অনেক বেশী কাৎ করিতে হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ঘর্ষণ বল অনেক বেশী হওয়ার জন্যই চলনে বিলম্ব হয়। একটি অনুভূমিক (horizontal) তলের উপরও প্রথম চিত্রের ন্যায় ব্যবস্থা করিয়া ঘর্ষণ বলের তারতম্য পরীক্ষা করা যায়। এই জন্যই
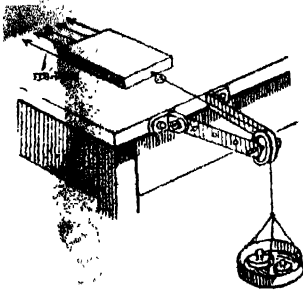
চিত্র নং ৪ : বইখানি ঘসিয়া টানিতে কত বেশী বল লাগে
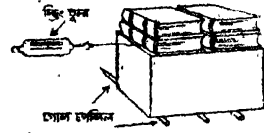
চিত্র নং ৫ : এতগুলি বইও বাক্স-সমেত গড়াইয়া লইতে বেশ কম বল লাগে

চাকার ব্যবহার। ঘর্ষণ যদি আরও কমাইতে চাই তাহা হইলে
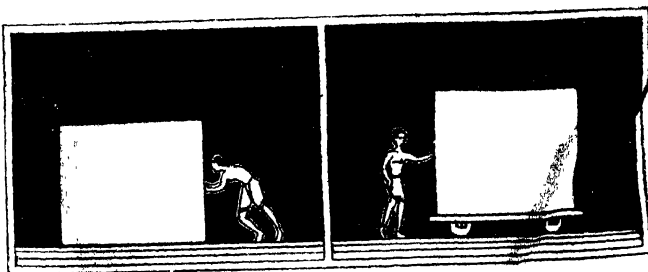
চিত্র নং ৬ : চাকার আবর্ত-ঘর্ষণ কম তাহা সহজেই বুঝা যায়

একপ্রকার "চাকার মধ্যে চাকা"র ব্যবহার করিতে পারি। ইহাকে আমরা বল-বেয়ারিং (ball bearing) বলি।

পরীক্ষা: আর একটি ছবিতে দেখ দুইটি টিন একটির উপর একটি রাখিয়া (নীচেরটি উপুড় করা) মধ্যে গোল করিয়া ছোট ছোট মার্বেল সাজাইয়া কেমন সহজ বল-বেয়ারিং তৈরী করা হইয়াছে। এই অবস্থায় উপরের টিনটিকে ঘুরাইয়া দেখ কত সহজেই ঘুরিবে। ঘর্ষণরত অবস্থায় আবার যদি দুই তলের বা বল-বেয়ারিং এর মধ্যে কিছু তৈলজাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যায়—তাহা হইলে ঘর্ষণের বাধা আরও অনেক কমিয়া যাইবে।
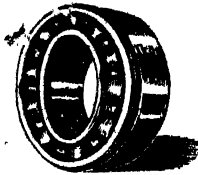
চিত্র নং ৭ : চাকার মধ্যে চাকা—বল-বেয়ারিং

সকল প্রকার যন্ত্রে বিভিন্ন চলমান অংশগুলিতে এজন্য **ল্যুব্রিকেটিং তৈল** (lubricating oil) ব্যবহার করা হয়। ইহা একান্ত আবশ্যক। ইহার অভাবে যন্ত্রের অংশগুলি ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে গরম ও জখম হইয়া পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যাইত। মোটর গাড়ীতে এজন্যই সব সময় ইঞ্জিন অয়েল (engine oil) বা **"মবিল অয়েল"** (mobil oil) ঠিক পরিমাণ আছে কি না দেখিয়া তবে গাড়ী চালাইতে হয়।
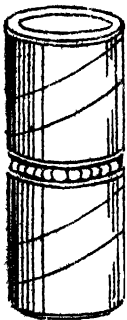
চিত্র নং ৮ : সহজ বল-বেয়ারিং

ঘর্ষণের সুবিধা—ঘর্ষণের অবশ্য সুবিধাও আছে। ঘর্ষণ-জাত উত্তাপের জন্যই দিয়াশলাই ও **সিগারেট লাইটার**-এ সিগারেট জ্বালানো সম্ভব হয়। রেলগাড়ী যে চলে তাহাও ইঞ্জিনের চাকা ও রেলের লাইনের মধ্যে ঘর্ষণের বাধার জন্য—নচেৎ চাকা পিছলাইয়া আলগাভাবে ঘুরিয়াই যাইত এবং গাড়ী চলিত না।

গ। **জাড্য** (**inertia**)—গ্রীষ্মের ছুটিতে বেশ কিছু দিন পড়াশুনা বিসর্জন দিয়া ঘুমাইয়া কাটাইবার পর যখন স্কুল খোলে এবং **হঠাৎ** আবার পড়াশুনার তাগিদ আসে তখন কিছুতেই কাজে মন বসিতে চায় না। আবার, যখন কোনও কাজে (বা খেলায়) মাতিয়া উঠিয়াছ তখন সে কাজ ছাড়িয়া হঠাৎ চলিয়া আসাও মনের দিক হইতে **মস্ত বড়** বাধা বলিয়া বোধ হয়। অর্থাৎ সাধারণভাবে বলিতে গেলে—**যখন যে অবস্থায়**

থাকা যায়, বরাবর সেই অবস্থায় থাকিয়া যাইবার জন্য প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক প্রবণতা আছে। বস্তুর এই স্বভাবকে জাড্য (inertia) বলে। স্থূল বস্তুজগৎ সম্বন্ধে এ কথা বিশেষ করিয়া সত্য। একটি নিশ্চল বস্তু আপনা হইতে কিছুতেই নড়িবে না (স্থিতি জাড্য) (inertia of rest), আবার চলমান অবস্থা হইতেও থামিতে চাহিবে না (গতি জাড্য) (inertia of motion)। মোটর বা রেলগাড়ীকে থামা অবস্থা হইতে চলিতে শুরু করাইতে ইঞ্জিনকে যথেষ্ট শক্তি প্রয়োগ করিতে হয়। কিন্তু একবার চলিতে আরম্ভ করিলে তখন উহাকে টানা সহজ হইয়া পড়ে। তেমনি আবার চলন্ত অবস্থা হইতে হঠাৎ থামানো এক সমস্যার ব্যাপার। যদি বা জোরে ব্রেক (brake) করিয়া গাড়ী থামানো গেল গাড়ীর সহিত চলমান তোমার শরীর হঠাৎ থামিতে না পারায় তুমি হুমড়ি খাইয়া সামনের দিকে পড়িলে। নিউটন (৯ পৃষ্ঠায় ছবি) এই নীতিকে এক মহাসত্যের সূত্রের আকারে বিধিবদ্ধ করিয়াছিলেন—
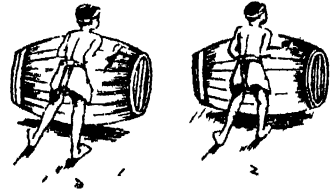
চিত্র নং ৯ : স্থিতি জাড্য—প্রথম ক্ষেত্রে পিপাটিকে স্থিতিশীল অবস্থা হইতে নড়াইতে কত বেশী বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে

নিউটনের সূত্র : কোনও বস্তু যদি বাহিরের কোনও বল (force) দ্বারা প্রভাবিত না হয় তাহা হইলে উহা অনন্ত কাল ধরিয়া স্থির অবস্থায় বা গতিশীল অবস্থায় থাকিয়া যাইবে।

একটি বল মেঝের উপর রাখিয়া দিলে উহা আপনা হইতে অনন্ত কাল ধরিয়া ঐ একই স্থানে স্থির ভাবে বসিয়া থাকিবে। তেমনি উহাকে গড়াইয়া দিলেও অনন্তকাল ধরিয়া গড়াইয়াই যাইবে। তবে যে আমরা দেখি উহা কিছুদূর গিয়া থামিয়া যায়? এখানেও ঐ ঘর্ষণ বলের ব্যাপার। মেঝের সহিত ঘর্ষণ, বাতাসের সহিত ঘর্ষণ—বলের গতির বিরোধিতা করিয়া উহাকে শেষ পর্যন্ত থামাইয়া দেয়।

একটা রসিকতা আছে যে—তলোয়ার চালাইতে কোন ওস্তাদ যে ক্যাচ করিয়া মাথাটা কাটিয়া ফেলিলেও মাথাটি কাঁধের উপর বেমালুম বসিয়াই

থাকিবে। উহা বৈজ্ঞানিকভাবে অতি সত্য কথা। যদি বিদ্যুৎগতিতে ক্ষুরধার তলোয়াব দিয়া অব্যর্থ সন্ধানে কাহারও মাথা কাটিয়া ফেলা যায় (অবশ্য প্রকৃত মাথার উপব পবীক্ষা না কবিয়া কলা গাছের উপবই পরীক্ষা
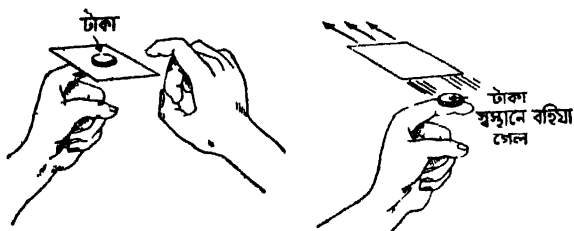
চিত্র নং ১০ : স্থিতিজাড্য—কার্ডটি হঠাৎ ছুটিয়া বাহির হইয়া যাওয়ায় মুদ্রাটি স্বস্থান ত্যাগ করে নাই

করা ভাল) তাহা হইলে ঐ স্থিতি জাড্যের জন্য মাথাটি ঘাড় হইতে খসিয়া পড়িবে না। ছবিতে দেখ—রাইফেলের গুলি একটি ছোট টিনের গা ভেদ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু টিনটির তাহাতে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে তাহার স্থিতি জাড্য লইয়া ঠিক এক জায়গায় বসিয়া আছে।
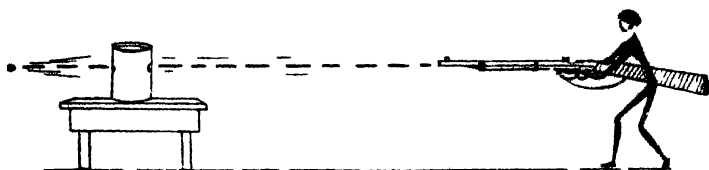
চিত্র নং ১১ : স্থিতি জাড্য—রাইফেলের গুলি টিনটিকে স্থানচ্যুত করিতে পারে নাই

মহাকর্ষ (Gravitation)

মহাকর্ষ কি

গাছ হইতে মাটিতে আপেল বা আম পড়া অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু মহামনীষী নিউটনের দার্শনিক চিত্তে এই চিরন্তন ব্যাপার পরম আশ্চর্য বলিয়া বোধ হইল: আপেল মাটিতে না পড়িয়া আকাশের দিকেও তো যাইতে পারিত। তুমি বলিবে এ আবার কি আজগুবি

কথা! জিনিস শূন্য হইতে নীচের দিকে যাইবে না তো উপরের দিকে উঠিবে না কি? কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে অসীম আকাশে নীচে, উপরে বলিয়া কিছু নাই। মাটির দিকটাকেই আমরা "নীচে" বলিয়া থাকি কারণ, এই দিকে প্রত্যেক বস্তুর ছুটিয়া যাইবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু মনে কর—পৃথিবী হইতে দূরে, বহুদূরে, অনন্ত শূন্যে চলিয়া গিয়াছ—চন্দ্রলোকের কাছে। এখন পৃথিবী মহাকাশে একটি চন্দ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছে। এদিকে চন্দ্র তোমার পায়ের কাছে ছোট্ট পৃথিবীর রূপ নিয়াছে। এখন কোনটি উপরের দিক, কোনটি
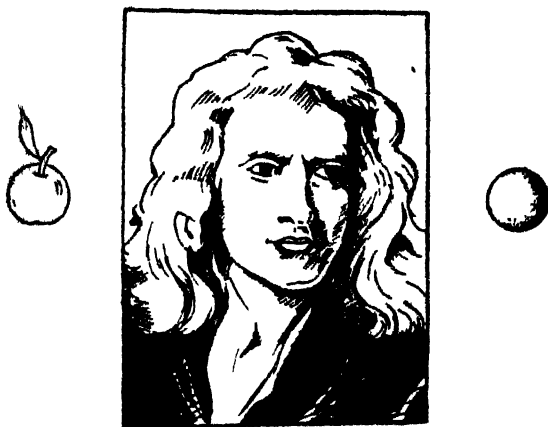
চিত্র নং ১২ : নিউটন এবং তাঁহার আপেল ও পৃথিবী

নীচের দিক বলিবে? চন্দ্রের কাছে আসিয়া পড়িলে ঠিক পৃথিবীর মতই তোমার চাঁদের দিকে পড়িয়া যাইবার প্রবণতা আসিবে এবং তোমার পূর্ব ধারণা অনুযায়ী চাঁদের দিকটাই তখন 'নীচে' বোধ হইবে। সুতরাং মহাবিশ্বে নীচে উপরে বলিয়া কিছুই নাই বুঝা গেল। এবার নিউটন ঠিকই কল্পনা করিয়াছিলেন যে—মাটিতে আপেল পড়ার পিছনে প্রাকৃত জগতের কোনও মহাসত্য লুকানো আছে। আমরা এখন জানি এই মহাসত্য হইল—**মহাকর্ষ**। পৃথিবী প্রত্যেক বস্তুকে তাহার কেন্দ্রের দিকে আকর্ষণ করিতেছে, ইহাকে **অভিকর্ষ** (gravity) বলে জানি। এইরূপ

সৌরজগতের প্রত্যেকটি বস্তু—সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, পরস্পরের মধ্যে এই আকর্ষণ-বল কাজ করিতেছে। শুধু বা সৌরজগৎ কেন? সৌরজগতের বাহিরে, সমগ্র বিশ্বে, অগণিত গ্রহ-তারকা, ভ্রাম্যমান বস্তু—সকলের মধ্যে ঐ একই শক্তি একই ভাবে কাজ করিতেছে। নিউটন এই মহাসত্যকে একটি সরল, সুনির্দ্দিষ্ট সূত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন—
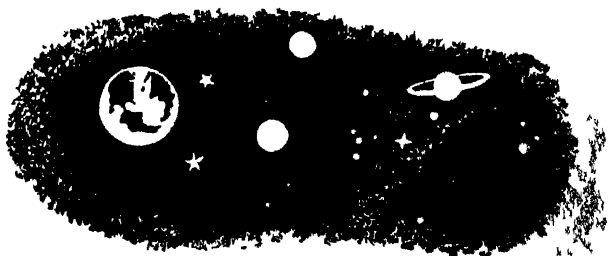
চিত্র নং ১৩ : মহাবিশ্বে নীচে উপরে বলিয়া কিছু নাই

নিউটনের সূত্র ঃ মহাবিশ্বের ছোট বড সকল বস্তু বা বস্তুর কণিকা অপর প্রত্যেক বস্তু বা বস্তুর কণিকাকে সরল রেখায় আকর্ষণ করিতেছে। এই আকর্ষণ উভয় বস্তুর ভরের (mass) গুণফলের **সমানুপাতে** বেশী বা কম হয়, আবার উভয় বস্তুর দূরত্বের বর্গের **ব্যস্ত** (inverse) **অনুপাতে**—বাড়ে বা কমে, অর্থাৎ দূরত্ব বাড়িলে আকর্ষণ কমে এবং দূরত্ব কমিলে আকর্ষণ বাড়ে। গণিতের সূত্রে প্রকাশ করিলে দাঁড়ায়—

$$P \propto \frac{m \times m'}{d^2}$$ যেখানে—

P = আকর্ষণ

m, m′ = বস্তু দুইটির ভর

d = বস্তু দুইটির পরস্পরের দূরত্ব

বিশ্বজগৎ মহাকর্ষের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত

এই একই নিয়মের সূত্রে বিশ্বজগৎ তাহার অগণিত গ্রহ-তারকা লইয়া গ্রথিত রহিয়াছে এবং অপূর্ব শৃঙ্খলায় কাজ করিয়া যাইতেছে। আমাদের

নিত্যদিনের সাথী চন্দ্রের পৃথিবী-প্রদক্ষিণের অতি পরিচিত ঘটনাটির সাহায্যে ব্যাপারটি একটু পরিষ্কার করিতে চেষ্টা করা যাক।

পূর্বেই বলা হইয়াছে—জগতের প্রত্যেক বস্তু অপর কোনও বস্তুকে সরল রেখায় একটি নির্দিষ্ট শক্তি দিয়া আকর্ষণ করিতেছে। এই কারণেই আপেল গাছ হইতে সোজা পৃথিবীর উপর নিয়া পড়ে। কিন্তু আকর্ষণ যদি **পরস্পরের মধ্যে** হয় তাহা হইলে আপেলও নিশ্চয় পৃথিবীকে আকর্ষণ করিবে। সত্যিই তাই। অর্থাৎ পৃথিবীও আপেলের টানে আপেলের দিকে আগাইয়া যাইবে। কিন্তু পৃথিবী আপেলের তুলনায় এত বিরাট যে পৃথিবীর এই আগাইয়া যাওয়ার পরিমাণ অতি সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম এবং ইহা হিসাবের মধ্যেই আসে না বলিলে হয়। তাই আমরা দেখি যে আপেলই ছুটিয়া পৃথিবীর বুকে আসিয়া পড়িল। ইহা তো বুঝা গেল। কিন্তু তাহা হইলে চন্দ্র পৃথিবীর টানে উহার উপর পড়িয়া যায় না কেন? সৌরজগতের গ্রহগুলি সম্বন্ধেও একই প্রশ্ন—অর্থাৎ তাহারাও সূর্যের উপর ঝাঁপাইয়া গিয়া পড়ে না কেন? এখানে মনে রাখিতে হইবে যে চন্দ্র স্থির হইয়া নাই, উহা পৃথিবী হইতে জন্মের সময়ই একটি নির্দিষ্ট গতি প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতেছে। একটি দৃষ্টান্ত লও—

মনে কর তোমার হাতে একটি সুতাবাঁধা ঢিল রহিয়াছে। ঢিলটিকে একটু উপরে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলে অভিকর্ষের টানে উহা হাতের উপর আসিয়া পড়িবে। কিন্তু যদি সুতা ধরিয়া উহাকে জোরে ঘুরাইতে থাক তাহা হইলে উহা হাতের উপর না পড়িয়া হাতের চারিদিকে সুতার দৈর্ঘ্যের ব্যাসার্ধ লইয়া ঘুরিতে থাকিবে। সুতা যদি ছিঁড়িয়া যায় তাহা হইলে লক্ষ্য করিলে দেখিবে—কেন্দ্রের টান অন্তর্হিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে, সেই মুহূর্তে ঢিলটি পরিধির উপর যে অবস্থানে ছিল সেই বিন্দু হইতে স্পর্শক ভাবে, (tangentially) সরল রেখায়, একটি নির্দিষ্ট গতিতে ছুটিয়া বাহিরের দিকে চলিয়া যাইবে।

সুতাবাঁধা ঢিলের ঘূর্ণন

এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায় যে, কোনও বস্তু বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিলে তাহার উপর দুইটি গতি কাজ করে—

প্রথম—একটি নির্দিষ্ট দিকে, সরল রেখায়, একটি নির্দিষ্ট গতি (নিউটনের গতি জাড্য জনিত);
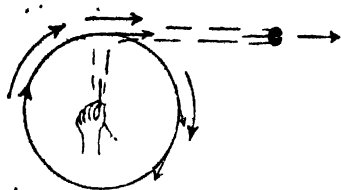
চিত্র নং ১৪ : সুতাবাঁধা ঢিল ঘুরিতে ঘুরিতে ছিঁড়িয়া গেলে যাহা হয়

দ্বিতীয়—প্রথম গতির সহিত লম্বভাবে, আর একটি গতি (অভিকর্ষ জনিত) যাহা ক্রমাগতই বস্তুটিকে তাহার প্রথম গতি হইতে বিচ্যুত করিতেছে।

এই উভয় গতির মধ্যে সামঞ্জস্য হইয়া বস্তুটি বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। কেন্দ্রের দিকের গতি বেশী হইলে বস্তুটি আপেলের মত পৃথিবীর বুকে পড়িয়া যাইবে, স্পর্শক অভিমুখে গতিটি অধিক হইলে
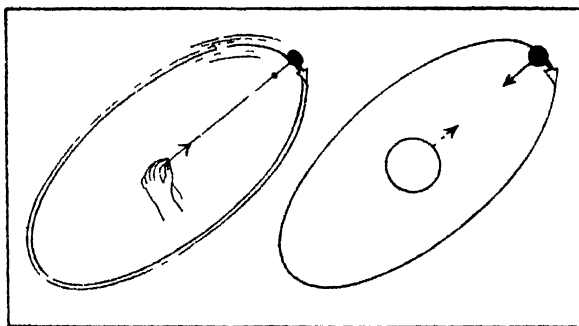
চিত্র নং ১৫ : চন্দ্র যেন ঢিল ও অভিকর্ষ যেন সুতার আকর্ষণ

বস্তুটি পথ ছাড়িয়া বাহিরের দিকে ধাবমান হইবে। চন্দ্রের ক্ষেত্রে এই শেষোক্ত গতির পরিমাণ সেকেণ্ডে প্রায় পাঁচ মাইল অর্থাৎ এই গতিতেই চন্দ্রের দূরত্বে পৃথিবীর যে অভিকর্ষ বল (পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে উহা অনেক কম হইবে) তাহার সহিত সামঞ্জস্য সাধিত হয়। এইবার মনে কর—কোনও বস্তুকে পৃথিবী হইতে একটি নির্দিষ্ট দূরত্বে মহাকাশে লইয়া গিয়া উহাতে পৃথিবীর উপরিতলের সহিত সমান্তরালভাবে অর্থাৎ কেন্দ্রের দিকের সহিত লম্বভাবে একটি উপযুক্ত গতি

সঞ্চারিত করা হইল, তাহা হইলে উহা নিশ্চয় উপরোক্ত নিয়মে বৃত্তাকারে ঘুরিতে থাকিবে। আর ইহাই হইল—**কৃত্রিম উপগ্রহ**।

কৃত্রিম উপগ্রহ

ব্যাপারটি শুনিতে যদিও সহজ মনে হয়, কার্যত উহা সম্পাদন করা অতি কঠিন। কতদিনের চেষ্টার ফলে রাশিয়া জগতের ইতিহাসে এক স্মরণীয় দিনে—১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর—যে তাহার শিশু-চন্দ্রমা Sputnik I-কে অব্যর্থ সন্ধানে নির্দিষ্ট কক্ষপথে ছাড়িতে সক্ষম হইয়াছিল কে জানে? **অভ্রান্ত গণিতের হিসাব, যান্ত্রিক সূক্ষ্মতা, পদার্থ ও রসায়নবিদ্যার অপূর্ব প্রয়োগ** সবগুলি মিলিয়া এই অসাধ্য সাধন সম্ভব করিয়াছে। সমস্যাগুলির একটু আভাস দেওয়া যাক। মহাশূন্যে যাইতে হইলে প্রথম, বাতাসের সীমা ছাড়াইতে হইবে। বাতাসের সীমা পর্যন্ত স্থানকে বলা হয়—**আকাশ** বা শূন্য এবং তারপর শুরু হয় **মহাকাশ** বা মহাশূন্য ইংরাজীতে যাহাকে বলে space এখন বাহন করিতে হইবে **রকেটকে** (rocket) —কারণ এরোপ্লেন, জেটপ্লেন সবই

চিত্র নং ১৬: শিশু চন্দ্রমা তিনটি রকেটের মাথায় চড়িয়া মহাকাশে চন্দ্রের সাথী হইতে চলিয়াছে
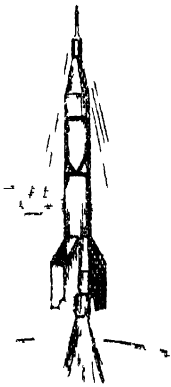
বাতাসের উপর নির্ভর করিয়া। রকেটের অবলম্বন তাহার নিজস্ব **তরল অক্সিজেন** ভাণ্ডার এবং রকেট চলে **হাউই**-এর রীতিতে। প্রচণ্ড চাপ দেওয়া গ্যাসকে পাঠাইয়া সজোরে পিছন দিকে দিয়া বাহির করিয়া দিলে তাহারই উলটা ঠেলায় রকেট দ্রুতগতিতে সামনে আগাইয়া চলে—বাতাসে ভর করিয়া নহে। দ্বিতীয় বিরাট গতি সৃষ্টি—সেকেণ্ডে প্রায় ৫ মাইল বা ঘণ্টায় ১৮ হাজার মাইল। কারণ পৃথিবীপৃষ্ঠের নিকট এই গতিতেই অভিকর্ষের সহিত সমতা আনা যায়। অধিক উচ্চতায় অবশ্য অভিকর্ষের শক্তি কম হইবে এবং ঘূর্ণনবেগও

সেই কারণে কম করিতে হইবে। কিন্তু এ বেগ বাতাসের সীমা সম্পূর্ণ অতিক্রম করিয়া সৃষ্টি করিতে হইবে. নতুবা বাতাসের ঘর্ষণে সব কিছু পুড়িয়া ছাই হইয়া যাইবে। তাই লওয়া হয়—**তিনটি রকেট**। ইহাদের পর পব বিস্ফোরণ ঘটাইয়া ধাপে ধাপে এই প্রচণ্ড গতি সৃষ্টি কবা চলে এবং পব পর রকেটগুলি খসিযা পড়ায় সমগ্র যানটি ক্রমশ হাল্কা হইয়া অনেক উচ্চে যাওয়া সম্ভব হয়। শেষ রকেটটি নির্দিষ্ট দূরত্বে পৌছিয়া, সূক্ষ্ম হিসাবমত কৃত্রিম উপ-গ্রহটিতে ভূমিতলের সহিত সমান্তরাল গতি সঞ্চারিত কবিযা দেয় এবং উপগ্রহটি বৃত্তাকার কক্ষে অবলম্বনহীন ও **ওজনশূন্য** অবস্থায ঘুরিতে থাকে।
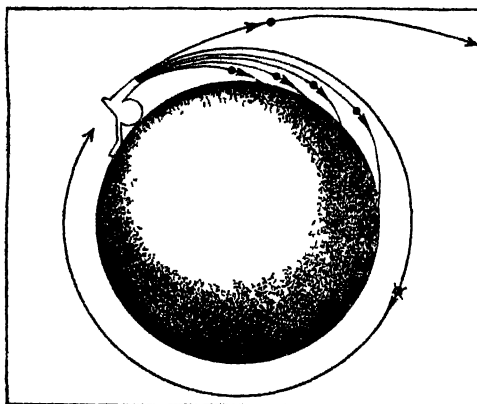
চিত্র নং ১৭ঃ নিউটন মহাকাশে কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপ ও পৃথিবী প্রদক্ষিণ এইভাবে কল্পনা করিয়াছিলেন

আমবা উপরের চিত্রের ন্যায কল্পনা কবিতে পারি—যেন একটি কামান হইতে গোলা বর্ষণ করা হইতেছে। গোলাটির গতি সেকেণ্ডে ৫ মাইলেব বেশী হইলে উহা চিরকালের জন্য পৃথিবীব অভিকর্ষ হইতে মুক্ত হইযা অনন্ত শূন্যে ধাবমান হইবে। আর ৫ মাইলেব নীচে থাকিলে উহার গতিবেগ অনুযায়ী উহা পৃথিবীপৃষ্ঠে কাছে বা দূরে গিযা পড়িবে। কিন্তু যে গোলাটিতে প্রায ৫ মাইল গতিবেগ সঞ্চারিত হইয়াছে উহা আর পৃথিবীপৃষ্ঠে পড়িবে না, পৃথিবীর স্পর্শ এড়াইয়া, পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া উহা যেন ক্রমাগত 'পড়িতে থাকিবে' অর্থাৎ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিতে থাকিবে। এভাবেও আমরা কৃত্রিম উপগ্রহের ঘূর্ণন-রহস্য কল্পনা করিতে পারি।

নিউটনেব কামান

কার্যত, কৃত্রিম উপগ্রহটিকে রকেট-সমষ্টির মাথায় বসাইয়া প্রথমতঃ

লম্বভাবে (অর্থাৎ ভূমির সহিত সমান্তরালভাবে নহে) ঊর্ধ্বে উৎক্ষেপণ করা হয় যাহাতে অতি শীঘ্র বাতাসের ঘনস্তর ভেদ করিয়া নির্দিষ্ট উচ্চতায় পৌঁছিতে পারে। এখানে আর একটি কথা বলিয়া রাখি: আমরা জানি পৃথিবী বিষুববৃত্তের রেখায় ঘণ্টায় প্রায় ১০০০ মাইল বেগে ঘুরিতেছে—পশ্চিম হইতে পূর্বে। সুতরাং বিষুববৃত্তের উপর হইতে কিছু পূর্ব দিকে উপগ্রহটিকে উৎক্ষিপ্ত করা হয়, যাহাতে উহার নিজস্ব গতির সহিত পৃথিবীর এই ঘূর্ণনবেগ যুক্ত হইয়া উহাকে শক্তিশালী করিতে সাহায্য করে।

কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপ
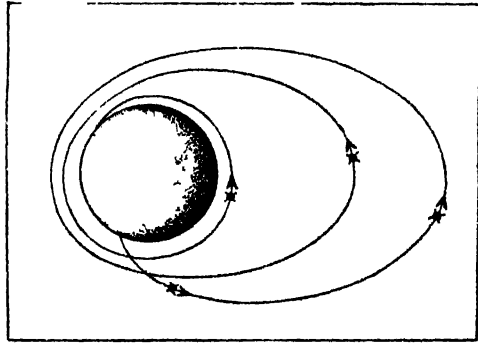
চিত্র নং ১৮: কৃত্রিম উপগ্রহের পুনরায় পৃথিবীপৃষ্ঠে প্রত্যাবর্তন

ইতিমধ্যে রকেটের মধ্যে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রাদির সাহায্যে গতিপথ ক্রমশ বাঁকিয়া যায় এবং **নির্দিষ্ট উচ্চতায় হিসাবমত সমান্তরাল গতি সৃষ্টি করিয়া**
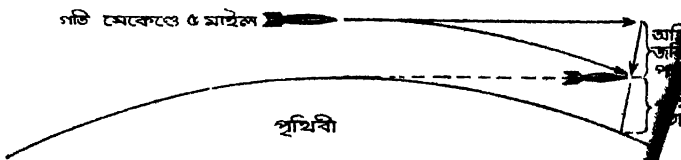
চিত্র নং ১৯: কৃত্রিম উপগ্রহ পৃথিবীপৃষ্ঠে ক্রমাগত পড়িতে পড়িতে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে

শেষ রকেটটি পুড়িয়া খসিয়া পড়ে, আর উপগ্রহটি ঐ গতি লইয়া পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলে। বায়ুমণ্ডলের (ঘনতা যৎসামান্য হইলেও) বাধা, পৃথিবীর উত্তর-দক্ষিণ কিঞ্চিৎ চাপা ইত্যাদি কারণে কক্ষপথ বৃত্তাকার

না হইয়া কিছু উপবৃত্তাকার হয় এবং পথটি ক্রমশ ছোট হইতে হইতে উপগ্রহটি অবশেষে পৃথিবীপৃষ্ঠে নামিয়া আসে বা পুড়িয়া নষ্ট হইয়া যায়।
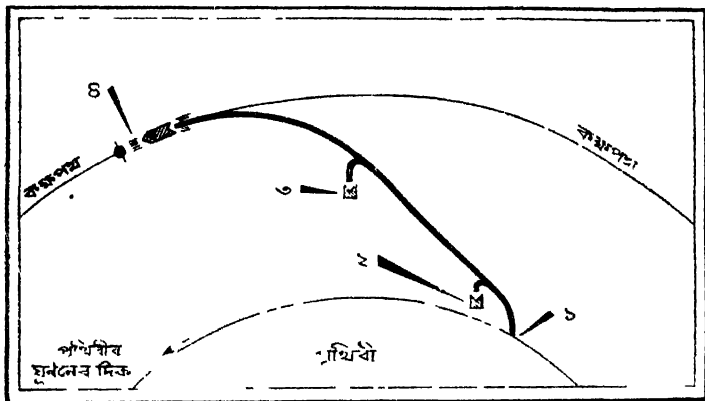
চিত্র নং ২০ : ১—স্পুটনিক ছুড়িবার স্থান, ২,৩—প্রথম ও দ্বিতীয় রকেট খসিয়া পড়িয়াছে, ৪—তৃতীয় রকেট খসিয়া পড়িয়াছে ও স্পুটনিক বাহির হইয়া কক্ষপথ ধরিয়াছে

কৃত্রিম উপগ্রহ ভবিষ্যৎ মানুষের আবিষ্কার ও অভিযান সকল বিরাট সম্ভাবনার দ্বার উন্মুক্ত করিয়াছে তাহার তুলনা নাই। বর্তমানে মহাকাশে রাশিয়া ও আমেরিকার প্রেরিত ১৫।২০টি কৃত্রিম উপগ্রহ স্ব স্ব কক্ষপথে ভ্রমণ করিতে করিতে মহাকাশের নানা অজানা সংবাদ আহরণ করিতেছে। সম্প্রতি দুই বীর রুশ মহাকাশচারী তাঁহাদের দুইটি মহাকাশযানে পাশাপাশি ভ্রমণ করিয়া অসীম আকাশের বুকে একটি নিশ্চিন্ত, আলাপন-মুখর, আনন্দ-উচ্ছল সামাজিক জীবন যাপনের যে দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন তাহাতে মহাশূন্যে অভিযানে যে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হইয়াছে—কোনও সন্দেহ নাই।

জোয়ার-ভাটা

জোয়ার-ভাটা কেন হয়—অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষের নিকট জোয়ার-ভাটা অতি পরিচিত প্রাকৃতিক ঘটনা। জোয়ারের সময় সমুদ্রে এবং নদীতে জলরাশি স্ফীত হইয়া তীর প্লাবিত করে। আবার

ভাটার সময় জলরাশি ধীরে ধীরে নামিয়া সরিয়া যায়। অনেক পূর্বে মানুষ ইহার কারণ জানিত না। এখন আমরা জানি যে **মহাকর্ষই এই ঘটনার পিছনে রহিয়াছে**।

আকাশের গ্রহ-নক্ষত্রগুলি পৃথিবীকে মহাকর্ষের নিয়মে নানাভাবে আকর্ষণ করিতেছে। কিন্তু ইহাদের মধ্যে যে দুইটি বস্তুর প্রভাব সর্বাপেক্ষা প্রবল তাহারা হইল—**চন্দ্র ও সূর্য**। মহাকর্ষের সূত্র অনুযায়ী দুইটি বস্তুর ভর (mass) যত বেশী হইবে উহাদের আকর্ষণও তত বেশী হইবে, আর দূরত্ব যত বেশী হইবে আকর্ষণও তত কমিবে। এই উভয় নীতির মিলন ঘটিয়া দেখা যায় পৃথিবীর উপর সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের আকর্ষণের প্রায় অর্ধেক। নীচের চিত্রে দেখ (বুঝিবার সুবিধার জন্য পৃথিবীপৃষ্ঠকে সম্পূর্ণ জলে আবৃত করিয়া দেখানো হইয়াছে)—
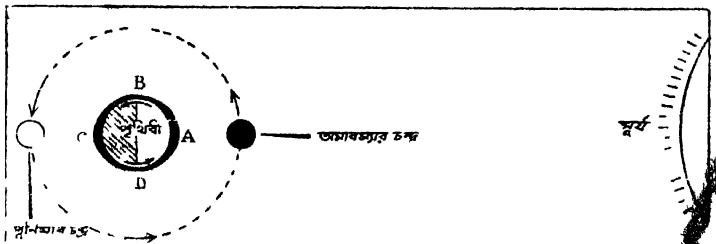
চিত্র নং ২১ : পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় তেজ কটাল

চন্দ্রের আকর্ষণ পৃথিবীপৃষ্ঠে চন্দ্রের সম্মুখস্থ অংশে জলরাশিকে [illegible] ধরিয়াছে। ফলে B ও D দুই পার্শ্ব হইতে জলরাশি সরিয়া [illegible] A বিন্দুতে জড় হইয়াছে, অর্থাৎ A বিন্দুতে জোয়ার সৃষ্টি হইয়া[illegible] B ও D বিন্দুতে ভাটা হইয়াছে। এখন C বিন্দুর অবস্থা বিবেচনা [illegible] এখানে মনে রাখিতে হইবে—চন্দ্র যেমন জলরাশিকে আকর্ষণ [illegible] তেমনি স্থলভাগকেও করে। সুতরাং A বিন্দুতে জল ফুলিয়া যে [illegible]ষ্টি হইল তাহার প্রকৃত কারণ—**জলরাশি** (১) চন্দ্রের কাছে বলি[illegible] (২) তরল পদার্থ বলিয়া উহা চন্দ্রের আকর্ষণে যতখানি আগাইয়া[illegible] স্থলভাগ

(১)কিছু দূরে এবং (২)দৃঢ, কঠিন পদার্থ বলিয়া ততখানি আসিল না, কাজেই জলের স্ফীতি ঘটিল। C বিন্দুতে অবস্থা ইহার ঠিক বিপরীত। এখানে জলভাগ দূরে বলিযা উহা চন্দ্রের টানে যতখানি আগাইয়া আসিল, স্থলভাগ অপেক্ষাকৃত কাছে বলিয়া তাহাব অপেক্ষা বেশী আসিল। শেষফল অবশ্য একই দাঁড়াইয়াছে—অর্থাৎ জল স্ফীত হইয়া উঠিল। পৃথিবী **২৪ ঘণ্টায় নিজ অক্ষের উপর একবার ঘুরিয়া আসে** বলিয়া এখন যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে আছে, **১২ ঘণ্টা পরে** উহা চন্দ্রের বিপরীত দিকে যাইবে এবং তখন সেখানে আবার জোয়ার হইবে (২১ নং চিত্র দেখ)। অবশ্য চন্দ্রও **একই দিকে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করিতেছে** বলিয়া সমযটি ঠিক ১২ ঘণ্টা না হইয়া ১২ ঘ: ২৫ মি: হইবে।

জোয়ার-ভাটা কখন ও কোথায় হয়—ইহা হইল প্রতিদিনের ঘটনা। এখন মাসের বিশেষ বিশেষ দিনে কি অবস্থা হইবে দেখা যাক। এ পর্যন্ত আমবা সূর্যকে হিসাবের মধ্যে আনি নাই। কিন্তু সূর্যের আকর্ষণও
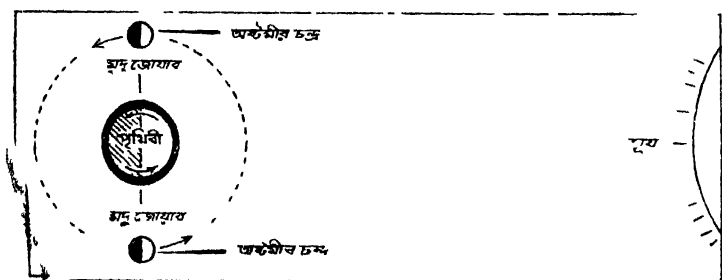
চিত্র নং ২২ : অষ্টমীতে মরা কটাল

নগণ্য [illegible]। উপরের চিত্র দুইটিতে দেখ—**পূর্ণিমা** ও **অমাবস্যায়** চন্দ্র ও সূর্যের [illegible] একই দিকে কাজ করায় উভয় আকর্ষণ যোগ হইয়া পূর্ণ জোয়ার [illegible]টিয়াছে। ইহাকে **তেজ কটাল** (spring tide—spring অর্থাৎ [illegible]ইয়া উঠা) বলে। **অষ্টমীতে** আবার উভয়ের আকর্ষণ বিপরীত দিকে [illegible] করায় চন্দ্রের প্রবলতর আকর্ষণের অতিরিক্ত শক্তিটিই

কার্যকরী হইয়া অপেক্ষাকৃত মৃদু জোয়ার সৃষ্টি হইয়াছে। ইহাকে **মরা কটাল** (neap tide—neap অর্থাৎ অল্প) বলে।

জোয়ার-ভাটা পৃথিবীর সর্বত্র সমানভাবে হয় না। যে সব অঞ্চলে সমুদ্রের মধ্যে স্থানে স্থানে স্থলভাগ থাকিয়া জলরাশিকে বিচ্ছিন্ন বা প্রায় বেষ্টিত করিয়াছে সেখানে জলের স্বচ্ছন্দ প্রবাহে স্বভাবতই বাধা সৃষ্টি হইতেছে—কাজেই জোয়ার-ভাটায় জলের স্ফীতি বা অবনতির বিশেষ তারতম্য ঘটে না। এই কারণে স্থলবেষ্টিত ভূমধ্যসাগরে জোয়ার-ভাটা নাই বলিলেই চলে।

জোয়ার-ভাটা ও জীবনযাত্রা—জোয়ার-ভাটায় মানুষের অনেক উপকার হয়। ইহার ফলে বন্দরগুলি আবর্জনামুক্ত থাকে, জোয়ারের সময় বড় বড় জাহাজ বন্দরে প্রবেশ করিতে পারে, নচেৎ বন্দর সৃষ্টি অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব হইত না (যেমন লণ্ডন)। ভাটার সময় সমুদ্রতীরবর্তী অধিবাসিগণ সমুদ্র হইতে নানা প্রকার জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ সংগ্রহ করিয়া তাহাদের খাদ্য-সংস্থান করে। অনেক সময় আবার নৌকা-জাহাজের জলপথে চলাফেরা করার ব্যাপারে জোয়ার-ভাটাকে বিশেষ হিসাব করিয়া চলিতে হয়—নচেৎ সমূহ বিপদ ঘটিতে পারে।

সাধারণ যন্ত্রপাতি—কাজ সহজ করিবার উপায়

কাজ কি এবং কাজকে কঠিন করে যে সব বিরুদ্ধ বল (force) ও অবস্থা তাহাদের কথা বলা হইয়াছে এবং প্রসঙ্গক্রমে ঘর্ষণ-বলের শক্তি কমাইবার কতকগুলি ব্যবস্থার উল্লেখ করা হইয়াছে। এইবার কাজ সহজ করিবার দুই একটি সাধারণ নীতির এবং উহার প্রয়োগের কথা আলোচনা করা যাক।

প্রথমে কাজ সহজ করার অর্থ কি ভাবিয়া দেখি। **দুইভাবে কাজ সহজ করা যায়—**

(১) অল্প শারীরিক শক্তি প্রয়োগ করিয়া বেশী শক্তির কাজ করিবার

ব্যবস্থা করা। ইহাতে যে কাজ হয়তো আমার সাধ্যাতীত ছিল উহা আমার আয়ত্তের মধ্যে আসিবে এবং পরিশ্রম-বোধ কম হওয়ায় অনেকক্ষণ ধরিয়া কাজ করা যাইবে। যন্ত্রের এই সুবিধাটিকে **যান্ত্রিক সুবিধা** (mechanical advantge) বলে।

(২) পরিশ্রম কম না হইলেও যদি এমনভাবে কাজটি করিবার ব্যবস্থা করা যায় যাহাতে আমি **কাজ করিতে সুবিধা বোধ করি**—তাহা হইলেও কাজটি অধিকতর সহজ বোধ হইবে। এই দুইটি ব্যাপার ব্যবহারিক দৃষ্টান্তের ভিতর দিয়া আমরা ক্রমশ পরিষ্কার বুঝিতে পারিব।

যে সকল কৌশলের ও ব্যবস্থার দ্বারা উপরোক্ত উদ্দেশ্যগুলি সাধন করা যায় বিজ্ঞানে তাহাদের **যন্ত্র** (machine) বলে। এই হিসাবে সিঁড়ি, হাতুড়ী, স্ক্রু, স্ক্রু-ড্রাইভার, (screw driver) ছুরি, কাঁচি, শাবল—সব এক একটি যন্ত্র। এই অসংখ্য রকমের যন্ত্রকে কতগুলি সাধারণ বৈজ্ঞানিক বা জ্যামিতিক নীতির ভিত্তিতে কয়েকটি প্রধান শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। এখানে আমরা তিন শ্রেণীর যন্ত্রের আলোচনা করিব।

আনত তল (incl ed pla ne)

স্টেশনে বা র। স .দখিযাছ কুলীরা ঢালু কাঠের পাটা বাহিয়া বড বড় বস্তা, বাক্স প্রভৃতি রেলগাড়ীব কামরায বা লরীর মধ্যে উঠাইতেছে।
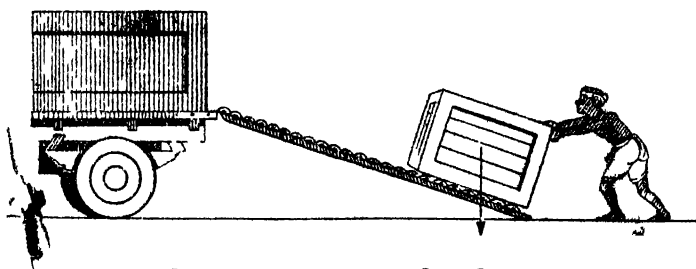
চিত্র নং ২৩ : আনত তলের যান্ত্রিক সুবিধা

ইহাতে সুবিধা কি হইল ? আর একটি দৃষ্টান্ত লওয়া যাক। পাশের চিত্রে দেখ—দোতলায় উঠিবার জন্য দেওয়ালে দুইটি মই লাগানো হইয়াছে—CB

চিত্র নং ২৪ : বেশী হেলানো মইএ ওঠা কম আয়াসসাধ্য

ও CD ; একটি বেশী খাড়া, অপরটি কম। কোন মইটি বাহিয়া দোতলায় উঠিতে কম কষ্ট বোধ হইবে, বলিতে পার? নিশ্চয় CD মইটি—কারণ ইহা বেশী শোয়ানো। রেলের পাদানের মত বা জলের ট্যাঙ্কে উঠিবার সিঁড়ির মত একটির উপরে আর একটি সিঁড়ি হইলে একেবারে সোজা খাড়াভাবে ওঠা যাইত, কিন্তু ইহাতে পরিশ্রম বোধ আরও বেশী হইত। এখানে এই বিষয়গুলি লক্ষ্য কর

ক। CD দূরত্ব CB দূরত্ব অপেক্ষা বেশী।

খ। প্রতি ক্ষেত্রে একই উচ্চতায় ওঠা হইতেছে।

গ। উঠিবার পথ যত দীর্ঘ হইবে অর্থাৎ পথের খাড়াই যত ক[illegible] হইবে, পরিশ্রম বোধও তত [illegible] হইবে।
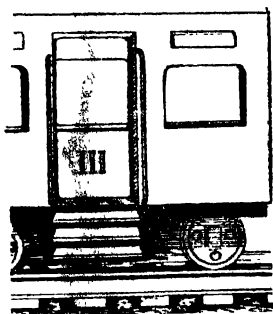
চিত্র নং ২৫ : খাড়া সিঁড়িতে তাড়াতাড়ি ওঠা গেলেও উঠিতে পরিশ্রম বোধ বেশী হয়

এখন, পূর্বে কাজে[illegible] গাণিতিক সূত্র দেওয়া হ[illegible]— উহার কথা মনে কর। [illegible]ল × দূরত্ব। এখানে তা[illegible]জের পরিমাণ হইল—বল (তোমার ওজন) × CD। সুতরাং কা[illegible]মাণ সমান রাখিয়া দূরত্ব যত বেশী করা যায় প্রযুক্ত বলও তত[illegible] হইবে। তাই—CD মই বাহিয়া উঠিলে যদিও বেশী পথ যাইতে [illegible] তথাপি বলের প্রয়োগ কম হওয়ায় পরিশ্রম বোধ কম হইবে। এখা[illegible]ক বলের পরিমাণ হইল—তোমাকে যে ভার তুলিতে হইতেছে অর্থা[illegible] ভার।

অতএব আনত তল একটি যন্ত্র—এবং ইহাতে যন্ত্রের প্রথম উদ্দেশ্য (২০ পৃষ্ঠায় দেখ) সাধিত হইতেছে। ব্যাপারটি নীচের চিত্রগুলি হইতে অধিকতর স্পষ্ট হইবে—
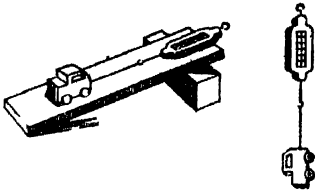
চিত্র নং ২৬: আনত তল বাহিয়া তোলা অপেক্ষা খাড়া টানিয়া তুলিতে বেশী বল লাগে

স্প্রিং-তুলার সাহায্যে একটি ছোট গাড়ীকে (১) আনত তল বাহিয়া উপরে উঠাইতে এবং (২) সোজা টানিয়া উপরে উঠাইতে কি শক্তি প্রয়োজন হয় দেখ। শেষের ক্ষেত্রে স্প্রিংএ অনেক বেশী টান পড়িবে অর্থাৎ বেশী বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে।

[পাশে একটি স্প্রিং-তুলা ও উহার ভিতরের গঠনের ছবি দেওয়া হইল। তাহা হইতে উহার কার্যপ্রণালী বুঝিতে অসুবিধা হইবে না। টানের পরিমাণের অনুপাতে স্প্রিংটি প্রসারিত বা সংকুচিত হয় এবং পাশের স্কেলে উহার দৈর্ঘ্য মাপিয়া টানের পরিমাণ এবং উহা হইতে বস্তুটির ওজন হিসাব করা যায়।]

চিত্র নং ২৭: স্প্রিং-তুলার গঠননীতি ও কার্যপ্রণালী

আনত তলের নীতি কয়েকটি যন্ত্রের মধ্যে প্রয়োগ করা হইয়াছে। তোমরা বোধ হয় শুনিয়া আশ্চর্য হইবে যে, আমাদের [illegible]তি স্ক্রু একটি আনত তলের ব্যব[illegible]ক প্রয়োগ। এ ছাড়া ছুরি, বা[illegible] ও কুড়ুল প্রভৃতির ফলা আনত তলের [illegible]তির প্রয়োগে কাজ সহজ করার উদাহর[illegible] আর এক শ্রেণীর যন্ত্রের দৃষ্টান্ত লওয়া যাক—
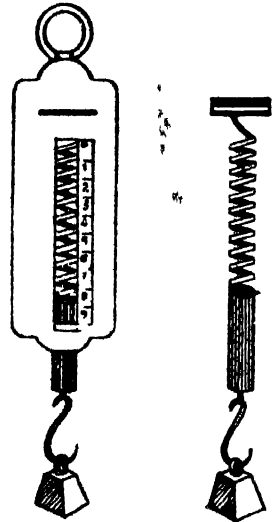
কপিকল (pulley)

পরবর্তী চিত্রটি দেখ। কুয়ার উপর **একটি** কপিকল ব্যবহার করিয়া এক বালতি জল উঠানো হইতেছে। এখানে লক্ষ্য কর বালতিটি **উপরে** উঠিতেছে কিন্তু দড়িটিকে টানিয়া **নামানো** হইতেছে। ইহাতে পরিশ্রম অর্থাৎ ক্লান্তি বোধ কম হইল কি? না। বালতিটিকে সোজা উপরে টানিয়া উঠাইতে হইলে যে পরিশ্রম হইত এই ভাবে কপিকলের সাহায্যে দড়িতে নীচে টান দিয়া উঠানোতেও একই পরিশ্রম হইতেছে। অনুমানের কথা নয়—অঙ্কের সাহায্যে প্রমাণ করা যায়: কারণ যে প্রান্তে টান দিতেছ
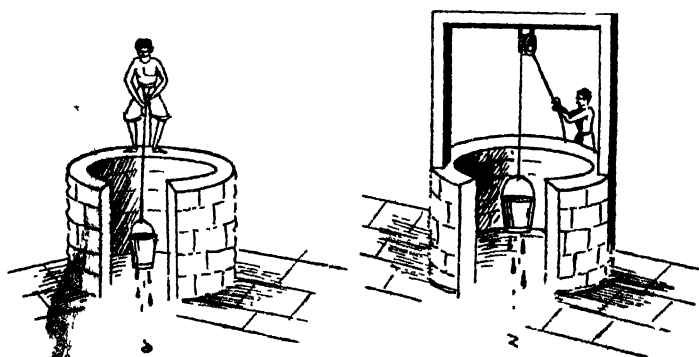
চিত্র নং ২৮ : (১) উপরের দিকে টানিযা তোলার চেয়ে (২) নীচের দিকে টানিযা তোলায় বেশী সুবিধা মনে হয়

সে প্রান্তে **যতটুকু নামিতেছে** অপর প্রান্তে ওজনটিও **ততখানি উঠিতেছে**। সুতরাং কাজের হিসাবে—সব সময় **দুই পার্শ্বে কাজ সমান হইবে** বলিয়া উঠা নামার দূরত্ব সমান থাকিলে এক পার্শ্বে ওজন এবং অপর পার্শ্বে শক্তি প্রয়োগও সমান হইবে—কারণ কাজ = বল × দূরত্ব। একটি স্প্রিং-তুলা বা বাটখারা ব্যবহার করিয়া এই সমতা আরও স্পষ্টভাবে বুঝা যাইবে অর্থাৎ তোমাকে ওজনের ঠিক সমান বল প্রয়োগ করিতে হইতেছে। তবে যন্ত্রের সুবিধা হইল কি? সুবিধা হইল এই যে কোনও ভার উত্তোলন করিতে হইলে উপরের দিকে টানিযা তোলার চেয়ে নীচের

দিকে টানিয়া তোলায আমাদেব বেশী সুবিধা মনে হয়। সুতবাং এখানে যন্ত্র ব্যবহারের দ্বিতীয় প্রকার সুবিধা বর্তমান রহিয়াছে।

এইবার নীচের চিত্রের ন্যায় দুইটি কপিকল ব্যবহাব করিয়া দেখ। এখানে একটি কপিকল **স্থির** (পূর্বের ন্যায়) ও অপরটি **সচল**। শেষের কপিকলটির নীচে ওজন ঝুলাইয়া দড়ির খোলা প্রান্তে বাটখারা বা স্প্রিং-তুলা দিয়া টানিযা দেখ ওজনের অর্ধেক শক্তি প্রয়োগ করিয়া উহাকে তোলা সম্ভব হইতেছে।

পাশেব স্কেলটি থাকায় আর একটি বিষয় লক্ষ্য কবিতে পারিবে : শক্তি প্রযোগেব স্থান যতখানি সরিতেছে, ওজনটি তাহাব অর্ধেক পরিমাণ দূরত্ব উপবে উঠিতেছে। গণিতের সূত্রটি প্রয়োগ কবিলে বুঝিতে পারিবে—দুইদিকে কাজেব পরিমাণ সমান হইবে বলিয়া অর্থাৎ বল ও দূরত্বের গুণফল সমান থাকিবে বলিয়া এরূপ হইতেছে। বল বেশী হইলে দূবত্ব কম ও বল
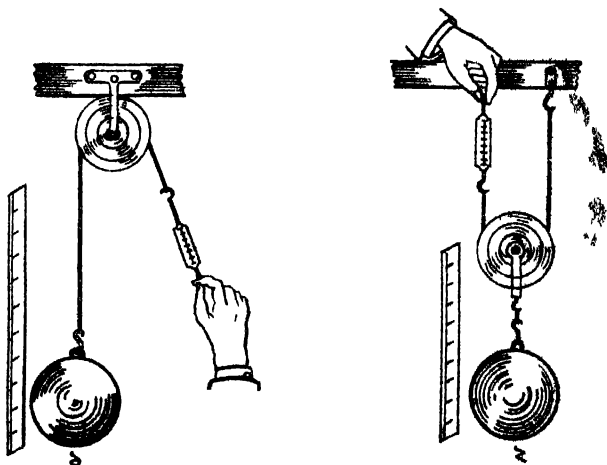
চিত্র নং ২৯ : (১) একটি স্থির কপিকল ব্যবহারে যান্ত্রিক সুবিধা নাই
(২) একটি সচল কপিকল ব্যবহারে দ্বিগুণ বলের কাজ পাওয়া যায

কম হইলে দূরত্ব বেশী হইবে। এইরূপে সচল কপিকলের সংখ্যা বাড়াইয়া অতি অল্প আয়াসে বড় বড় ভাবী বোঝা তোলা সম্ভব হয়।

লিভার (levers)

প্রথম শ্রেণীর লিভারের প্রধান অবলম্বন একটি মজবুত লাঠি বা দণ্ড।

ধর একটি শাবল। মাটিতে গর্ত খুঁড়িবার জন্য ব্যবহার হইলে ইহার অগ্রভাগ একটি আনত তলের ন্যায় যান্ত্রিক সুবিধা দেয়। কিন্তু অন্য আর এক রকমে ব্যবহার করিলে ইহা একটি লিভারে পরিণত হইবে।

নীচের চিত্রটি দেখ : তোমরা কত সময়ে এইভাবে একটি মজবুত লাঠি বা দণ্ডের সাহায্যে 'চাড়' দিয়া ভারি বস্তু সরাইয়াছ। ইহাই হইল লিভারের দৃষ্টান্ত। লিভারের বৈশিষ্ট্যগুলি লক্ষ্য কর—

ক। একটি **আলম্ব** (fulcrum)—ইহাকে কেন্দ্র করিয়া দণ্ডটি ঘুরিতেছে ;

খ। আলম্বের দুই পার্শ্বে দণ্ডটির দুইটি অংশ (ইহাদের বাহু বলে) অসমান ;

গ। দীর্ঘ বাহুর প্রান্তে বল বা শক্তি প্রয়োগ করা হইতেছে এবং অপর প্রান্তে ভারটিকে স্থানচ্যুত করা হইতেছে।
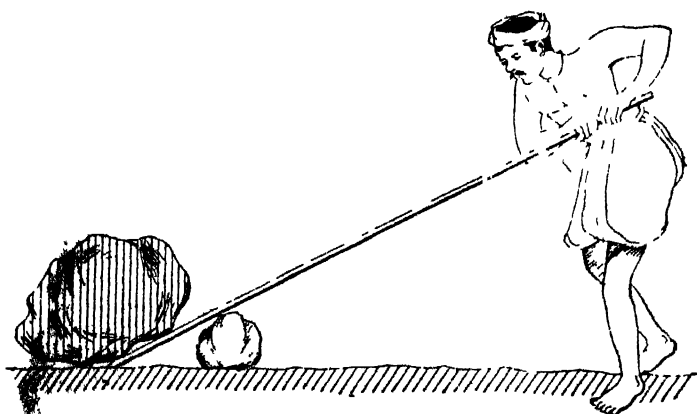
চিত্র নং ৩০ : যান্ত্রিক সুবিধা—শাবলকে প্রথম শ্রেণীর লিভার হিসাবে ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত

দেখ ইহা যন্ত্র কেন ? আর একটি চিত্র দেখ—

এখানে লক্ষ্য কর যে দীর্ঘ বাহুর প্রান্তে একটি ছোট ওজন হ্রস্ব বাহুর

প্রান্তে একটি বড় ওজনকে কেমন ধরিয়া আছে। আলম্বের দুই পার্শ্বে অসমান বাহু দুইটির দৈর্ঘ্যের প্রভেদ যত বেশী হইবে দীর্ঘতর প্রান্তে ততই কম ওজনের সাহায্যে অপর প্রান্তে বেশী ওজন উঠানো সম্ভব হইবে। ইহা হইতে প্রথম দৃষ্টান্তটিতে শাবল দিয়া বড় পাথরটি নড়াইবার ব্যবস্থার পিছনে যে নীতি কাজ করিতেছে, তাহা বুঝা যাইবে অর্থাৎ লিভারের সাহায্যে কম বল প্রয়োগ করিয়া অনেক বেশী বলের কাজ পাওয়া যায়। সুতরাং এখানে যন্ত্রের প্রথম উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইতেছে। ষ্টেশনে যে একরকম ওজনের কল দেখা যায় তাহা যে প্রথম শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত চিত্রে বুঝা যাইবে।
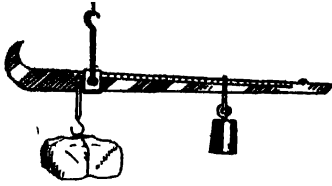
চিত্র নং ৩১ : প্রথম শ্রেণীর লিভার—দোকানে জিনিসপত্র ওজনের এক প্রকার যন্ত্র

আমাদের নিত্যদিনের ব্যবহারের **কাঁচি** এই জাতীয় লিভার—প্রকৃতপক্ষে, এই জাতীয় দুইটি লিভারের সমন্বয়। এখানে দীর্ঘ প্রান্তে, কাঁচির হাতলের মধ্যে আঙুল ঢুকাইয়া বল প্রয়োগ করিয়া অপর প্রান্তে দুই বাহুর মধ্যে অধিক বল প্রয়োগ করা যায় এবং এই বলই কাগজ, কাপড় ইত্যাদির উপর প্রযুক্ত হইয়া উহাদের বিচ্ছিন্ন করে। এই বল যে কত বেশী তাহা এক দিস্তা কাগজ বা কয়েক শিট্ (sheet) কাপড় একসঙ্গে টানিয়া ছিঁড়িবার চেষ্টা করিলেই বুঝিতে পারিবে। এখন নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর ভাবিয়া বল—
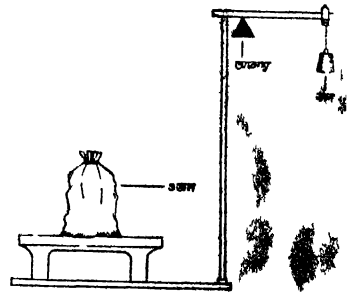
চিত্র নং ৩২ : প্রথম শ্রেণীর লিভার—ষ্টেশনে যেরূপ যন্ত্রে মাল ওজন করা হয়

১। কাপড় বা কাগজকে আলম্ব হইতে কাছে না দূরে রাখিলে কাটিবার বেশী সুবিধা হইবে?

২। কাঁচির হাতলের দিকের অংশটি কম না বেশী লম্বা হইলে কাটিবার অধিক সুবিধা হইবে?

এই জাতীয় লিভারকে **প্রথম শ্রেণীর** লিভার বলে। নিম্নে উপর-নীচে ও পাশাপাশি প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের চিত্র দেখ :—
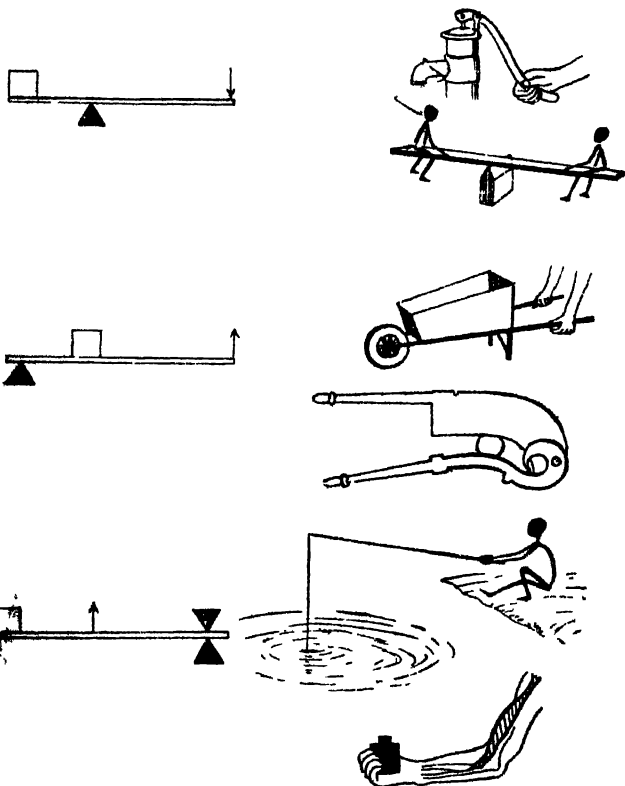
চিত্র নং ৩৩ : বিভিন্ন শ্রেণীর লিভারের দৃষ্টান্ত

দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভারে বল এক প্রান্তে প্রযুক্ত হওয়ায় সব ক্ষেত্রেই যান্ত্রিক সুবিধা হইবে—কারণ সব সময়ই শক্তি প্রয়োগের স্থান ভার প্রয়োগের স্থান অপেক্ষা আলম্ব হইতে দূরে থাকিবে।

তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে কোনও সময়েই যান্ত্রিক সুবিধা নাই, কারণ সব সময়েই আলম্ব হইতে ভার যতখানি দূরে, বল তাহার অপেক্ষা নিকটে কাজ

করিতেছে। যেমন এখানে ধর ১০ কিলোগ্রাম বল প্রয়োগ করিয়া মাত্র ৪ কিলোগ্রাম ওজন উঠানো যাইবে। এইজন্য **ছিপে** মাছ অনেক বেশী ভারী বোধ হয়। (চিত্র নং ৩৩ দেখ) এখানে ছিপের গোড়ায় তোমার হাতের মুঠি আলম্বের কাজ করিতেছে ও অপর হাতটি কিছু উপরে বল প্রযোগ করিতেছে এবং প্রান্তদেশে মাছটি হইল—ভাব। তাহা হইলে লাভ কি হইল ?

লাভ হইল **গতি**। মাছ ধবিবার সময় ফাতনা ডুবিবাব সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎগতিতে টান মারিতে হইবে, ইহাই মাছ ধরিবার প্রধান কৌশল। এই জাতীয লিভাবে লক্ষ্য কর—শক্তি প্রয়োগের স্থান যেখানে অল্প ঘুরে উঠিতেছে ছিপের অগ্রভাগ সেই সময়ে বহুগুণ বেশী বেগে একটি বৃহৎ জ্যা রচনা করিতেছে। স্নতরাং **বল হারাইয়া তুমি গতি লাভ করিতেছ** ; ইহাতে তোমার ক্ষতি নাই, কিন্তু বিশেষ লাভ।

তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে তাপে দৈর্ঘ্য-বৃদ্ধি মাপিবার যে যন্ত্রটির [illegible] দেখিতেছ উহা [illegible] শ্রেণীর লিভার।
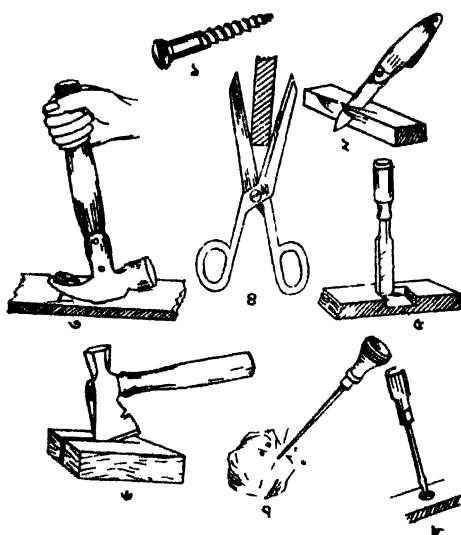
চিত্র নং ৩৪ : বিভিন্ন জাতীয় যন্ত্র
১। স্ক্রু ২। ছুরি ৩। হাতুড়ি ৪। কাঁচি
৫। বাটালি ৬। কুড়ুল ৭। বরফ কাটার লোহা
৮। স্ক্রু-ড্রাইভার (কোনটি কি শ্রেণীর যন্ত্র বল)

পাশে আরও কতকগুলি লিভার ও আনত তল জাতীয় বিভিন্ন শ্রেণীর যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল।

ইলেকট্রিক ক্রেণগুলি (crane) লিভার ও কপিকল—উভয়ের যান্ত্রিক স্নবিধা প্রয়োগ [illegible] বিবাট বিরাট ভারী বোঝা লইয়া নাডাচাডা করে।

অনুশীলনী (I)

১। পরিশ্রম করা সত্ত্বেও কাজ করা হয় না—যুক্তিসহ এরূপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ কর। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে কাজ করা হয় কি না বিচার করিয়া বল—(ক) খাদ্য চর্বন করা, (খ) পকেটে ক্রিকেট বল লইয়া মাঠে ঘুরিয়া বেড়ানো।

২। সমান ওজনের দুইটি বস্তার একটিকে আনত তল বাহিয়া মালগাড়ীতে তোলা হইল, আর একটিকে সোজা টানিয়া তোলা হইল—কোন ক্ষেত্রে বেশী কাজ হইল? কেন? আনত তল বাহিয়া তুলিবার সুবিধা কি?

৩। (ক) চলন্ত গাড়ী হঠাৎ ব্রেক করিলে, (খ) গাড়ী স্থির অবস্থা হইতে হঠাৎ জোরে চলিতে আরম্ভ করিলে—আরোহীর কোন দিকে পড়িয়া যাইবার প্রবণতা হয় এবং কেন হয় বুঝাইয়া বল।

৪। স্লেজগাড়ী দ্রুত চলিতে পারে কেন? ইহাতে চাকা থাকিলে সুবিধা না অসুবিধা হইত বুঝাইয়া বল। একটি লোহার বল মেরু প্রদেশের সুবিস্তীর্ণ বরফ প্রান্তরের উপর গড়াইয়া দিলে কি কি কারণে উহার গতি শেষ পর্যন্ত নিঃশেষ হইয়া যাইবে?

৫। অভিকর্ষ ও মহাকর্ষের প্রভেদ কি? কৃত্রিম উপগ্রহকে মহাকাশে পাঠাইবার সময়—(ক) রকেটের সাহায্যে ধাপে ধাপে গতি সৃষ্টি করা হয় কেন? (খ) উহাকে বিষুবরেখার নিকট পশ্চিম হইতে পূর্বে উৎক্ষেপ করিলে কি সুবিধা হয়?

৬। জোয়ার-ভাটা দিনের মধ্যে কয়বার হয়? কেন? মাসে কোন কোন তিথিতে ভরা কটাল ও মরা কটাল হয়? কেন? চিত্র আঁকিয়া বুঝাও।

৭। প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর লিভারের সুবিধা অসুবিধাগুলি বুঝাইয়া বল। একটি লোহার দণ্ডকে ভারী পাথর সরাইবার উদ্দেশ্যে—(ক) প্রথম শ্রেণী, (খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর লিভার হিসাবে কিরূপে ব্যবহার করিবে?

৮। নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলি কোন কোন শ্রেণীর লিভারের পর্যায়ে পড়িবে?—(ক) চিমটা, (খ) যাঁতি, (গ) নৌকার দাঁড়, (ঘ) দাড়িপাল্লা, (ঙ) হাতুড়ী, (চ) ঝুলঝাড়া লাঠি, (ছ) কলম।

৯। সূর্য হইতে বুধ ও বৃহস্পতির দূরত্ব যথাক্রমে ৩ কোটি ৬০ লক্ষ ও ৪৮ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। কোনটি বেশী জোরে ঘুরিতেছে বল। (ক) বুধ যদি বৃহস্পতির কক্ষে (খ) বৃহস্পতি যদি বুধের কক্ষে ঘুরিত তাহা হইলে উহাদের বর্তমান গতির সহিত কিরূপ তারতম্য ঘটিত—ভাবিয়া বল।

১০। চাঁদ, মঙ্গল, শুক্র—এই তিনটি গ্রহে বা উপগ্রহে তোমার যাওয়া সম্ভব হইলে কোনটির উপর লংজাম্প (long jump) ও হাই জাম্প (high jump) করা সর্বাপেক্ষা সুবিধাজনক হইত? কোন কোন ক্ষেত্রে তোমার রেকর্ড পৃথিবীর ক্ষেত্রের রেকর্ডের অপেক্ষা ভাল হইত?

অনুশীলনী (II)

১। নিম্নে পর পর চারিটি শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া আছে। উহাদের মধ্য হইতে একটি বাছিয়া লইয়া বিবৃতিটি শুদ্ধভাবে পূরণ কর :—

একটি বস্তুকে মেঝের উপর দিয়া দড়ি বাঁধিয়া টানিয়া লইয়া যাইতে বাধা সৃষ্টি করে—

(i) জাড্য।
(ii) ঘর্ষণ বল।
(iii) অভিকর্ষ।
(iv) দড়ির বিপরীত আকর্ষণ।

২। নিম্নে বাম দিকের সারিতে চারিটি তথ্য ও ডানদিকের সারিতে উহাদের কারণ এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। তথ্য ও কারণগুলি উহাদের নম্বর অনুযায়ী শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

তথ্য	কারণ
(১) হঠাৎ গাড়ী ব্রেক (brake) করিলে শরীর সামনের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে।	(১) অভিকর্ষ
(২) কুয়া হইতে জল টানিয়া তুলিতে বল প্রয়োগ করিতে হয়।	(২) মহাকর্ষ
(৩) একটি মসৃণ বল একটি মসৃণ সমতল গড়াইয়া দিলে শেষ পর্যন্ত থামিয়া যায়।	(৩) ঘর্ষণ বল
(৪) পৃথিবী কক্ষপথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরিতেছে।	(৪) জাড্য

৩। নির্মলিখিত বিবৃতিগুলির কতকগুলি সত্য, কতকগুলি সত্য নহে। কোনগুলি [illegible] বল :—

(১) একটি ভার মাথায় করিয়া সমতল পথের উপর দিয়া হাঁটিয়া গেলে "কাজ" করা হয়।

(২) গালিচায় লাঠি দিয়া জোরে আঘাত করিলে স্থিতি জাড্যের জন্য [illegible] হইয়া পড়ে।

(৩) একটি সুতাবাঁধা ঢিল ঘুরিতে ঘুরিতে ছিঁড়িয়া গেলে পৃথিবীর কেন্দ্রের বিপরীত দিকে ছুটিয়া বাহির হইয়া যায়।

(৪) একটি পিপাকে সোজা টানিয়া লরীতে উঠাইতে যে কাজ হয় আনত [illegible] বাহিয়া গড়াইয়া তুলিতে তাহার অপেক্ষা কম কাজ হয়।

( ) মাটির দিক নীচে বলিয়া একটি আম গাছ হইতে মাটিতে পড়ে।

(৬) সেকেণ্ডে ৫ মাইল বেগে কৃত্রিম উপগ্রহ ভূপৃষ্ঠ হইতে যাত্রা করে।

(৭) কৃত্রিম উপগ্রহের মধ্যে বসিয়া ভ্রমণ করিবার কালে আরোহী কোনও [illegible]র ভার অনুভব করে না।

(৮) চন্দ্রের আকর্ষণে পৃথিবীর জলভাগ স্থলভাগ অপেক্ষা বেশী আগাইয়া [illegible] বলিয়া জোয়ার হয়।

(৯) প্রথম শ্রেণীর লিভারে সব সময়ই যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায়।

(১০) তৃতীয় শ্রেণীর লিভারে কোনও সময়ই যান্ত্রিক সুবিধা পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অধ্যায়

আলোক

আলোকের গতি ও উহার ফল

আলোক কি

এই বিচিত্র পৃথিবীর অধিকাংশ জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আমাদের কাছে আলোকের মাধ্যমেই আসিয়া পৌঁছায়। এই পৃথিবীর উপরের এবং পৃথিবীর বাহিরের—নভোলোকের—যাবতীয় বস্তু, উহাদের আকার, আয়তন, বর্ণ দূরত্ব, গতিবিধি, সব কিছুর ধারণা বহন করিয়া আনে এই আলোক। আলোক কি? আলোক একপ্রকার **শক্তি** (energy)। আমরা পূর্বে বিজ্ঞানে **কাজ** কাহাকে বলে জানিয়াছি। যে বস্তুর **কাজ করিবার ক্ষমতা** আছে তাহাকে বিজ্ঞানে শক্তি বলে। আলোকের কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, উত্তাপের কাজ করিবার ক্ষমতা আছে, শব্দের কাজ করিবার ক্ষমতা আছে—তাই উহারা শক্তি। জলের উপর ঢেউ-এর ন্যায় আমরা কল্পনা করিতে পারি যে বিরাট শূন্যব্যাপী **ঈথর** (ether) বলিয়া [illegible] একটি পদার্থের কম্পনে আলোকের উদ্ভব হয়।

আলোক সরল রেখায় চলে

কোনও বাধা না পাইলে, একই মাধ্যমে আলোক সরল রেখায় চলে। ইহার প্রমাণ সহজেই পাওয়া যায়। আলোকের অভাবই হইল অন্ধকার। আলোক কতকগুলি পদার্থের মধ্য দিয়া যাতায়াত করিতে পারে—তাহাদের **স্বচ্ছ পদার্থ** বলে। যেমন কাচ, জল ইত্যাদি।

চিত্র নং ৩৫ : টর্চের আলোক সরল রেখায় বাহির হইতেছে

অধিকাংশ পদার্থের মধ্য দিয়া অবশ্য আলোক যাইতে পারে না—যেমন কাঠ, ধাতু, পাথর প্রভৃতি। সুতরাং আলোকের পথে যদি শেষোক্ত কোন পদার্থ রাখা যায় তাহা হইলে কি হইবে? স্বভাবতই অপর পার্শ্বে আলোক পড়িবে না অর্থাৎ অন্ধকার হইবে। এই অন্ধকার জায়গাটিকেই **ছায়া** বলে। ইহা কতখানি স্থান জুড়িয়া থাকিবে বলিতে পার কি? অবশ্য ইহা নির্ভর করিবে বস্তুটির আকার ও আয়তনের উপর। কিন্তু ইহা ছাড়াও আর একটি মূল প্রশ্ন আছে—

আলোক সরল রেখায় গমন করে কি না।

এই সত্যটি আমরা অনেক সময় অজ্ঞাতসারে স্বীকার করিয়া লই। কিন্তু ইহা সত্য না হইতেও পারিত এবং তখন ছায়া, গ্রহণ ইত্যাদি আলোক-সংক্রান্ত নানা অবস্থা ও ঘটনা সম্বন্ধে আমাদের হিসাবপত্র একেবারে অন্য রকম হইয়া যাইত। এখন, আলোকের সরল রেখায় গমনের কতকগুলি প্রমাণ দেখা যাক। উপরোক্ত ব্যবহারিক জীবনের দৃষ্টান্তগুলি আলোকের সরল রেখায় চলার সুন্দর প্রমাণ। এইবার কয়েকটি বিশেষ প্রমাণের সাহায্যে ব্যাপারটি আরও স্পষ্টভাবে বুঝিতে চেষ্টা করা যাক—

পরীক্ষাঃ তিনটি সমান মাপের পিচবোর্ডের বর্গক্ষেত্র কার্ড লও। মোটা ছুঁচ দিয়া উহাদের ঠিক মধ্যে একটি করিয়া গর্ত কর। এখন উহাদের এক একটি কাঠের আধারের (stand) উপর বসাইয়া টেবিলের
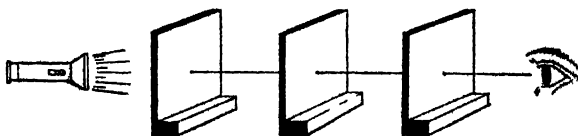
চিত্র নং ৩৬ : আলোক সরল রেখায় গমন করে

উপর এমন ভাবে দাঁড় করাইয়া দাও যেন ঐ তিনটি ফুটা একটি সরল রেখায় থাকে। (উহাদের মধ্য দিয়া টান করিয়া একটি সুতা ধরিয়া [illegible] করিতে পার)। এখন অপর প্রান্তে একটি মোমবাতি বা টর্চ জ্বালাইয়া [illegible] কার্ড তিনটির গর্ত ও তোমার চোখ এক সরল রেখায় রাখিয়া দেখ—

বাতির আলোটিকে দেখা যাইবে। যে কোনও কার্ড বা চোখ একটু সরাইলেই আলোক অদৃশ্য হইবে।

চিত্র নং ৩৭ : উপরের নলটিতে মধ্যের বাঁক ঘুরিয়া আলোক অপর প্রান্তে যাইতে পারিবে না

পিন্‌হোল ক্যামেরা (Pinhole Camera)—কোনও বার্লি বা এরারুটের সিলিণ্ডার আকৃতির একটি টিন লইয়া উহার তলদেশের কেন্দ্রে একটি ক্ষুদ্র ছিদ্র কর। এখন খোলা মুখে একটি অয়েল পেপার (oil paper) সুতা বা রবার ব্যাণ্ড (rubber band) দিয়া বাঁধিয়া (স্টেশনারী দোকানে পাওয়া যাইবে) দাও। এখন তুমি একটি সহজ ক্যামেরা প্রস্তুত করিয়াছ। **পিনের ছিদ্রটি এই ক্যামেরার প্রধান অবলম্বন ও ইহার মূল** ভিত্তি বলিয়া ইহাকে পিনহোল ক্যামেরা নাম দেওয়া হইয়াছে। ইহার ব্যবহার এইরূপ—
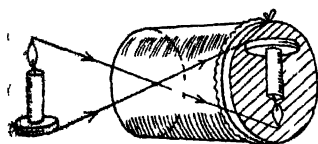
চিত্র নং ৩৮ : পিন্‌হোল ক্যামেরা

অল্প আলোকিত একটি ঘরে চিত্রের ন্যায় একটি মোমবাতি জ্বালাইয়া উহার সামনে ক্যামেরাটি শোয়াইয়া ধর। এখন ইহার অপর পার্শ্বে অয়েল পেপারের উপর মোমবাতির আলোকিত অংশের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পড়িবে। চিত্রটি কিন্তু **সোজা না হইয়া উলটা হইবে** এবং কেন হইবে তাহা চিন্তা বুঝিতে কষ্ট হইবে না। ইহা আলোকের সরল রেখার গমনের একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ।

[এই পরীক্ষায় (১) গর্তটি বড় হইলে, (২) মোমবাতিটি বেশ দূরে থাকিলে কি হইবে? (৩) আলোক বক্র রেখায় গমন করিলেই বা কি হইত ভাবিয়া বল। প্রথম দুই ক্ষেত্রে পরীক্ষা করিয়া দেখ তোমার অনুমান ঠিক হয় কি না]

এইবার পূর্বের ছায়া উৎপত্তির প্রশ্নে ফিরিয়া আসা যাক। পরের চিত্রটি দেখ—

টর্চের বাল্বের কেন্দ্র (আলোকের উৎপত্তি স্থল) হইতে ছায়ার কিনারা পর্যন্ত একটি সুতা টান করিয়া—অর্থাৎ সরল রেখায় ধরিয়া দেখ ইহা ঠিক বস্তুটির কিনারা স্পর্শ করিয়া যাইবে। এইরূপ বস্তুটির কিনারার প্রতি বিন্দু স্পর্শ করিয়া সরল রেখায় আলোক পর্দাটির উপর পড়িলে বস্তুটির কাঠামোর অনুরূপ একটি অন্ধকারময় পটভূমি পর্দায় ফুটিয়া উঠিবে। ইহাকেই ছায়া বলা হয়। সুতরাং ছায়ার—
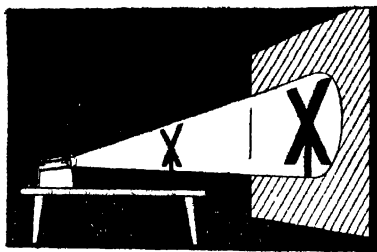
চিত্র নং ৩৯ : আলোক সরল রেখায় চলে বলিয়াই ছায়া "কায়া"র রূপ পায়

(১) **আকৃতি** অবিকল আসল বস্তুটির সদৃশ হইবে ;

(২) **আয়তন** বড় কি ছোট হইবে ইহা নির্ভর করিবে—

(ক) আলো বা পর্দার দূরত্বের উপর,

(খ) আলোর আয়তনের উপর।

এইবার আমরা চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের কারণ বুঝিতে পারিব।

চন্দ্রগ্রহণ (lunar eclipse)

আকাশে চন্দ্র, পৃথিবী ও সূর্য—ইহাদের পরস্পর অবস্থান অপর পৃষ্ঠার চিত্রে দেখ—

পৃথিবী সূর্যের চারিদিকে প্রদক্ষিণ করিতেছে সেজন্য উহা একটি গ্রহ। চন্দ্র আবার পৃথিবীর চরিদিকে ঘুরিতেছে সেইজন্য উহা একটি উপগ্রহ। অবশ্য সহজে বুঝা যায় এ অবস্থায় চন্দ্রকে পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরিতে ঘুরিতে পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া সূর্যকেও প্রদক্ষিণ করিতে হইবে।

m_1 ও m_2 চন্দ্রের পৃথিবী প্রদক্ষিণের দুইটি অবস্থান। m_1 অবস্থানে পৃথিবী, সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে রহিয়াছে। অতএব ছায়ার উৎপত্তির নিয়মে পৃথিবীর ছায়া চন্দ্রের উপর পতিত হইয়াছে। এই অবস্থায় দেখ—

ক। পৃথিবীর এক অর্ধ সূর্যালোকিত—উহা দিন। অপর অর্ধ অন্ধকার—উহা রাত্রি।

থ। এই রাত্রির অর্ধ হইতেই পূর্ণচন্দ্র দেখিবার কথা। কিন্তু চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ার অন্ধকারে পড়িয়া গিয়াছে বলিয়া উহাকে দেখা যাইবে না।
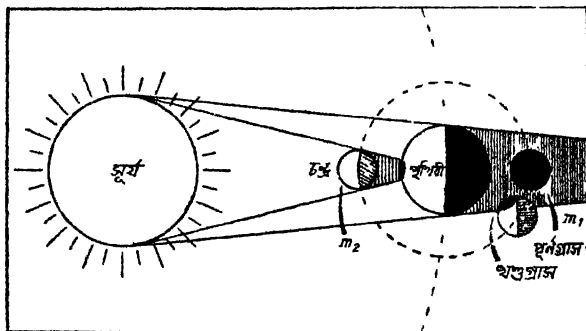
চিত্র নং ৪০ : খণ্ডগ্রাস ও পূর্ণগ্রাস অবস্থায় এবং অমাবস্যায় (m_2) চন্দ্রের বিভিন্ন অবস্থান ; m_2 অবস্থানে পৃথিবীপৃষ্ঠের অন্ধকারময় স্থানটুকু হইতে সূর্যের পূর্ণগ্রাস দৃষ্ট হইবে

ইহাই হইল চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস। কিন্তু তাহা হইলে তো কোনও পূর্ণিমার দিনই **চন্দ্রকে** দেখিবার কথা নহে—পূর্ণচন্দ্র তো দূরের কথা। কিন্তু তাহা হয় না। **কারণ,** চন্দ্রের কক্ষতল ও পৃথিবীর **কক্ষতল** একই সমতলে অবস্থিত নহে —পরস্পর কিঞ্চিৎ হেলিয়া আছে। **সুতরাং কখনও** পৃথিবীর ছায়া সমগ্র চন্দ্রকে **গ্রাস** করিবে (**পূর্ণগ্রাস**); কখনও **চন্দ্রের** অংশ মাত্র ঐ ছায়ার

চিত্র নং ৪১ : চন্দ্রের কক্ষ পৃথিবীর **কক্ষের** সহিত কিঞ্চিৎ হেলিয়া থাকে

মধ্যে **দিয়া** যাইবে (**খণ্ডগ্রাস**); **কখনও** বা ছায়া চন্দ্রকে একেবারেই স্পর্শ **করিবে** না। এই শেষোক্ত অবস্থায় পূর্ণিমার **পূর্ণচন্দ্র** দেখা যাইবে। মহাশূন্যে **চন্দ্র ও পৃথিবী** তাহাদের ছায়ার একটি **অন্ধকারময়,** শঙ্কু-(cone)-আকৃতি **পুচ্ছ আকাশে** নিক্ষেপ করিয়া **কেমন ঘুরিয়া** বেড়ায় তাহা ৪২ নং চিত্র **হইতে ধারণা** করিতে পারিবে। এই **ছায়াময়** পূর্ণ **অন্ধকার-আবৃত স্থানকে প্রচ্ছায়া (umbra)** বলে। ইহার চারিধারে আর **একটি অর্ধ-আলোকিত স্থান রহিয়াছে লক্ষ্য কর।** ইহাকে **উপচ্ছায়া (penumbra)** বলে। **এই**

অঞ্চলে সূর্যের **গোলকের কিছু অংশের আলোক** পৃথিবীর পার্শ্ব দিয়া মহাশূন্যে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। চিত্রে অবস্থাটি স্পষ্ট হইবে।
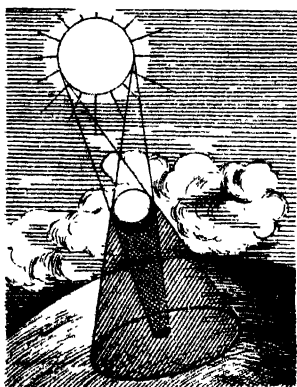
চিত্র নং ৪২ : মহাশূন্যে চাঁদের প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া যেমন করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়

আলোকের উৎসের বিস্তার থাকে বলিয়াই এই অর্ধ-ছায়া, অর্ধ-আলোক অঞ্চলের সৃষ্টি হয়। আলোকের উৎস যখন খুব ক্ষুদ্র অর্থাৎ বিন্দুর ন্যায় হইবে তখন উহার ছায়ায় উপচ্ছায়া থাকিতে পারে না।

এখন চন্দ্র উহার ভ্রমণপথে পৃথিবীর ছায়া স্পর্শ না করিয়া এই **উপচ্ছায়ার মধ্য দিয়া যাইলে** কি হইবে? তখন ঠিক সাধারণ গ্রহণ বলা চলিবে না। চন্দ্রপৃষ্ঠে একটা হালকা ছায়ার আবরণ সৃষ্টি হইবে মাত্র এবং উহাকে চন্দ্রের পূর্ণ আলোকিত অবস্থা হইতে সহজে পৃথক করা যাইবে না—অর্থাৎ আমরা পৃথিবী হইতে এই পরিবর্তন প্রায় কিছুই বুঝিতে পারিব না। (চিত্র নং ৪৪ দেখ)
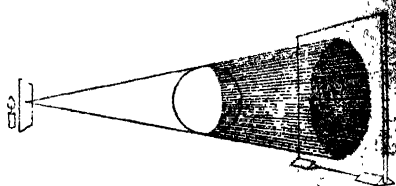
চিত্র নং ৪৩ : বিন্দু আকৃতির আলো হইতে উপচ্ছায়া সৃষ্টি হইতে পারে না

সূর্যগ্রহণ (solar eclipse)

৪০নং চিত্রটি আবার দেখ। এখানে চন্দ্র, সূর্য ও পৃথিবীর মধ্যে আসিয়াছে এবং পৃথিবীপৃষ্ঠের কিছু অংশে চন্দ্রের ছায়া পড়িয়াছে। লক্ষ্য কর—(১) পৃথিবী চন্দ্র হইতে অনেক বড় এবং (২) [illegible] একটি প্রকাণ্ড আলোকের গোলক—বলিয়া চন্দ্রের প্রচ্ছায়া পৃথিবীর [illegible] এক অংশের উপর মাত্র পড়িবে এবং উহাকে ঘিরিয়া পার্শ্বে বেশ খানিকটা অঞ্চলে উপরের নিয়মে আলো-ছায়া অর্থাৎ উপচ্ছায়ার সৃষ্টি [illegible]। এখন (১) মধ্যের পূর্ণ অন্ধকার স্থান হইতে সূর্যকে একেবারে [illegible]

যাইবে না এবং ঐ অঞ্চলে তখন **সূর্যের পূর্ণগ্রাস ঘটিবে**; (২) উপচ্ছায়া আবৃত অঞ্চলের কোনও স্থান হইতে **সূর্যের গোলকের সবটা দেখা**
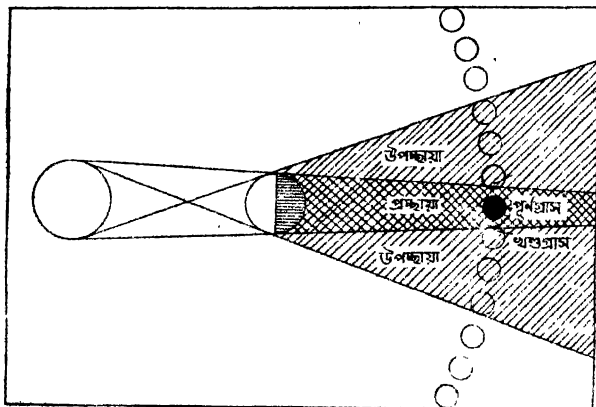
চিত্র নং ৪৪ : চন্দ্র পৃথিবীর প্রচ্ছায়া ও উপচ্ছায়া অতিক্রম করিয়া যাইতেছে

যাইবে না—কম বেশী অংশমাত্র দেখা যাইবে অর্থাৎ এইসব অঞ্চলে তখন **সূর্যের খণ্ডগ্রাস।**

চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণের মূল পার্থক্য—চন্দ্রগ্রহণে চন্দ্র পৃথিবীর ছায়ায় সম্পূর্ণ আবৃত হইয়া যায়। এজন্য তখন চন্দ্র পৃথিবীর কোনও স্থান হইতে দৃশ্যমান হইবে না। সূর্যগ্রহণ সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। এখানে সূর্যের উপর ছায়া পড়ার কোন প্রশ্নই নাই, কারণ সূর্য স্বয়ং আলোকিত পদার্থ, উহা পৃথিবী হইতে আড়াল হয় মাত্র এবং পৃথিবীর অল্প কিছু অঞ্চলে। এজন্য সূর্যগ্রহণ একসঙ্গে পৃথিবীর অল্প স্থান হইতেই দৃষ্টিগোচর হয়। তাছাড়া একই কারণে সূর্যগ্রহণ সমস্ত পৃথিবীতে
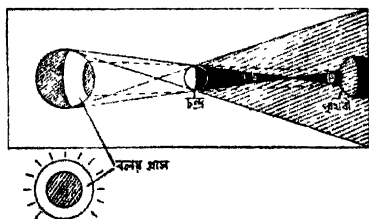
চিত্র নং ৪৫ : সূর্যের বলয়গ্রাস—পৃথিবীপৃষ্ঠের p চিহ্নিত অঞ্চল হইতে চন্দ্রের আড়াল পড়িয়া বলয়গ্রাস দৃষ্ট হইবে

চন্দ্রগ্রহণ অপেক্ষা **সংখ্যায়** অনেক অধিক বার ঘটে যদিও **কোনও একটি স্থানের** কথা ধরিলে চন্দ্রগ্রহণের সংখ্যাই অধিক মনে হইবে।

আবার কখনও আকাশে চন্দ্র, সূর্য, পৃথিবীর পরস্পরের অবস্থান যদি ৪৫ নং চিত্রের ন্যায় হয়—তাহা হইলে চিহ্নিত স্থানে সূর্যের আলোক-মণ্ডলের ঠিক মধ্যের গোল একটি অঞ্চল চন্দ্রের জন্য আড়াল পড়িয়া যাইবে এবং চারিপার্শ্বে আংটি বা বালার মত একটি আলোকিত চক্র দৃষ্টিগোচর হইবে। এই প্রকার গ্রহণকে সেইজন্য **বলয়গ্রাস** (বলয় অর্থাৎ বালা) বলে।

মনে রাখিতে হইবে যে চিত্রগুলিতে সূর্য, চন্দ্র ও পৃথিবীর আপেক্ষিক আয়তন বা দূরত্ব কোনটাই ঠিকমত দেখানো হয় নাই। কারণ উহা করিবার চেষ্টা করিলে এতটুকু কাগজে কিছুতেই সম্ভব হইত না। সেইজন্য তাহা না করিয়া পরস্পরের আয়তন ও দূরত্বের প্রয়োজনমত সামঞ্জস্য করিয়া লইয়া উহাদের সেই মত চিত্রিত করা হইয়াছে।

আলোকের গতি

আলোকের গতি কত ?

হঠাৎ প্রশ্নটি বুঝিতে অসুবিধা হইতে পারে। পূর্বেই বলা হইয়াছে—মনে করা যায় যে আলোক একপ্রকার তরঙ্গ। জলে একটি ঢিল ফেলিলে লক্ষ্য করিয়াছ যে তরঙ্গটি বৃত্তাকারে বিস্তৃত হইতে থাকে এবং শেষে জলের কিনারা পর্যন্ত পৌঁছায়। এই বিস্তারে নিশ্চয় সময় লাগে। তাই জলের কিনারার কাছে কোনও কাগজের নৌকা রাখিয়া দিলে তাহা ঢিলটি ফেলিবার **কিছুক্ষণ পরে** ঢেউয়ের আঘাতে নড়িতে থাকিবে। আলোক-তরঙ্গের বিস্তারে তেমনি সময় লাগে। ধর প্রকাণ্ড খোলা মাঠের মাঝখানে হাজার বাতির একটি ইলেকট্রিক ল্যাম্প জ্বালা হইল। **সঙ্গে সঙ্গে** সমস্ত মাঠ আলোকিত হইয়া উঠিল—অর্থাৎ জলের ঢেউয়ের ন্যায় সমস্ত মাঠে আলোকের ঢেউ বিস্তৃত হইয়া গেল। কিন্তু 'সঙ্গে সঙ্গে' মনে হইলেও অঙ্কের হিসাবে ঠিক সঙ্গে সঙ্গে নহে। কারণ ৫০০ গজ পথ যাইতেও আলোকের কিছু সময় লাগে—মোটামুটি

১ সেকেণ্ডের ৭ লক্ষ ভাগের একভাগ। কিন্তু এই পরিমাণ সময় আমাদের অনুভূতির কাছে এত নগণ্য যে আমরা বলিব সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু সূর্যের বেলা সে কথা বলা চলিবে না। কারণ সূর্যের দূরত্ব এত বেশী যে আলোকের মত এরূপ প্রচণ্ড গতিবিশিষ্ট পদার্থেরও সে পথ আসিতে বেশ সময় লাগে—৮ মিনিট ২৩ সেকেণ্ড। আলোকের গতির পরিমাণ এইবার বলা যাক—সেকেণ্ডে ১ লক্ষ ৮৬ হাজার মাইল!

পৃথিবীর নিকটতম নক্ষত্র Proxima Centauri হইতে আলোক আসিতে সময় লাগে প্রায় চার বৎসর। কল্পনা কর—কি অসম্ভব দূরত্ব! আর এমন সব নক্ষত্র কাছে যাহাদের আলোক পৃথিবীতে পৌঁছাইতে সময় লাগে হাজার হাজার বৎসর!

মহাশূন্যের গভীরতা একবার কল্পনা কর। মাথা যেন ঘুরিয়া যায়! এই সীমাহীন, অনন্ত আকাশে জ্যোতিষ্করাজির পরস্পরের দূরত্ব নির্দেশের জন্য সাধারণ মাপকাটি অর্থাৎ 'মাইল' হাস্যকর রকমের ক্ষুদ্র। তাই ইহার পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়—**আলোক-বৎসর** অর্থাৎ যে পথ যাইতে আলোকের ১ বৎসর লাগে। এই দূরত্ব গুণ করিয়া বাহির করা যায়—৫৮৮০,০০০,০০০,০০০ মাইল বা সংক্ষেপে ৫৮৮×১০^{১০}। [ভুল করিও না—**আলোক-বৎসর বলিতে সময় বোঝায় না, দূরত্ব বোঝায়।**]

এই সব অসম্ভব দূরত্বের একটি মজার তাৎপর্য আছে। মনে কর একটি তারা আজ কোনও কারণে ধ্বংস হইয়া নিভিয়া গেল। পৃথিবীর লোকে সে সংবাদ ধর ৪০ বৎসর পরে পাইবে—যখন তুমি চুল পাকিয়া, পেন্সন লইয়া প্রায় ঠাকুরদাদা হইয়া বসিয়াছ। মধ্যের এই ৪০ বৎসর আকাশে তারাটি না থাকা সত্ত্বেও আমরা উহাকে দেখিয়াই যাইব কারণ নিভিবার পূর্বে তাহার দেহ হইতে যে শেষ আলোকের রশ্মি নির্গত হইয়াছে তাহা আকাশে ৪০ বৎসর ধরিয়া ছুটিয়া তবে আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছিবে।

আলোক ও শব্দের গতির তুলনা—শব্দ হইল বাতাসের তরঙ্গ। ইহার গতিবেগ কত? সেকেণ্ডে প্রায় ১১০০ ফুট বা ঘণ্টায় ৭৫০ মাইল। বন্দুকের গুলি, জেটপ্লেন—ইহাদের গতি শব্দের চেয়েও বেশী। ইহার

সহিত আলোকের গতির তুলনাই চলে না। শব্দ ও আলোকের গতির এই বিরাট ব্যবধানের দরুণ আমরা কতকগুলি **মজার ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া** থাকি—

আকাশে বিদ্যুৎস্ফুরণ হইল কিন্তু বজ্রের আওয়াজ শুনিলাম কয়েক সেকেণ্ড পরে। কারণ কি? প্রকৃতপক্ষে মেঘে বিদ্যুৎস্ফুরণ ও তজ্জনিত আওয়াজ একই সঙ্গে ঘটিয়াছিল, কিন্তু মেঘ পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে ৩।৪ মাইল উপরে অবস্থিত বলিয়া মন্থরগতি শব্দের ঐ পথ আসিতে কয়েক সেকেণ্ড সময় লাগিল, আর আলোক আসিল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে।

এইবার পৃথিবীর উপরের দুই একটি ঘটনা লওয়া যাক—দূরে পুষ্করিণীর পাড়ে ধোপা কাপড় কাচিতেছে; লক্ষ্য করিলে দেখিবে—আছাড় মারিয়া ধোপা যখন পাটা হইতে কাপড় উঠাইয়া লইতেছে তখনই যেন আছাড়ের শব্দ হইল অর্থাৎ তোমার কাণে শব্দ আসিয়া পৌঁছিল। ইহারও ঐ একই কারণ। তেমনি—দূরে কাঠুরিয়ার কাঠ কাটা লক্ষ্য করিলে মনে হইবে কাঠ হইতে **কুড়ুলটি টানিয়া বাহির করিয়া লইবার সময় শব্দ হইতেছে, ঘা মারিবার সময় নহে।**

আলোকের প্রতিফলন

পূর্বে দেখিযাছ যে আলোক সরলরেখায় গমন করে। ইহা সব সময়ই সত্য। কিন্তু কতকগুলি অবস্থায় আলোকরশ্মি তাহার **গতিপথ পরিবর্তন করে।** এবার তাহারই আলোচনা করা যাইবে।

প্রথমেই বলিয়াছি, জগতের বস্তুরাজি হইতে আলোক-তরঙ্গ প্রতিফলিত হইযা আমাদের চোখে আসিয়া পৌঁছিতেছে বলিয়াই বস্তুরাজি আমাদের নিকট পরিদৃশ্যমান। মনে কর একটি বই টেবিলে রহিয়াছে। বইএর বিভিন্ন অংশ হইতে—উপরিভাগ, পার্শ্বভাগ, নিম্নভাগেরও কিছু অংশ হইতে—আলোক আসিয়া তোমার চক্ষে পড়িল এবং বইটির বিশেষ রূপ আলো-ছায়ার আকারে তোমার চক্ষে ফুটিয়া উঠিল (ফটোগ্রাফে যেমন হয়)। পৃথিবীর অধিকাংশ জিনিসেরই নিজের আলোক নাই। সূর্যের আলোক বা অন্য কোনও আলোক উহাদের উপর পড়িয়া এইভাবে

প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে পড়ে বলিয়া আমরা উহাদের বিশেষ আকৃতিটি দেখি। আলোক ব্যতীত আরও নানা ক্ষেত্রেই আমরা এই প্রতিফলনের ব্যাপার লক্ষ্য করিয়া থাকি। যেমন মেঝের উপর রবারের বল, মার্বেল ইত্যাদি ছুড়িয়া মারিলে উহারা আলোকের ন্যায় গতিপথ পরিবর্তন করিয়া ফিরিয়া আসে।

চিত্র নং ৪৬ : বস্তুর অমসৃণ তলের উপরিভাগ হইতে আলোক চারিদিকে প্রতিফলিত হইয়া আমরা উহাকে দেখি
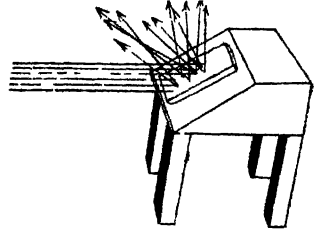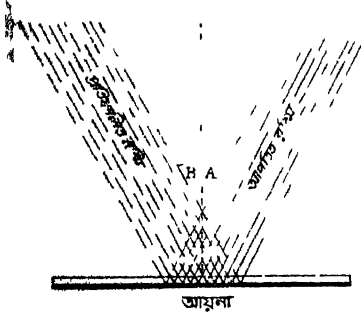
ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর আলোক-প্রতিফলন ক্ষমতা একপ্রকার নহে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে—**মসৃণ, উজ্জ্বল, হালকা** রং-এর তল (**surface**) অমসৃণ, অনুজ্জ্বল, গাঢ়বর্ণের তল অপেক্ষা অনেক ভাল প্রতিফলক। এই কারণে আয়নার কাচ খুবই ভাল প্রতিফলক কেননা ইহার পিছনে রূপার যে স্তর আছে তাহার প্রতিফলকের সব গুণই আছে। প্রতিফলনের কতকগুলি নির্দিষ্ট নিয়ম আছে, এখন সেগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

আয়না

চিত্র নং ৪৭ : মসৃণতলে আলোকের প্রতিফলন

মসৃণ সমতলে আলোকের প্রতিফলন

পরীক্ষা : টেবিলের উপর একটি লম্বা ফুলস্ক্যাপ কাগজ রাখিয়া উহার মাঝামাঝি একটি ভাঙ্গা লাইন (dotted line) AB টান। এখন উহার সহিত কোনও একটি কোণ করিয়া একটি লাইন—AC টান। A বিন্দুতে ফ্রেমবিহীন একটি ছোট আয়না খাড়াভাবে স্থাপন কর। আর দেখ—(চাঁদা
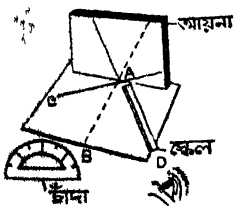
চিত্র নং ৪৮ : আলোকের প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষা (১)

ব্যবহার কর) যেন ভাঙ্গা লাইনটি আয়নার সমতলের উপর লম্বভাবে থাকে। টেবিলের উপর চোখ রাখিয়া এখন আয়নার মধ্যে তাকাইয়া দেখ এবং লাইনটির **প্রতিবিম্বের সহিত** এক লাইন করিয়া কাগজের উপর একটি রুলারের প্রান্তদেশ স্থাপন কর এবং রুলার বরাবর একটি লাইন AD টান।
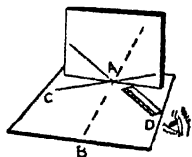
চিত্র নং ৪৯ : আলোকের প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষা (২) প্রতিফলন কোণ বড় করা হইয়াছে
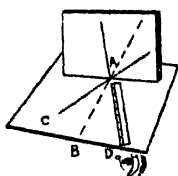
চিত্র নং ৫০ : আলোকের প্রতিফলনের সূত্রের পরীক্ষা (৩) প্রতিফলন কোণ ছোট করা হইয়াছে

এখন চাঁদা দিয়া মাপিয়া দেখ—

$$\angle CAB = \angle DAB$$

একবার আলোকের প্রতিফলনের নিয়মগুলি বিবৃত করিতে চেষ্টা করা যাক। তাহার পূর্বে সুবিধার জন্য কয়েকটি বৈজ্ঞানিক শব্দের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। CA হইল **আপতিত রশ্মির** পথ। ∠CAB কোণটিকে বলা হয় **আপতন কোণ**। A হইল **আপতন বিন্দু**, আর ∠DAB কোণ হইল **প্রতিফলন কোণ**। আমরা এখন পরীক্ষাটি হইতে বলিতে পারি—

প্রতিফলনের প্রথম নিয়ম।—আপতিত রশ্মি, আপতন বিন্দুতে অঙ্কিত **অভিলম্ব** ও প্রতিফলিত রশ্মি একই সমতলে অবস্থান করে।

প্রতিফলনের দ্বিতীয় নিয়ম—আপতন কোণ, প্রতিফলন কোণের সমান।

প্রথম নিয়ম সহজেই প্রমাণিত হয়, কারণ কাগজের উপর অঙ্কিত CA, BA, DA লাইনগুলি—যথাক্রমে আপতিত রশ্মি, অভিলম্ব ও প্রতিফলিত রশ্মি নির্দেশ করিতেছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে একটি লাইন দেখার অর্থ—উহার উপর হইতে আলোক প্রতিফলিত হইয়া চোখে আসিয়া পড়িতেছে।

আপতন কোণগুলির পরিমাণ বিভিন্ন করিয়া আমরা পরীক্ষাটি বারবার করিতে পারি এবং দ্বিতীয় নিয়মের সত্যতা প্রতিপন্ন করিতে পারি। তা ছাড়া, আয়নার মধ্যে লক্ষ্য করিয়া দেখ—ভাঙ্গা লাইন ও উহার প্রতিবিম্ব

একই সরলরেখায় অবস্থিত দেখিবে। ইহা হইতেও দ্বিতীয় নিয়মটি প্রমাণিত হইল—কেন ভাবিয়া বল।

প্রতিবিম্ব উৎপাদন

আলোকের এই প্রতিফলনের সূত্রগুলির উপরই প্রতিবিম্ব উৎপাদন নির্ভর করিতেছে।

বাতির C বিন্দু হইতে একটি আলোক-রশ্মি লম্বভাবে আয়না M M′ এর উপর পতিত হইয়া লম্বভাবে প্রতিফলিত হইয়া আসিল। ঐ C বিন্দু হইতে আর একটি রশ্মি আয়নার A বিন্দুতে পতিত হইয়া প্রতিফলনের নিয়মে AD লাইন ধরিয়া প্রতিফলিত হইয়া আসিল। CM-কে এবং DA-কে আয়নার পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিয়া দেওয়া গেল—উহারা C′ বিন্দুতে মিলিত হইল। **এই C′ বিন্দুই বাতির C বিন্দুর প্রতিবিম্ব।**

চিত্র নং ৫১ সমতল দর্পণে আলোকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া যেভাবে প্রতিবিম্ব দেখি

জ্যামিতির সাহায্যে দেখ—

CAM ও C′AM ত্রিভুজের মধ্যে—

$\angle CMA = \angle C'MA$ (সমকোণ বলিয়া)

$\angle CAM = \angle C'AM$ [কারণ $\angle CAB = \angle DAB$

$\therefore \angle CAM = \angle DAM' = \angle C'AM$]

AM সাধারণ বাহু ∴ ত্রিভুজ দুইটি সর্বসম

অতএব $CM = C'M$

সুতরাং বুঝা গেল C′ বিন্দু C বিন্দু হইতে সমদূরবর্তী।

এইভাবে বাতির আলোকের শিখা এবং আলোকিত বাতিটির প্রতিটি বিন্দুর অনুরূপ আর একটি বিন্দু আয়নার ভিতরে দেখা যাইবে, অর্থাৎ CL′, CL বাতির একটি প্রতিবিম্ব হইবে।

এখানে লক্ষ্য কর—

ক। বাতির C বিন্দু হইতে আয়নার উপর পতিত রশ্মিগুলি **প্রকৃতপক্ষে** C′ বিন্দুতে মিলিত হইতেছে না। কিন্তু আয়নার সম্মুখে চক্ষু স্থাপিত করিলে উহারা C′ বিন্দু হইতে আসিতেছে **মনে হইবে**। এই অবস্থায় C′ বিন্দু বাতির C বিন্দুর **অসৎ** (virtual) প্রতিবিম্ব।

খ। আসল বাতিটি হইতে আলোক আসিয়া আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া আমাদের চোখে প্রবেশ করিলেও আসল বাতিটিকে কিন্তু আমরা দেখিতে পাইতেছি না। কারণ আমাদের চোখ **বাঁকা পথে আলোক রশ্মিকে** অনুসরণ করিতে পারে না।

আলোকের প্রতিফলনের এই নিয়মগুলির সুযোগ লইয়া নানা প্রকার মজার কৌশল উদ্ভাবন করা যাইতে পারে। এইরূপ একটি পরিচিত যন্ত্রের এখানে উল্লেখ করা যাইতেছে—

পেরিস্কোপ (periscope : peri = চারিপাশ, scope = দেখিবার যন্ত্র)

ফুটবল খেলার মাঠে টিকিট কাটিয়া ভিতরে দাঁড়াইয়াও ভিড়ের মধ্যে অনেক সময় নিশ্চয় আফশোষ হইয়াছে যে আর একটু লম্বা হইলাম না কেন, কারণ তাহাতে আরও উপরে চোখ রাখিয়া সামনের বাধা অতিক্রম করিয়া ভিতরের খেলা দেখিবার সুবিধা হইত। পেরিস্কোপ যন্ত্র তোমার এই বেঁটে হইবার আফশোষ ঘুচাইয়া দিবে—কেমন করিয়া তাহা চিত্রে দেখ :
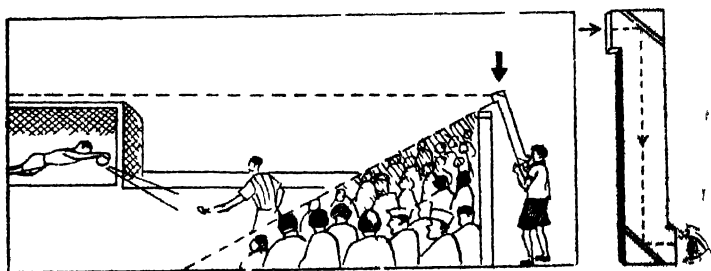
চিত্র নং ৫২ : বামে—তুমি পেরিস্কোপের মাথার সমান উঁচু হইয়া নির্বিবাদে ফুটবল খেলা দেখিতেছ ; ডাইনে—পেরিস্কোপের গঠন ও কার্যপ্রণালী

একটি কাঠের চারকোণা লম্বা বাক্সে দুইখানি সমতল দর্পণ বাক্সের দৈর্ঘ্যের সহিত ৪৫° কোণে বসানো আছে। প্রতিফলনের নিয়মে

দেখ—খেলার মাঠ হইতে আগত একটি আলোকরশ্মি উপরের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া বাক্সের দৈর্ঘ্যের সহিত সমান্তরাল ভাবে নামিয়া আসিয়া নীচের দর্পণে দ্বিতীয়বার প্রতিফলিত হইয়া তোমার চোখে প্রবেশ করিতেছে এবং তুমি নীচের আয়নার পিছনে তোমার চোখের তলে খেলার মাঠের দৃশ্য দেখিতে পাইতেছ—সামনের প্রাচীর বা লোকের ভীড় তোমার দৃষ্টিপথে বাধা সৃষ্টি করিতে পারিবে না। কারণ তোমার চক্ষু প্রকৃতপক্ষে নীচের আয়নার সামনে স্থাপিত থাকিলেও কার্যত উপরের আয়নার উচ্চতায় স্থাপিত রহিয়াছে।

যুদ্ধের সময় **ডুবো জাহাজে** (submarine) জলের নীচে হইতে এই প্রকার (অবশ্য অনেক উন্নত ধরনের) পেরিস্কোপের সাহায্যে জলের উপরে শত্রুর জাহাজের গতিবিধি বা পরিখার (trench) মধ্য হইতে জমির উপরে বিপক্ষ সৈন্যের কার্যকলাপ দেখিতে পাওয়া যায়।
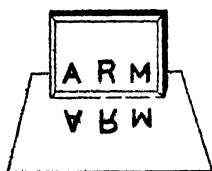
চিত্র নং ৫৩ : সমতল দর্পণে উলটা লেখা সোজা দেখায়
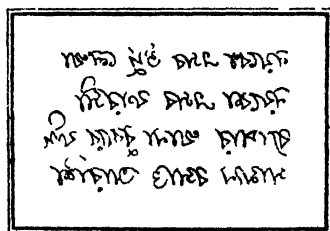
চিত্র নং ৫৪ : কি লেখা? উর্দু না পারসী?

এইবার গোলীয় দর্পণে প্রতিফলনের নিয়মগুলি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক—

গোলীয় দর্পণে (spherical mirror) প্রতিফলন

একটি টর্চ লাইট পরীক্ষা করিলে দেখিতে পাইবে বাল্বটি একটি প্রায় অর্ধ-বর্তুলাকার আয়নার কেন্দ্রে স্থাপিত রহিয়াছে। মোটর গাড়ীর আলোতেও একই রকম ব্যবস্থা। আরও লক্ষ্য কর—এখানে বর্তুলাকার আয়নার **অবনত পৃষ্ঠ** আয়নার কাজ করিতেছে—অর্থাৎ বাল্বের দিকে মুখ করিয়া আলোকরশ্মি প্রতিফলিত করিতেছে। এই প্রকার বর্তুলাকার আয়নাকে **অবতল আয়না** (concave mirror) বলে। আর যদি

এইপ্রকার বর্তুলাকার আয়নার বাহিরের **ফোলান দিকটি** প্রতিফলন তল হয় তাহা হইলে উহাকে **উত্তল আয়না** (convex mirror) বলে।

চিত্র নং ৫৫ : উপরে অবতল ও নীচে উত্তল দর্পণ—বাম পার্শ্বে লম্বচ্ছেদ সহ

বর্তুলাকার আয়নায় প্রতিবিম্ব গঠনের সূত্রগুলি বুঝিতে হইলে আয়নার গঠনের কতকগুলি মূল বিষয়ের সহিত পরিচিত হওয়া প্রয়োজন—

আয়নার বর্তুলাকার পৃষ্ঠের মধ্য বিন্দুকে **মেরু** (A = pole) বলে এবং বর্তুলাকার তলটি যে সমগ্র বর্তুলের অংশ সেই বর্তুলের কেন্দ্রকে **বক্রতা কেন্দ্র** (C = centre of curvature) বলে। মেরু ও বক্রতাকেন্দ্রের যোগকারী রেখাকে **প্রধান অক্ষ** (principal axis) বলে।

দর্পণের ফোকস্‌-ও ফোকল্‌ দূরত্ব—

একটি **অবতল আয়নায়** প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে এক গুচ্ছ সূর্যরশ্মি আসিয়া পড়িলে ঐ রশ্মি প্রতিফলিত হইয়া সম্মুখে একটি
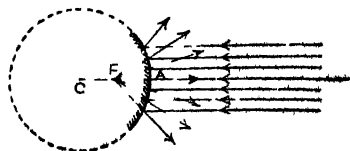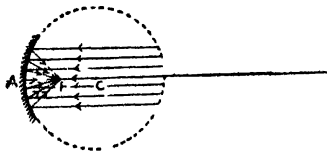
চিত্র নং ৫৬ : বামে—অবতল দর্পণে সমান্তরাল রশ্মি ফোকসে কেন্দ্রীভূত হয় ; ডাইনে—উত্তল দর্পণে সমান্তরাল রশ্মি ফোকস হইতে বিকীরিত হইতেছে মনে হয়

বিন্দুতে মিলিত হইবে। ঐ বিন্দুকে অবতল আয়নার **প্রিন্সিপাল ফোকস** (F = principal focus) বলা হয়।

উত্তল আয়নায় অনুরূপ অবস্থায় প্রতিফলিত রশ্মিগুলিকে পশ্চাৎ

দিকে বর্ধিত করিলে ঐরূপ একটি বিন্দুতে মিলিত হইবে। আয়নার মধ্যে তাকাইলে ঐ বিন্দুটি হইতে **আলোক আসিতেছে বলিয়া বোধ হইবে**। উত্তল আয়নার এইটিই হইল **প্রিন্সিপাল ফোকস**। ছবিতে বোঝা যাইতেছে—এইটি অসৎ বিন্দু।

দর্পণের মেরু হইতে ফোকসের দূরত্বকে **ফোকস্-দূরত্ব** (focal length) বলা হয়।

বর্তুলাকার আয়নায় প্রতিবিম্ব গঠন

এখানে মনে রাখিতে হইবে যে সমতল দর্পণের ক্ষেত্রে প্রতিফলনের যে সাধারণ নিয়মগুলি বিবৃত করা হইয়াছে বর্তুলাকার আয়নার ক্ষেত্রেও ঠিক সেই নিয়মগুলিই বর্তমান থাকিবে। শুধু অবস্থার পরিবর্তনের সহিত উহাদের প্রয়োজন মত সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হইবে।

নিম্নের চিত্রে LAN একটি অবতল দর্পণ। C উহার বক্রতা কেন্দ্র, F প্রিন্সিপাল ফোকস্। PQ একটি মোমবাতি F ও C এর মধ্যে কোনও স্থানে লম্বভাবে রাখা হইয়াছে। এখন আয়নায় উহার প্রতিবিম্ব কোথায়, কি ভাবে সৃষ্টি হইবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক—
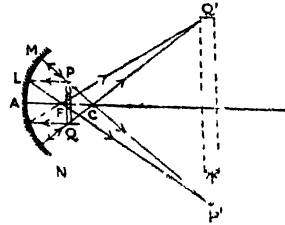
চিত্র নং ৫৭ : অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (১)

পূর্বের ন্যায় P বিন্দু হইতে একটি রশ্মি প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল করিয়া টানা যাক। উহা আয়নার L বিন্দুতে পতিত হইল। উহা প্রতিফলিত হইয়া কোন পথে যাইবে? ফোকসের সংজ্ঞা অনুযায়ী উহা ফোকসের (F) মধ্য দিয়া যাইবে। এইবার আর একটি সুবিধাজনক রশ্মি লওয়া যাক—PM—উহা লম্বভাবে আয়নার পৃষ্ঠে পড়িয়াছে অর্থাৎ উহা P বিন্দু দিয়া অংকিত আয়নার বর্তুলের ব্যাসার্ধ, সুতরাং ঐ পথেই ফিরিয়া আসিবে। MC ও LF বর্ধিত করায় P′ বিন্দুতে মিলিত হইল। এক্ষণে P′, মোমবাতির P বিন্দুর প্রতিবিম্ব। এইভাবে বিচার করিয়া

P′ হইতে প্রধান অক্ষের উপর পাতিত P′Q′ লম্ব PQ মোমবাতির সম্পূর্ণ প্রতিবিম্ব নির্দেশ করিবে।

এখানে লক্ষ্য কর—

(১) প্রতিবিম্বটি **প্রকৃতই** প্রতিফলিত আলোকরশ্মির দ্বারা গঠিত বলিয়া ইহা সদ্‌বিম্ব (real image);

(২) প্রতিবিম্বটি আসল বস্তু অপেক্ষা বড ;

(৩) প্রতিবিম্বটি উলটাভাবে পড়িয়াছে।

নীচের চিত্রগুলিতে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিবিম্ব গঠনের অবস্থাগুলি একই প্রণালীতে আলোকরশ্মির রেখা টানিয়া (প্রয়োজন হইলে মিলিত
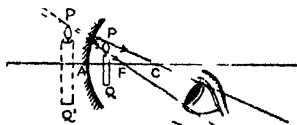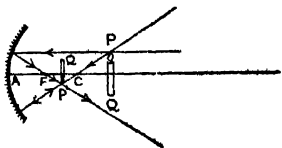
চিত্র নং ৫৮ : অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (২)—বস্তুর ভিন্ন অবস্থান

চিত্র নং ৫৯ : অবতল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (৩)—এই অবস্থানেই দাড়ি কামানো হয়

করিবার জন্য রেখাগুলি পশ্চাৎদিকে বর্ধিত করিয়া) দেখানো হইয়াছে। এইগুলি হইতে **অবতল আয়নায়** লক্ষ্য কর—

(১) বস্তুটি কেন্দ্র হইতে আয়নার বিপরীত দিকে অর্থাৎ দূরের দিকে থাকিলে—সৎ, ক্ষুদ্রতর ও উলটা প্রতিবিম্ব গঠিত হইবে।

(২) বস্তুটি কেন্দ্রে স্থাপিত হইলে—সৎ, সমান ও উলটা প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হইবে।

(৩) বস্তুটি কেন্দ্র ও ফোকসের মধ্যে অবস্থিত হইলে সৎ, বৃহত্তর ও উলটা প্রতিবিম্ব হইবে।

(৪) বস্তুটি ফোকস ও আয়নার মধ্যে অবস্থিত থাকিলে—অসৎ, বৃহত্তর ও সোজা প্রতিবিম্ব হইবে।

উত্তল আয়নায় লক্ষ্য কর—

বস্তুটি যেখানেই অবস্থিত থাকুক না কেন, প্রতিবিম্বটি সর্বদাই অসৎ, সোজা ও ক্ষুদ্রতর হইবে।
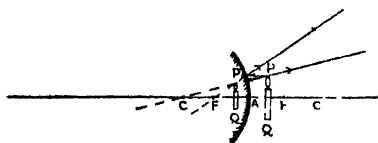
চিত্র নং ৬০ : উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (১)
—বস্তুর অবস্থান আয়না ও ফোকসের মধ্যে
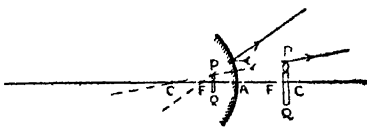
চিত্র নং ৬১ : উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (২)
—বস্তুর অবস্থান ফোকস ও কেন্দ্রের মধ্যে
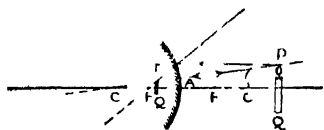
চিত্র নং ৬২ : উত্তল দর্পণে প্রতিবিম্ব গঠন (৩)
বস্তুর অবস্থান কেন্দ্র হইতে দূরে

অবতল ও উত্তল আয়নার ব্যবহার—আমরা দেখিয়াছি যে অবতল আয়নায় প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল রশ্মিগুলি আয়নার মধ্যে প্রতিফলিত হইয়া ফোকসের মধ্য দিয়া গমন করে। বিপরীতক্রমে, আলোকিত বস্তুটি ফোকসে স্থাপন করিলে উহা হইতে নির্গত আলোক রশ্মিগুলি দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরালভাবে বাহির হইয়া আসিবে। এখন বোধ হয় বোঝা যাইতেছে

টর্চ ও মোটর গাড়ীর আলো

টর্চ বা মোটর গাড়ীর আলোতে একটি বাল্ব (bulb) অবতল আয়নার ফোকসের কাছাকাছি স্থাপিত থাকে কেন। কারণ, উহার ফলে বাল্ব হইতে বিকীর্ণ সমস্ত আলোক এলোমেলোভাবে ছড়াইয়া নষ্ট না হইয়া জমাট, একগুচ্ছ রশ্মির আকারে সোজাভাবে রাস্তা বা লক্ষ্যণীয় বস্তুর উপর পড়িতে পারে।
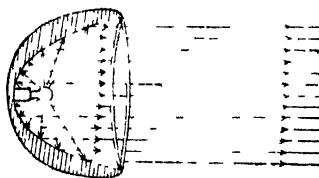
চিত্র নং ৬৩ : মোটর গাড়ীর
আলোর অবতল দর্পণ

অবতল আয়নার কাছাকাছি মুখ রাখিলে উহার একটি বর্ধিত, অসৎ প্রতিবিম্ব আয়নার মধ্যে দেখা যাইবে, এজন্য কেহ কেহ দাড়ি কামাইবার জন্য এরূপ আয়না ব্যবহার করিয়া থাকেন। তোমরা একটি চকচকে চামচের উত্তল ও অবতল দুই পার্শ্বে একটি পেন্সিলের মুখ ধরিয়া উহার প্রতিবিম্ব কেমন হয় পরীক্ষা করিয়া দেখ।

উত্তল আয়নায় (১) **বস্তুটি কাছে কিংবা দূরে, যে কোনও অবস্থানে** থাকিলে উহার একটি অসৎ প্রতিবিম্ব আয়নার মধ্যে দেখা যাইবে এবং (২) চারিপার্শ্বের **অনেকখানি জায়গার দৃশ্য** আয়নায় প্রতিফলিত হইবে বলিয়া মোটর গাড়ীতে ড্রাইভারের সিটের সামনে এরূপ একটি আয়না থাকে, যাহাতে পশ্চাৎ-

ড্রাইভারের আয়না
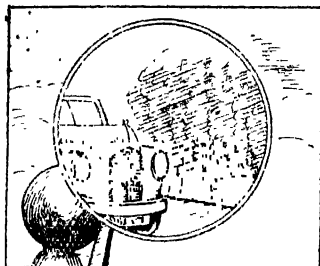
চিত্র নং ৬৪ : মোটর-চালকের সম্মুখে উত্তল দর্পণে পিছনের গাড়ীর প্রতিবিম্ব দেখা যাইতেছে
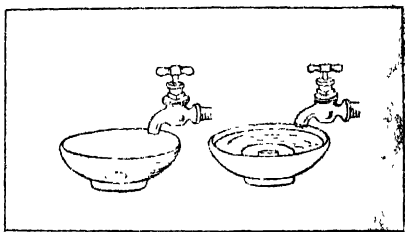
চিত্র নং ৬৫ : টাকার ম্যাজিক—অদৃশ্য টাকা জল দিলে আবার দৃষ্টিগোচর হইতেছে

দিকের গাড়ী প্রভৃতির প্রতিবিম্ব আয়নার মধ্যে দেখিয়া ড্রাইভার প্রয়োজনমত গাড়ী-চালনা নিয়ন্ত্রণ করিতে পারেন।

আলোকের প্রতিসরণ (Refraction of Light)

একটি পুরানো ম্যাজিকের বর্ণনা করা যাক :—

পরীক্ষা : টেবিলের উপর একটি অল্প কানা-উঁচু পাত্র (**basin**) বসাইয়া উহার মধ্যে একটি ধাতুর টাকা রাখ এবং যতক্ষণ **পর্যন্ত** টাকাটি দেখা যায় পিছু হাঁটিয়া যাও। এইবার একটু পিছাইয়া গিয়া দেখ—টাকাটি **সম্পূর্ণ অদৃশ্য হইয়া** গেল, আর উহা দেখা যাইতেছে না। এখন বাটিতে কাহাকেও এমনভাবে জল ঢালিতে বল যেন টাকাটি নড়িয়া না যায়—দেখিবে আবার ধীরে ধীরে টাকাটি দৃষ্টিগোচর হইবে।

টাকার ম্যাজিক

কেন এমন হইল ? ইহা আলোকের **প্রতিসরণের** একটি ব্যাপার। বিষয়টিকে তাহা হইলে গোড়া হইতে আলোচনা করা যাক।

আমরা দেখিয়াছি যে আলোক সরল রেখায় চলে। এই চলার পথে কোনও অস্বচ্ছ, মসৃণ পদার্থ থাকিলে উহার উপর পড়িয়া আলোক প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ মুখ ফিরাইয়া নির্দিষ্ট কোণে অন্য দিকে (আবার অবশ্য সরল রেখায়) ছুটিয়া চলে। এই প্রতিফলনের সূত্রগুলি আমরা আলোচনা করিয়াছি।

চিত্র নং ৬৬ : কাচের ব্লকের মধ্যে আলোকের প্রতিসরণ
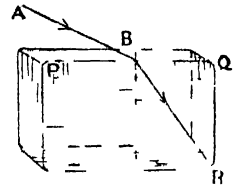
কিন্তু মনে কর, আলোক কোনও স্বচ্ছ পদার্থের মধ্য দিয়া (যেমন জল বা বাতাস) চলিতে চলিতে আর একটি **ভিন্নজাতীয় স্বচ্ছ পদার্থের** মধ্যে আসিয়া পৌঁছাইল (ধর কাচ) যাহার ঘনত্ব প্রথম মাধ্যমের অপেক্ষা কম বা বেশী। এখন আলোক কি ঠিক পূর্বের পথ ধরিয়াই চলিতে থাকিবে, না বাঁকিয়া যাইবে? নীচের চিত্রে ব্যাপারটি দেখানো হইয়াছে—

AB আলোক রশ্মি বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া PQRS—একটি কাচের ব্লকের (block) উপর B বিন্দুতে আসিয়া পড়িয়াছে। PQ ব্লকটির উপরিতলে অবস্থিত একটি রেখা, সুতরাং বাতাস ও কাচের সীমা রেখা। লক্ষ্য কর—আলোক রশ্মি AB পথ হইতে কিছু বাঁকিয়া BR পথে কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। যদি NBN' রেখা B বিন্দুতে PQ রেখার উপর অভিলম্ব হয় তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি যে বাতাস হইতে কাচের মধ্যে প্রবেশ করিয়া আলোক-রশ্মি আপতন বিন্দুতে **অভিলম্বের দিকে** বাঁকিয়াছে। এক্ষেত্রে কাচ বাতাস অপেক্ষা ঘন মাধ্যম। অতএব আমরা বলিতে পারি—

প্রতিসরণের সূত্র

(১) কোন মাধ্যম হইতে আলোক **ঘনতর** মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসরিত রশ্মি আপতন বিন্দুতে **অভিলম্বের দিকে** (towards normal) বাঁকিয়া যায়। অর্থাৎ প্রতিসরণ কোণ ($\angle$RBN') আপতন কোণ ($\angle$ABN) অপেক্ষা ছোট হইবে।

(২) বিপরীতক্রমে, কোনও মাধ্যম হইতে আলোক **লঘুতর** মাধ্যমে প্রবেশ করিলে প্রতিসরিত রশ্মি **অভিলম্ব হইতে দূরের দিকে** (away

from normal) বাঁকিয়া যায়। ঐ একই চিত্রে আমরা যদি উলটা দিক হইতে মনে করি আলোকরশ্মি RB পথে কাচ হইতে বায়ুস্তরে B বিন্দুতে **আপতিত** হইয়াছে, তাহা হইলে উহা BA পথে প্রতিসরিত হইবে।
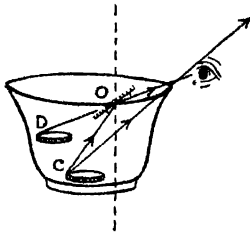
চিত্র নং ৬৭ : জল ঢালিলে বাটির কিনারা মুদ্রাটিকে আর আড়াল করিতে পারে না

এইবার টাকার ম্যাজিকটির রহস্য উদ্ধার করা যাইবে—

টাকার ম্যাজিকের রহস্য

বাটিটির **শূন্য অবস্থায়** টাকা হইতে বহির্গত আলোকরশ্মি বাটির কিনারা ঘেঁষিয়া সোজা পথে **চোখের কিছু উপর দিয়া** চলিয়া যাইতেছে—সুতরাং তুমি টাকাটিকে দেখিতে পাইতেছ না। **জল ভর্তি করিলে** আলোকরশ্মি জলের উপরিতলে কিনারা হইতে কিছু দূরে O বিন্দুতে প্রতিসরণের নিয়মে বাঁকিয়া সহজেই তোমার চোখে প্রবেশ করিতে পারিতেছে, অর্থাৎ O বিন্দুতে একটি আয়না স্থাপিত করিলে যাহা হইত তাহাই হইতেছে এবং প্রতিবিম্ব গঠনের নিয়মে তুমি D বিন্দুতে (অর্থাৎ জলের মধ্যে কিছু উপরে) টাকার C বিন্দুটির প্রতিবিম্ব দেখিতেছ। এই অবস্থায় সম্পূর্ণ টাকাটির নূতন অবস্থান দেখানো হইল।

আলোকের এই প্রতিসরণের কারণে অনেক মজার ঘটনা ঘটে, ৬৮, ৬৯ ও ৭০ নং চিত্র দেখিলে বুঝিতে পারিবে :—
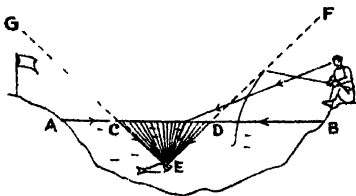
চিত্র নং ৬৮ : মাটির উপরে মাছের দৃষ্টির সীমানা (∠GEF) কত সঙ্কীর্ণ দেখ ; আর ACDB রেখা অর্থাৎ সরল কোণ, মানুষের দৃষ্টির সীমানা
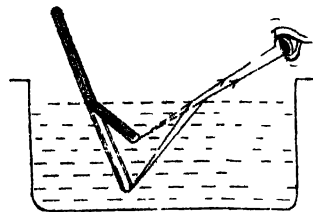
চিত্র নং ৬৯ : জলে আংশিক ডুবানো লাঠি ভাঙ্গা দেখায়

এইবার **লেন্স**-এর মধ্য দিয়া প্রতিসরণের বিষয়টি আলোচনা করা যাক :—

চিত্র নং ৭০ : জলে খানিক ডোবানো পেন্সিল কত মোটা দেখাইতেছে

লেন্স (lens)—উভয় পৃষ্ঠ সমতল ও সমান্তরাল এরূপ কাচের ব্লকের মধ্য দিয়া প্রতিসরণের ব্যাপার আলোচনা করা হইয়াছে। এক পৃষ্ঠ বা উভয় পৃষ্ঠ উত্তল বা অবতল এরূপ কাচকে **লেন্স** বলে। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার লেন্সের গঠন দেখানো হইল—
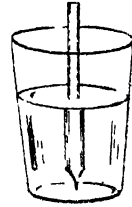
যে লেন্স মধ্যে পুরু এবং দুই প্রান্তে পাতলা তাহাকে **উত্তল লেন্স** (convex lens) এবং যে লেন্স মধ্যে পাতলা এবং উভয় প্রান্তে পুরু তাহাকে **অবতল লেন্স** (concave lens) বলে। লেন্স, বিশেষ করিয়া উত্তল লেন্স, আমাদের জীবনে নানা প্রয়োজনে লাগে। এখানে উত্তল লেন্সের প্রতিসরক ধর্ম ও উহার দুই একটি **ব্যবহারের** কথা বলা হইল—

চিত্র নং ৭১ : বিভিন্ন আকৃতির লেন্স ; ১—দুই-পিঠ উত্তল ; ৪—দুই পিঠ অবতল ইত্যাদি

উত্তল লেন্স তোমরা হয়তো (১) **পড়িবার কাচ** (reading glass) হিসাবে ব্যবহার করিয়া থাকিবে। এইভাবে ব্যবহার করিলে উহার মধ্য দিয়া সকল বস্তু বড় দেখা যায়। বয়স্ক লোকেদের চশমার কাচ এই
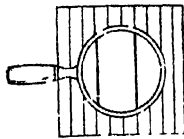
চিত্র নং ৭২ : কাগজের লাইনের একটি ঘর উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়া তিনটি ঘরের সমান দেখাইতেছে
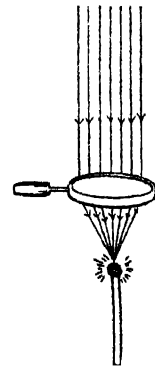
চিত্র নং ৭৩ : উত্তল লেন্স, দাহক-কাচের কাজ করিতেছে

লেন্সে তৈয়ারী। তোমরা কখনও উহাকে খেলাচ্ছলে (২) দাহক-কাচ (burning glass) হিসাবেও ব্যবহার করিয়া থাকিবে। আবার কখনও উহাকে (৩) **ক্যামেরার** মত দূরবর্তী বস্তুর প্রতিচ্ছবি তুলিবার উদ্দেশ্যেও ব্যবহার করিয়া থাকিবে।
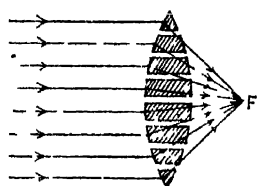
চিত্র নং ৭৪ : উত্তল লেন্স্ কেমন আলোকরশ্মি কেন্দ্রীভূত করে

চিত্রে দেখ সূর্যের সমান্তরাল রশ্মিগুলি লেন্স্ ভেদ করিয়া O বিন্দুতে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে। মনে রাখিতে হইবে **ইহা লেন্স্‌টির কোনও বিশেষ শক্তিবলে** ঘটে নাই, প্রতিসরণের সাধারণ সূত্রগুলির নিয়মেই ঘটিয়াছে। বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি লেন্স্‌কে খণ্ড খণ্ড কতকগুলি সাধারণ কাচের ব্লকের সমষ্টি বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি ; তাহা হইলে ইহার সূত্রগুলি যে সাধারণ নিয়মেরই অন্তর্গত বুঝা যাইবে।

এখানে পূর্বের ন্যায় লেন্স্ সংক্রান্ত কতকগুলি মূল বিষয় ও পরিভাষার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলে আলোচনার সুবিধা হইবে—

ক। লেন্সের উভয় পৃষ্ঠের বক্রতা কেন্দ্র দুইটির সংযোজক সরল রেখাকে **প্রধান অক্ষ** (principal axis) বলে।

খ। সাধারণ ব্যবহারের লেন্স্ পাতলা হয় বলিয়া আমরা মনে করিতে পারি যে এই রেখাটি লেন্সের ভিতরে একটিমাত্র বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইবে। এই বিন্দুটিকে লেন্সের **রশ্মীয় কেন্দ্র** (optical centre) বলে। কোনও রশ্মি এই বিন্দুর মধ্য দিয়া যাইলে উহা প্রতিসরিত না হইয়া প্রায় সোজা ঐ পথেই বাহির হইয়া যাইবে ধরা যাইতে পারে।

গ। বর্তুল দর্পণের ন্যায় এখানেও লেন্সের উপর পতিত সমান্তরাল রশ্মিগুলি উহার ভিতর দিয়া প্রতিসরিত হইয়া একটি বিন্দুতে মিলিত হয় ; উহাকে **ফোকস** (focus) বলে। এইরূপে, লেন্সের উভয় পার্শ্বে দুইটি ফোকস থাকিবে।

উত্তল লেন্সের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠন—

এখন আমরা উত্তল লেন্সের সাহায্যে প্রতিবিম্ব গঠনের প্রণালী আলোচনা করিব :—

চিত্র নং ৭৫ : উত্তল লেন্স্ কাচ সহায়ে গাছ বরে—বস্তুর উল্টা প্রতিবিম্ব গঠন

PQ একটি গাছ; উহা লেন্সের সম্মুখে ফোকসের বাহিরে অবস্থিত। ইহার প্রতিবিম্ব কোথায়, কি রকম হইবে—বাহির করিতে হইবে। আগের মত ইহার উপর যে কোনও একটি P বিন্দু লইয়া উহার প্রতিবিম্ব বাহির করা যাক। পূর্বের নিয়মে P হইতে দুইটি আলোকরশ্মির পথ আঁকিয়া উহাদের সংযোগস্থল বাহির করিলেই P বিন্দুর প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে। একটি রশ্মি হইল প্রধান অক্ষের সহিত সমান্তরাল যে রশ্মি, যাহা লেন্সের মধ্য দিয়া প্রতিসরিত হইয়া অপর পার্শ্বে ফোকসের মধ্য দিয়া যাইবে। আর একটি হইল যাহা লেন্সের বর্তুলীয় কেন্দ্রের মধ্য দিয়া সোজা বাহির হইয়া যাইবে। এই উভয় রশ্মি যে P′ বিন্দুতে মিলিত হইল ইহাই হইল P বিন্দুর প্রতিবিম্ব। এই ভাবে গাছটির প্রত্যেক বিন্দুর প্রতিবিম্ব আঁকিলে P′Q′ সমগ্র গাছটির প্রতিবিম্ব দাঁড়াইবে।
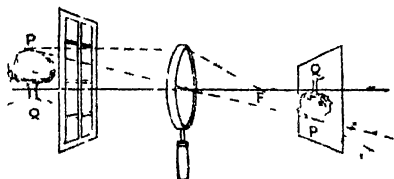
নীচের চিত্রে PQ বস্তুটির বিভিন্ন অবস্থান—P_1Q_1, P_2Q_2, P_3Q_3 P_4Q_4, এবং উহাদের প্রতিবিম্ব—যথাক্রমে $P_1'Q_1'$, P'_2Q_2', $P'_3Q'_3$, $P'_4Q'_4$ পূর্বের নিয়মে দুইটি করিয়া আলোকরশ্মির রেখা টানিয়া দেখানো হইয়াছে। এখন লক্ষ্য কর—
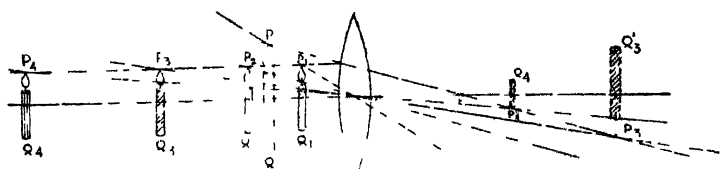
চিত্র নং ৭৬ : উত্তল লেন্সে বস্তুর বিভিন্ন অবস্থানে প্রতিবিম্ব গঠন

(ক) বস্তুটি ফোকসের অর্থাৎ **ফোকস-দূরত্বের** (focal length) **বাহিরে থাকিলে—**

(১) সকল ক্ষেত্রে সৎ, উলটা প্রতিবিম্ব হইবে (P_3Q_3 ও P_4Q_4)।

(২) বস্তুর অবস্থান যদি ফোকস এবং ফোকসের দুইগুণ দূরত্বের মধ্যে হয় তাহা হইলে প্রতিবিম্ব বড় হয়। **ম্যাজিক লণ্ঠন, ফটো বড় করা** (enlargement) প্রভৃতি প্রয়োজনে এইরূপ ব্যবস্থার সুযোগ লওয়া হয় (P_3Q_3)।

(৩) বস্তুর অবস্থান যদি ফোকস-দূরত্বের দুইগুণ অপেক্ষা বেশী দূরে হয় তাহা হইলে প্রতিবিম্ব ছোট হয় এবং দূরত্ব যতই বাড়িতে থাকে প্রতিবিম্বও ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইতে থাকে (P_4Q_4)।

(খ) বস্তুটি **ফোকসের উপর থাকিলে—**

নির্দিষ্ট রশ্মি দুইটি সমান্তরাল হয়, সুতরাং কোনও প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না (P_2Q_2)।

(গ) বস্তুটি ফোকস হইতে নিকটে অর্থাৎ **ফোকস-দূরত্বের মধ্যে থাকিলে—**

রশ্মি দুইটি প্রতিসরিত হইয়া—অপসারিত হয় (diverge), সুতরাং **বিপরীত দিকে বাড়াইয়া দিলে** একটি বিন্দুতে মিলিত হইবে। পূর্বের নীতি অনুযায়ী এক্ষেত্রে বস্তুটির একটি **অসৎ, সোজা** ও **বর্ধিত প্রতিবিম্ব** (P'_1Q_1') গঠিত হয়। বস্তুর এই অবস্থানে লেন্সের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিলে বস্তুটির একটি বর্ধিত প্রতিবিম্ব দেখা যাইবে—অর্থাৎ এক্ষেত্রে লেন্স্‌টি একটি **বিবর্ধক কাচ** (magnifying glass বা reading glass) (৭২নং চিত্র) হিসাবে বা **বয়স্কদের চশমার** কাজ করিবে। ঘড়ির দোকানে কারিগর চোখে যে ছোট চোঙ্গাটি পরিয়া কাজ করেন উহার মুখে একটি উত্তল লেন্স্ লাগানো আছে এবং উহা উপরোক্ত অবস্থানে ব্যবহৃত হইতেছে।

এইবার দূরবীক্ষণের কার্যপ্রণালী বুঝিতে চেষ্টা করা যাক :—

দূরবীক্ষণ (telescope)

কল্পনা কর—PQ বস্তুটিকে লেন্সটির (বাস্তব) ফোকস-দূরত্বের দুইগুণ অপেক্ষা বেশী দূরে স্থাপিত করা হইয়াছে। তাহা হইলে পূর্বের নিয়মে বস্তুটির

একটি সৎ, উলটা ও ক্ষুদ্র প্রতিবিম্ব $P'Q'$ পাওয়া যাইবে। এইবার $P'Q'$ প্রতিবিম্বটিকে **দ্বিতীয় বার বস্তু হিসাবে** স্থাপন করিয়া সামনে আর একটি লেন্স্ (অভিনেত্র) এমন অবস্থানে রাখ (উপরে বর্ণিত (গ) অবস্থান দেখ)
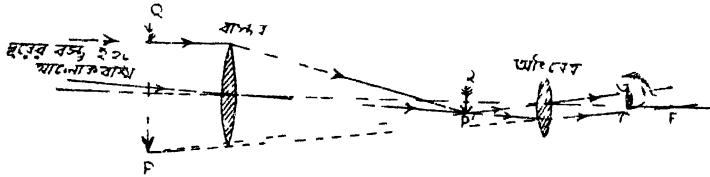
চিত্র নং ৭৭ ° দূরবীক্ষণে কেমন করিয়া দেখা যায় দূর বস্তুর বর্ধিত উলটা প্রতিবিম্ব $P''Q''$ চক্ষু দেখিতেছে

যাহাতে বস্তুটির একটি অসৎ, সোজা, বর্ধিত প্রতিবিম্ব $P''Q''$ গঠিত হয় তাহা লেন্সের অপর পার্শ্বে চোখ রাখিলে দেখা যাইবে। এইভাবে আমরা **দূর বস্তুর প্রতিবিম্ব নিকটে** দেখিতে পারি। ইহাই হইল দূরবীক্ষণ। লক্ষ্য করিবে—এই প্রকার দূরবীক্ষণ যন্ত্রে শেষে যে প্রতিবিম্বটি আমরা দেখিব তাহা আসল বস্তুর উলটা প্রতিবিম্ব।

অণুবীক্ষণ (microscope)

সরল অণুবীক্ষণ (simple microscope)—পূর্বে উত্তল লেন্সকে বিবর্ধক কাচ হিসাবে ব্যবহার করিয়া দেখা হইয়াছে। (৭৬ নং চিত্রে বস্তুর P_1Q_1 অবস্থান)। এখন লেন্স্‌টি হাতে না ধরিয়া যদি উহাকে একটি নলের মধ্যে আটকাইয়া নলটিকে অর্থাৎ লেন্স্‌টিকে ওঠা-নামা করাইবার (focussing) ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কিছুক্ষণ চেষ্টা করিলে একটি অবস্থানে বস্তুটির একটি সুস্পষ্ট, বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব পাওয়া যাইবে। এইরূপ ব্যবস্থাসহ লেন্স্‌টিকে **সরল অণুবীক্ষণ** বলে।

যৌগ অণুবীক্ষণ (compound microscope)—মনে কর এইভাবে একটি লেন্সের সাহায্যে যেটুকু বিবর্ধন হইল তাহা তোমার প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট নহে। তখন **দুইটি লেন্স্** ব্যবহার করিয়া এই বিবর্ধনের পরিমাণ আরও বাড়ানো যাইতে পারে কি না ভাবিয়া দেখা যাক। ৭৬নং চিত্রে

প্রতিবিম্ব গঠনের P_3Q_3 অবস্থার কথা বিবেচনা কর। বস্তুটিকে যদি **ঠিক ফোকসের বাহিরে** রাখা যায় তাহা হইলে যে বিবর্ধিত প্রতিবিম্ব
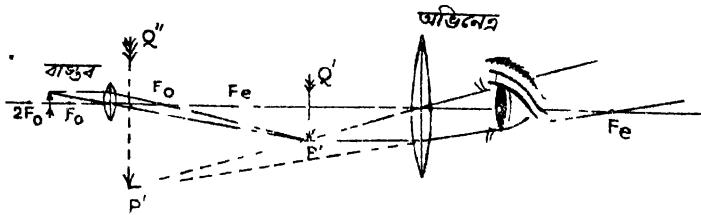
চিত্র নং ৭৮ : যৌগ অণুবীক্ষণে কেমন বর্ধিত দেখা যায় ; বস্তুর অবস্থান ১ম লেন্সের (বাস্তব) ফোকসের ঠিক বাহিরে, প্রতিবিম্বের ($P'_3Q'_3$) অবস্থান ২য় লেন্সের (অভিনেত্র) ফোকসের মধ্যে, প্রতিবিম্ব $P''Q''$ চক্ষু দেখিতেছে

$P'_3Q'_3$ প্রথমে পাওয়া যাইবে তাহাকে পুনরায় যদি ৭৮ নং চিত্রের P_1Q_1 অবস্থানে **বস্তু হিসাবে** ব্যবহার করিয়া দ্বিতীয় লেন্স্‌টি (অভিনেত্র) ব্যবহার করি তাহা হইলে উপর্যুপরি দুইবার বিবর্ধিত হইয়া বস্তুর প্রতিবিম্ব আসল বস্তুটির বহুগুণ বিবর্ধিত হইয়া দেখা যাইবে এবং ইহাই হইল **যৌগ অণুবীক্ষণের নীতি**।

মানুষের চোখের সহিত উত্তল লেন্সের প্রতিবিম্ব গঠনের তুলনা

এতক্ষণ আমরা আলোক ও উহার সাহায্যে কি করিয়া দেখা যায়—স্বাভাবিকভাবে এবং নানাপ্রকার বিশেষ অবস্থায়—যেমন জলের মধ্যে, নানাপ্রকার দর্পণের সাহায্যে, লেন্সের সাহায্যে ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করিয়াছি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমাদের নিজের **যে ইন্দ্রিয়টি আসলে দেখিতেছে**—তাহার কথা আমরা একেবারেই ভাবি নাই। বস্তুত চক্ষু না থাকিলে এত সব আলোচনা—প্রতিফলন, প্রতিসরণ ও উহাদের সূত্র—সব নিরর্থক হইয়া যাইত। চক্ষুর একটি নিজস্ব দেখার সরঞ্জাম ও ব্যবস্থাদি আছে। বাহিরের ব্যবস্থার সহিত ভিতরের (অর্থাৎ চোখের) এই ব্যবস্থার সামঞ্জস্য না হইলে দেখার কাজ সম্পূর্ণ হয় না। এইবার তাই চক্ষুর কথা বলা যাইতেছে।

চক্ষুর গঠন—বাহির হইতে কাহারও চক্ষুর সম্মুখভাগ মাত্র আমরা

দেখিয়া থাকি। সমগ্র চক্ষুটি একটি বর্তুলের (ball) আকৃতি। এজন্য চক্ষুকে অনেক সময় **অক্ষি-গোলক** (eye-ball) বলা হইয়া থাকে। AB লাইনটির পিছনের সমগ্র অংশ মস্তকের মধ্যে বসানো থাকে, উহা আমরা দেখিতে পাই না। **যে অংশ আমরা দেখি** তাহার মধ্যে আছে প্রধান এইগুলি—

(১) সম্মুখের স্বচ্ছ, অল্প ফোলানো অংশ—**অচ্ছোদ পটল** (cornea);

(২) উহার পিছনেই একটি গোল ছিদ্র—**তারারন্ধ্র** (pupil) ; (সুতরাং লক্ষ্য কর তারারন্ধ্র কোনও স্বতন্ত্র **বস্তু নহে**, উহা শূন্যস্থান মাত্র) ;

(৩) তারারন্ধ্রের চারিপার্শ্বে কাল বা সামান্য কটা বর্ণের একটি চক্রাকার মণ্ডল—**কনীনিকা** (iris)। চক্ষুর বর্ণ বলিতে এইটির বর্ণই বুঝাইয়া থাকে। বিড়ালের চোখে এই কনীনিকার বর্ণ খুব কটা হয় এবং কোনও কোনও মানুষের চোখেও, বিশেষ করিয়া ইয়োরোপের অধিবাসীদিগের চোখে, ইহার বর্ণ বেশ কটা হয়। কনীনিকা গোল এবং টানা—দুইপ্রকার মাংসপেশীর সমাবেশে গঠিত (অনেকটা মাকড়সার জালের ন্যায়)।

চিত্র নং ৭৯ : উপরে—চক্ষুর লম্বচ্ছেদ ; নীচে—চক্ষুর সম্মুখভাগ
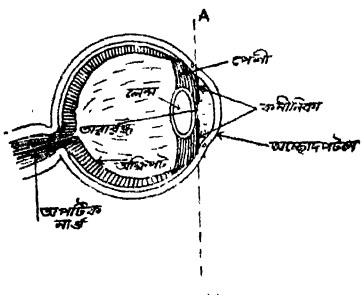
পিছনের **যে অংশ আমরা দেখি না** তাহার মধ্যে রহিয়াছে—

(১) একটি **উত্তল লেন্স** ;

(২) উহার পশ্চাতে অক্ষি-গোলকের ভিতরের স্তর—স্নায়ুময় পর্দা—**অক্ষিপট** (retina)।
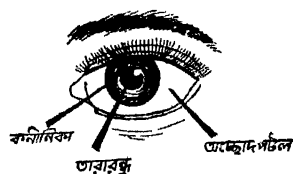
অক্ষি-গোলকের মধ্যের গহ্বর একপ্রকার তরল পদার্থে পূর্ণ থাকে।

চক্ষুর দেখিবার প্রক্রিয়া এইরূপ—

দৃষ্ট বস্তু হইতে আগত আলোক তারারন্ধ্রের মধ্য দিয়া লেন্সের উপর গিয়া

পড়ে এবং উহার ভিতর দিয়া প্রতিসরিত হইয়া পূর্বের নিয়মে বস্তুটির একটি প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের উপর গঠিত হয়। আমরা জানি যে লেন্সের সম্মুখে বস্তুর দূরত্ব অনুযায়ী লেন্সের পশ্চাতে বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিম্ব (সৎ) গঠিত হয়। চক্ষুর ক্ষেত্রে বিশেষ অসুবিধা এই যে উহার লেন্স্ হইতে পর্দার অর্থাৎ অক্ষিপটের দূরত্ব নির্দিষ্ট, অথচ যে বস্তুকে আমরা সম্মুখে দেখিতেছি তাহার অবস্থান কখনও কাছে, কখনও দূরে। আর এই **দেখার অর্থ—এই সকল বস্তুর সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের উপর গঠিত করা**। অক্ষিপট স্নায়ুময় পর্দা, তাই প্রতিবিম্বের অনুভূতি অক্ষিপটের সহিত যুক্ত **অক্ষি-স্নায়ু** (optic nerve) দিয়া সঙ্গে সঙ্গে মস্তিষ্কের **দর্শন কেন্দ্রে** (visual centre) উপনীত হয় এবং **তখনই আমরা বাহিরের বস্তুটিকে দেখি**। এই অর্থে আলোক, লেন্স্, চক্ষু প্রভৃতি দেখিবার যন্ত্র বা উপায় মাত্র, **প্রকৃত দ্রষ্টা হইল আমাদের মস্তিষ্ক**।

যাহা হউক এখন সমস্যা হইল—বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর একই স্থানে, অর্থাৎ অক্ষিপটের উপর, প্রতিবিম্ব গঠিত করিতে হইবে। কেমন করিয়া ইহা সম্ভব? চক্ষুর লেন্স্‌কে সরাইয়া আগে-পিছে করা (যেমন ক্যামেরায় করা হইয়া থাকে) সম্ভব নহে। তাই এখানে ব্যবস্থা হইল—লেন্সের পৃষ্ঠের বক্রতা (curvature) বাড়াইয়া-কমাইয়া বস্তুর অবস্থানের সহিত সামঞ্জস্য সাধন করা। এই কাজ লেন্সের কিনারার সহিত সংযুক্ত সিলিয়ারী পেশীগুলি (ciliary muscles) কখনও টান, কখনও আলগা হইয়া সাধিত হয়। এই প্রক্রিয়ার নাম **একোমোডেশন** (accommodation)। একটু চিন্তা করিলেই বুঝিতে পারিবে দৃষ্ট বস্তু যত নিকটে অবস্থিত হইবে লেন্সের পৃষ্ঠের বক্রতাও তত বাড়াইতে হইবে, বস্তু দূরে থাকিলে লেন্সের বক্রতাও কমাইতে হইবে। এইভাবে সকল সময়েই দৃষ্ট বস্তুর একটি সুস্পষ্ট প্রতিবিম্ব অক্ষিপটের উপর পড়িয়া আমরা বস্তুটিকে পরিষ্কারভাবে দেখিতে পাইব। সিলিয়ারী পেশীগুলির একোমোডেশন শক্তি কোনও কারণে দুর্বল হইয়া পড়িলে কৃত্রিম একটি লেন্স্ অর্থাৎ **চশমা** ব্যবহার করিয়া এই শক্তি পূরণ করা হয়।

একোমোডেশন
(accommodation)

তারারন্ধ্রের কাজ আর কিছুই নহে, যাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ আলোক চক্ষুর ভিতর পড়িতে পারে সেজন্য ইহার পরিসর প্রয়োজনমত ছোট বা বড় হয়—কর্নীনিকার দুইপ্রকার পেশী সংকুচিত বা প্রসারিত হইয়া এই কাজ করে।

প্রিজ্‌ম (Prism)—আলোকের বিচ্ছুরণ (Dispersion)

মানুষ দীর্ঘকাল হইতে লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে বাতিদানের ত্রিফলক কাচের মধ্য দিয়া রামধনুর বর্ণের আভাস পাওয়া যায়। এখানে প্রশ্ন উঠিতে পারে যে—হযতো ত্রিফলক কাচেরই নিজস্ব এইরূপ বর্ণ আছে। কিন্তু শুধু ত্রিফলক কাচ কেন, আরও নানা জিনিসে—যেমন সাবানের বুদবুদের গায়ে, রৌদ্রবৃষ্টির মিলনে আকাশে রামধনুর ভিতরে, জলের উপরে তেলের পাতলা আস্তরণের মধ্যে—আমরা এই বর্ণবিন্যাস দেখিয়া থাকি। ইহাকে **বর্ণালী** (spectrum) বলে। এ সব হইতে আমাদের ধারণা হওয়া স্বাভাবিক যে সূর্যের বা বাতির **সাদা আলোক ভাঙ্গিয়াই বর্ণালী সৃষ্টি হইয়াছে।** এই বর্ণালীতে মোটামুটি সাতটি বিভিন্ন বর্ণ দেখা যায় অর্থাৎ সাদা আলোক সাতটি বিভিন্ন বর্ণের মিলনে গঠিত। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক নিউটন (৯ পৃষ্ঠা দেখ) সাদা আলোকের এই **বিচ্ছুরণ** ঘটাইয়া উহা যে **মিশ্র** বর্ণ তাহা প্রথম প্রতিপন্ন করেন।

বর্ণালী—পরবর্তী চিত্রে নিউটনের বর্ণালী গঠনের পরীক্ষাটি দেখানো হইয়াছে—

এখানে দেখা যাইতেছে যে সাদা আলোকের সমান্তরাল গুচ্ছ প্রিজ্‌মের মধ্য দিয়া **সমগ্রভাবে প্রতিসরিত হয় নাই** অর্থাৎ প্রতিসরিত হইবার সময় উহা আর সমান্তরাল গুচ্ছ নাই—ক্রমবিস্তৃত (diverging) হইয়া বিভিন্ন বর্ণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। নিউটন এই বর্ণসমাবেশের ক্রম নির্দেশ করিয়াছিলেন, উপর হইতে নীচের দিকে, এইরূপ—লাল, কমলা, হলদে, সবুজ, আসমানী (অর্থাৎ আকাশের বর্ণ), নীল (গাঢ়), বেগনী। এই ক্রমটি আমরা ছেলেবেলায় মনে রাখিবার জন্য উলটা দিক হইতে বাংলায় বর্ণগুলির নামের প্রথম অক্ষর কয়টি সাজাইয়া

"**বেনী আসহ কলা**" এই শব্দটি মুখস্থ করিতাম। ইংরাজীতে অনুরূপ
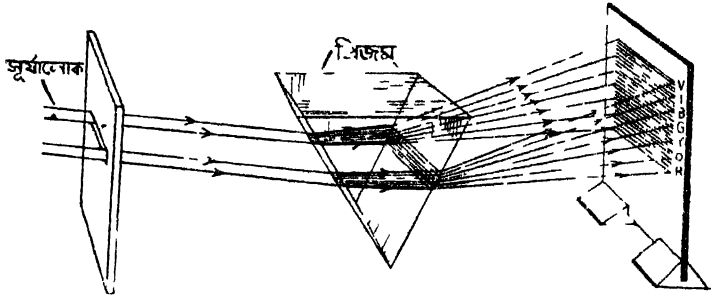
চিত্র নং ৮০ : বর্ণালী গঠনের পরীক্ষা—সূর্যালোক প্রিজমের ভিতর দিয়া সাতটি বর্ণে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে

শব্দটি হইল—**"vibgyor"**, (কেমন করিয়া বল) উহাও মনে রাখা সহজ হইত।
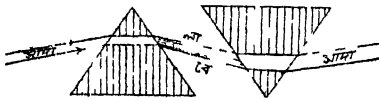
চিত্র নং ৮১ : দুইটি প্রিজমের সাহায্যে সাদা আলোক বিশ্লেষিত হইয়া পুনরুৎপাদিত হইতেছে

বর্ণালীর আলোক রশ্মিগুলির পথে যদি **উলটা করিয়া** অর্থাৎ ভূমিটি উপরের দিকে করিয়া আর একটি প্রিজ্‌ম রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে পুনরায় বর্ণগুলি একত্র হইয়া সাদা আলোক পুনরুৎপাদিত হইয়াছে। ইহা হইতে নিশ্চিতভাবে ইহাই প্রমাণিত হইল যে সাদা আলোক ভাঙ্গিয়াই বর্ণালী সৃষ্টি হইয়াছিল, প্রিজমের কোনও নিজস্ব বর্ণ দিয়া এই বর্ণালী গঠিত হয় নাই।

কিন্তু কেমন করিয়া সাদা আলোক উহার বিভিন্ন উপাদানে বিশ্লেষিত হইয়া পড়িল?

বর্ণালী সৃষ্টির অর্থ হইল এই যে সাদা আলোকের **বিভিন্ন বর্ণ প্রিজ্‌মের ভিতর দিয়া বিভিন্ন পরিমাণে,** অর্থাৎ কমবেশী কোণ উৎপাদন করিয়া, **প্রতিসরিত হইয়াছে** এবং বর্ণগুলির পর পর অবস্থান হইতে বুঝা যায় যে লাল আলোক প্রতিসরিত হইয়াছে সর্বাপেক্ষা কম

এবং পর পর কমলা, হলদে প্রভৃতি আলোকগুলি ক্রমান্বয়ে অধিক হইতে অধিকতর পরিমাণে প্রতিসরিত হইয়া শেষ প্রান্তে বেগনী আলোক প্রতিসরিত হইয়াছে সর্বাপেক্ষা বেশী। এইভাবে তাহারা আলাদা হইয়া পর্দার বিভিন্ন স্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে—একই স্থানে একটির উপরে আর একটি পড়িয়া মিশিয়া যায় নাই। তাহাই যদি হয় তবে সাধারণ একটি কাচের ব্লকের মধ্য দিয়া সাদা আলোকের প্রতিসরণে এইরূপ ঘটে না কেন? পাশের চিত্রটি দেখ—
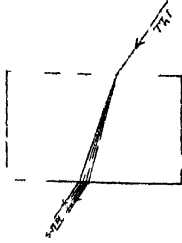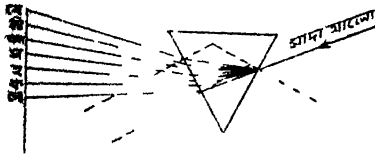
চিত্র নং ৮২ঃ উপরে— কাচের ব্লকের ভিতর দিয়া সাদা আলোকের প্রতিসরণে কেন বিচ্ছুরণ ঘটে না; নীচে—প্রিজমের ভিতর দিয়া প্রতিসরণে কেন বিচ্ছুরণ ঘটে

প্রিজ্‌ম ও কাচের ব্লকে প্রতিসরণ—ব্লকটির বিপরীত তল দুইটি পরস্পর সমান্তরাল বলিয়া কাচের মধ্যে সাদা আলোকের প্রতিসরণের ফলে সামান্য বর্ণালী সৃষ্টি হইলেও কাচ হইতে পুনরায় বায়ুস্তরে প্রতিসরিত হইবার সময় **ঠিক একই পরিমাণে বিপরীত দিকে** বিভিন্ন রশ্মিগুলি আবার বাঁকিয়া, **বর্ণালী** এক জোট হইয়া সাদা আলোক পুনরুৎপাদিত হইয়াছে। অর্থাৎ **উপরে দুইটি** প্রিজ্‌ম ব্যবহার করিয়া যাহা ঘটিয়াছিল এক্ষেত্রেও তাহাই **ঘটিয়াছে**। কিন্তু **একটি** প্রিজ্‌মের ক্ষেত্রে কি ঘটে লক্ষ্য কর—

এখানে প্রতিসারক তল দুইটি একত্র (ত্রিভুজের শীর্ষকোণে) মিলিত হইয়াছে বলিয়া বায়ুস্তর হইতে কাচের মধ্যে প্রবেশ করিবার সময় এবং পুনরায় কাচ হইতে বায়ুস্তরে বাহির হইবার সময় **যে দুইবার আলোক-রশ্মির প্রতিসরণ ঘটে তাহা একই দিকে**। সুতরাং প্রতিসরণ এবং তজ্জনিত বিচ্ছুরণ দুইবারে **কাটাকুটি** অর্থাৎ বিয়োগ না হইয়া **যোগ** হইয়া গিয়াছে এবং এই কারণে বিচ্ছুরণের পরিমাণ বাড়িয়া

গিয়া সাতটি বর্ণ পাশাপাশি পর্দার উপর সুস্পষ্টভাবে পড়িয়াছে। এই জন্যই বর্ণালী সৃষ্টি করিতে প্রিজ্‌মের ব্যবহার হয়।

যদি বর্ণালী সৃষ্টির পরীক্ষায় (চিত্র নং ৮০, ৮১ দেখ) শুধু **একবর্ণের আলোককে** (যেমন হলদে) একটি পর্দার ফাঁকের মধ্য দিয়া আর একটি
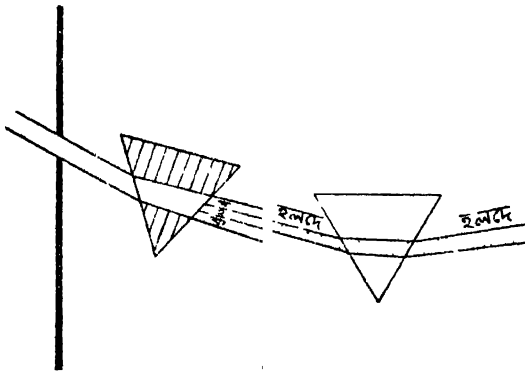
চিত্র নং ৮৩ : নিউটনের বিখ্যাত পরীক্ষা—প্রথম প্রিজমের মধ্য দিয়া সাদা আলোক বিচ্ছুরিত হয়, কিন্তু উহার মধ্যস্থ হলদে আলোককে আর বিচ্ছুরিত করা যায় না

প্রিজ্‌মের উপর ফেলা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে যে উহা মাত্র প্রতিসরিত হইয়াছে, কিন্তু আর **বিচ্ছুরিত হয় নাই**। ইহা হইতেও পুনরায় প্রমাণ হয় যে সাদা আলোক ভাঙ্গিয়াই বর্ণালী সৃষ্টি হইয়াছিল, ইহা প্রিজ্‌মের নিজস্ব কোনও গুণের জন্য হয় নাই।

বর্ণালী সৃষ্টি দ্বারা সাদা আলোক যে মৌলিক আলোক নহে আমরা জানিতে পারিলাম। কিন্তু ইহাই বর্ণালী সৃষ্টির একমাত্র প্রয়োজনীয়তা নহে। জানিয়া রাখ যে কোটি কোটি মাইল দূরে অবস্থিত সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষ্কের উপাদান, উষ্ণতা ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা অজানা তথ্য আমরা উহাদের আলোকের **বর্ণালী বিশ্লেষণ** (spectrum analysis) করিয়া জানিতে পারি, কারণ কোনও দুইটি বস্তুকে উত্তপ্ত করিয়া উহাদের বর্ণালী সৃষ্টি করিলে উহারা একপ্রকার দেখাইবে না—কোনও ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বর্ণ হয়ত বেশী গাঢ় হইবে বা একটি

বর্ণ থাকিবেই না বা বর্ণালীর মধ্যে বিভিন্ন স্থানে কাল কাল দাগ পড়িবে ইত্যাদি। ধর পিতলের কোন বস্তু আগুনে উত্তপ্ত করিয়া উহার বর্ণালী সৃষ্টি করা হইল। এখন বস্তুটির দিকে না তাকাইয়া আমি শুধু উহাব বর্ণালী দেখিয়া বলিতে পারি যে বস্তুটির মধ্যে তামা ও দস্তা আছে। বৈজ্ঞানিকভাবে বর্ণালী বিশ্লেষণ অবশ্য বিশেষ জ্ঞানের ব্যাপার এবং ইহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নহে।

যদি কেহ বলে মাধ্যম পরিবর্তিত করিলে আলোক প্রতিসরিত হয় কেন—ইহাব উত্তর কি? প্রতিসরণের মূল কারণ হইল—**মাধ্যমের ঘনত্বের তারতম্য অনুযায়ী আলোকের গতি বিভিন্ন হয়**—ঘন মাধ্যমে গতি কম ও লঘু মাধ্যমে গতি বেশী হয়। কাচ ও জল বাতাস হইতে ঘন, সেইজন্য আলোক বাতাস হইতে জল বা কাচে প্রবেশ করিলে আলোকেব গতি কমিয়া উহা আপতন বিন্দুতে লম্বের দিকে বাঁকে এবং বিপরীত অবস্থা হইলে গতি বাড়িয়া লম্ব হইতে দূরের দিকে বাঁকে।

প্রতিসরণের মূল কারণ

ইহার পরেও যদি প্রশ্ন উঠে—গতির বিভিন্নতার জন্য বাঁকিবারই বা কারণ কি, তাহা হইলে জল বা কাদার উপর ভাসা-ভাসা ভাবে একটি ঢিল বা খোলামকুচি ছুড়িয়া দেখ (এক্ষেত্রে ঢিলটি যেন আলোক-রশ্মি এবং উহা ছুটিয়া বাতাস হইতে ঘনতর মাধ্যম—জল বা কাদায় প্রবেশ করিতেছে), ঢিলটির গতি কমিয়া গিয়া উহা ঠিক আলোকের প্রতিসরণের নিয়মে বাঁকিয়া গিয়াছে।

অনুশীলনী (I)

১। আলোক যে সরল রেখায় চলে তাহার যতগুলি প্রমাণ দিতে পার বল। আলোক শব্দের মত বাঁকা পথে গমন করিলে আমাদের কি কি নূতন অভিজ্ঞতা হইত বুঝাইয়া বল।

২। সূর্য উঠিবার সঙ্গে সঙ্গে আমরা উহাকে দেখিব কি না যুক্তিসহ বল। ধ্রুবতারা আজ যদি নিভিয়া যায় তাহা হইলে ৫০০ বৎসর পরে আমরা উহা জানিতে পারিব—এই উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

৩। একটি অণুবীক্ষণে ও একটি দূরবীক্ষণে কি করিয়া প্রতিবিম্ব গঠিত হয়—আলোকরশ্মির রেখা আঁকিয়া বুঝাইয়া দাও।

৪। মানুষের চক্ষুর সহিত কি কি বিষয়ে ক্যামেরার মিল ও প্রভেদ আছে?

৫। একটি সাধারণ পুরু কাচের মধ্য দিয়া আলোকের বিচ্ছুরণ হয় না অথচ প্রিজমের মধ্য দিয়া হয় কেন চিত্রসহ বুঝাইয়া দাও।

৬। পিনহোল ক্যামেরার কার্যপ্রণালী বুঝাইয়া দাও। উহার ছিদ্রটি বড় হইলে কি হইবে চিত্র সহ ব্যাখ্যা কর। এই ক্যামেরার সহিত সাধারণ ক্যামেরার মূল প্রভেদ কি?

৭। একটি উত্তল লেন্স্‌কে কত প্রকার বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়—চিত্রসহ বর্ণনা কর। সরল অণুবীক্ষণ কাহাকে বলে?

৮। মোটর গাড়ীর আলোতে অবতল আরশি ও ড্রাইভারের দেখিবার জন্য উত্তল আরশি ব্যবহার করা হয় কেন?

৯। প্রতি পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণ ও প্রতি অমাবস্যায় সূর্যগ্রহণ হয় না কেন বুঝাইয়া বল।

১০। সাদা আলোক যে সাতটি বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশে গঠিত ইহা কিরূপে নির্ভুলভাবে প্রমাণ করা যায়? বর্ণালী বিশ্লেষণ কাহাকে বলে?

অনুশীলনী (II)

১। নীচের চিত্রে () একটি বিন্দু আকৃতির আলোকিত বস্তু। চারিটি ছাত্র (A,B,C,D) চারি প্রকারে ঐ বিন্দু হইতে দুইটি আলোক রশ্মির রেখা টানিয়া একটি সমতল দর্পণে উহার প্রতিবিম্বের অবস্থান (I) নির্দেশ করিয়াছে। উহাদের একটি মাত্র শুদ্ধ; কোনটি বল।
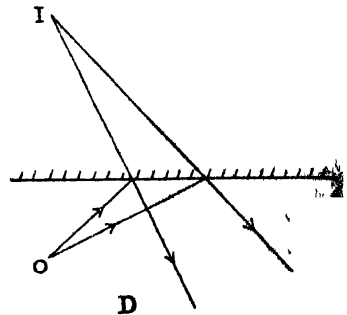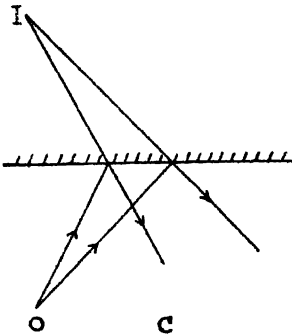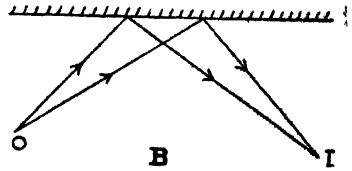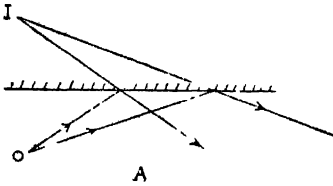
২। একটী সমতল আরশির সম্মুখে একটি আলোকিত বস্তু হইতে একটি আলোক রশ্মি আপতন বিন্দুতে লম্বের সহিত ৩০° কোণ উৎপন্ন করিয়াছে। আপতন বিন্দুটি ঠিক রাখিয়া আরশিটিকে ২০° ঘুরাইয়া দিলে প্রতিফলিত রশ্মি কত ডিগ্রী ঘুরিয়া যাইবে—

ক। ২০°? খ। ৩০°? গ। ৪০°? ঘ। ৬০°?

৩। একটী আলোকিত বস্তুকে একটি অবতল আরশির সম্মুখে ৪" দূরে রাখা হইয়াছে। আরশির ফোকস দূরত্ব ৩" হইলে প্রতিবিম্ব (কোনটি শুদ্ধ বল)—

ক। ছোট, অসৎ, উলটা হইবে। খ। বড়, সৎ, উলটা হইবে।
গ। বড়, সৎ, সোজা হইবে। ঘ। ছোট, অসৎ, সোজা হইবে।

৪। নিম্নে বাম দিকের সারিতে কয়েকটি আলোক-সম্পর্কিত যন্ত্র ও ডান দিকের সারিতে উহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ঘটনাগুলি (অতিরিক্ত একটি সমেত) এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। যন্ত্র ও ঘটনাগুলি নম্বর অনুযায়ী শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

১। পোর্ট্রাপ ১। দহন
২। উত্তল লেন্স্ ২। সোজা, সৎ প্রতিবিম্ব
৩। প্রিজ্ম্ ৩। বিচ্ছুরণ
৪। উত্তল আরশি ৪। প্রতিফলন
৫। চক্ষু ৫। উলটা, সৎ প্রতিবিম্ব
৬। সোজা, অসৎ প্রতিবিম্ব

৫। রবার ষ্ট্যাম্পের উপর ছোট লেখাগুলি পড়িতে নিম্নলিখিত যন্ত্রগুলির কোনটি সাহায্য করিবে—

ক। উত্তল লেন্স ? খ। সমতল দর্পণ ?
গ। অবতল দর্পণ ? ঘ। প্রিজম ?

৬। নিম্নলিখিত বিবৃতগুলির কতকগুলি সত্য কতকগুলি সত্য নহে, কোনগুলি সত্য বল—

(১) প্রিজমের মধ্য দিয়া বর্ণালী দেখা যায়।
(২) জলের উপর হইতে বর্শা দিয়া মাছকে গাঁথিতে হইলে কিছু দূরের দিকে লক্ষ্য করিতে হইবে।
(৩) বেগনী আলোকের প্রতিসরণ লাল আলোকের অপেক্ষা বেশী।
(৪) চক্ষুর মধ্যে একটি উত্তল লেন্স্ আছে।
(৫) কাছের বস্তু দেখিতে হইলে চক্ষুর লেন্স্টি অক্ষিপটের দিকে সরিয়া যায়।
(৬) চক্ষুর তারারন্ধ্র একটি স্বচ্ছ, নীলাভ পদার্থ।
(৭) বলয়গ্রাস কেবলমাত্র চন্দ্রের হয়।
(৮) সূর্যগ্রহণ চন্দ্রের ছায়া পড়িয়া ঘটে।
(৯) চন্দ্রের পূর্ণগ্রাস একসঙ্গে পৃথিবীর সকল স্থান (যেখানে রাত্রি) হইতে দেখা যায়।
(১০) চন্দ্রে পৃথিবীর উপচ্ছায়া পড়িয়া চন্দ্রের খণ্ডগ্রাস ঘটে।

তৃতীয় অধ্যায়

তাপ

তাপের উৎস

তাপ কি—রৌদ্রের ভিতর একটি শিশি রাখিয়া দিলে গরম হইয়া উঠে। আগুনের উপর হাঁড়ি বসাইলে উত্তপ্ত হয়। শীতের দিনে দুই হাত ঘষিলে উত্তাপ অনুভব করি। তাপও আলোকের ন্যায় ঈথরে এক প্রকার তরঙ্গ। উত্তপ্ত হইলে বস্তুর অণুগুলি অধিকতর চঞ্চল হইয়া ছোটাছুটি ও পরস্পর ঠোকাঠুকি করে। তাহাদের এই গতির স্পন্দন পার্শ্ববর্তী ঈথরে তরঙ্গ সৃষ্টি করে। ঐ তরঙ্গ আমাদের ত্বকে আসিয়া লাগিলে আমরা উত্তাপ অনুভব করি।

তাপের উৎস

ক। **সূর্য**—পৃথিবীর বিভিন্ন প্রকার তাপের আদি উৎস হইল সূর্য। তোমরা হাইড্রোজেন বোমার কথা শুনিয়াছ। শুধু এইটুকু জানিয়া রাখ যে সূর্যের মধ্যে যে প্রচণ্ড উত্তাপের অনন্ত ভাণ্ডার সঞ্চিত রহিয়াছে উহার উৎপত্তি হইল হাইড্রোজেন বোমার কৌশলে অর্থাৎ সূর্যকে একটি **বিরাট হাইড্রোজেন বোমার চুল্লী** বলিয়া কল্পনা করা যাইতে পারে। প্রায় সাড়ে নয় কোটি মাইল দূর হইতে এই অপূর্ব চুল্লী সৃষ্টির আদি হইতে পৃথিবীর যাবতীয় জীবের জীবন ও কার্যে উত্তাপ (ও আলোক) দিয়া শক্তি যোগাইয়াছে।

সূর্যের উত্তাপ না থাকিলে আমরা বাঁচিতে পারিতাম না। সাক্ষাৎভাবে এই উত্তাপ আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছে—ইহা স্বাস্থ্যনীতির কথা। কিন্তু সূর্য অনন্ত তাপ-শক্তির আকর হইলেও এই তাপ আমরা আমাদের নিত্য-দিনের প্রয়োজনে কাজে লাগাইবার সহজ কৌশল এখনও আয়ত্ত করিতে পারি নাই। আপাতত আমাদের ব্যবহারের উত্তাপ আসিতেছে **যান্ত্রিক প্রক্রিয়া** (যেমন ঘর্ষণ), **রাসায়নিক প্রক্রিয়া** (দহন ও অন্যান্য রাসায়নিক

ক্রিয়া) এবং **বিদ্যুৎ** হইতে। একটু ভাবিলেই অবশ্য বুঝা যাইবে **এ সকল প্রকার শক্তিই আসলে সূর্য হইতে আসিতেছে** অর্থাৎ সূর্যের উত্তাপ আমরা প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কাজে লাগাইতে না পারিলেও ঐ শক্তির কিছু অংশ পরোক্ষভাবে উপরোক্ত উৎসগুলির মাধ্যমে আমাদের কাজে লাগিতেছে।

সূর্যের উত্তাপ বড জোর আমরা শীতের দিনে জমা নারিকেল তৈল গলাইতে, ভিজা কাপড বা অন্যান্য বস্তু শুখাইতে ব্যবহার করি; কিন্তু ইহাতে রান্না করিতে পারি না। (আমেরিকায় এক প্রকার সূর্য-চুল্লী সম্প্রতি আবিষ্কৃত হইয়াছে শোনা যাইতেছে যাহার সাহায্যে রান্না করা চলিবে)।

খ। **দহন**—রান্নার জন্য আমরা ব্যবহার করি কয়লা, কাঠ, কেরোসিন ইত্যাদি। সূর্যের উত্তাপ (ও আলোকের) সাহায্যে উদ্ভিদ তাহার দেহে যে খাদ্য প্রস্তুত করিতেছে তাহাই দীর্ঘকাল মাটির তলায় থাকিয়া পরিবর্তিত হইয়া কয়লা ও জ্বালানী তেলে পরিণত হয়। পৃথিবীর সমস্ত উদ্ভিদরাজি এইভাবে যে শক্তি সঞ্চয় করিতেছে তাহা পৃথিবীর বৃহত্তম শক্তি-উৎপাদক কারখানায় উৎপন্ন শক্তির লক্ষ লক্ষ গুণ বেশী। সূর্যের এই শক্তিই দহনের মধ্য দিয়া মুক্তিলাভ করিয়া আমাদের ব্যবহারে লাগিতেছে। দহন এক প্রকার রাসায়নিক প্রক্রিয়া। দহন ব্যতীত অন্যান্য অনেক রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফলেও তাপ নির্গত হয় (কি বল)।

যান্ত্রিক প্রক্রিয়া—ঘর্ষণজাত তাপ আজকাল বিশেষ কাজে না লাগিলেও ঘর্ষণের ফলে যে তাপ নির্গত হয় তাহার নানা উদাহরণ আমাদের জানা আছে। যেমন **শান-দেওয়া পাথরে** ছুরি-কাঁচি শান দিলে উহারা গরম হইয়া উঠে, এমন কি তাপে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়। আমাদের বাল্যকালে গ্রামে কৃষাণ-মজুরদের **চকমকি পাথর** ঠুকিয়া তামাক ধরাইতে দেখিয়াছি। আধুনিক যুগে চকমকির ব্যবহার না থাকিলেও
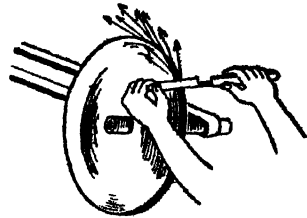
চিত্র নং ৮৪ : শান-দেওয়া পাথরে ঘর্ষণ-জাত তাপ—অগ্নিস্ফুলিঙ্গ লক্ষ্য কর

আমরা যে দিয়াশলাই জ্বালাই তাহা ঘর্ষণজনিত উত্তাপের জন্যই সম্ভব হয়। কারণ এই সামান্য উত্তাপই দিয়াশলাইএর কাঠির বারুদ জ্বালাইতে সাহায্য করে। যাঁহারা সিগারেট খান তাঁহারা অনেকেই আজকাল দিয়াশলাই-এর বদলে **সিগারেট প্রজ্বালক** (cigarette lighter) ব্যবহার করেন। ইহা একটি পেট্রল ল্যাম্প বিশেষ। এখানে একটি ছোট পাথরের চাকা ও ইস্পাতে ঘষিয়া স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি হয় এবং ঐ আগুনে একটি পেট্রলে-ভিজা সল্‌তে জ্বলিয়া উঠে।

গ। **বিদ্যুৎ-শক্তি**—আকাশের বিদ্যুৎ হইল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সুতরাং উত্তাপের উৎস। এই উত্তাপ আমাদের কোনও উপকারে না লাগিয়া অনর্থের কারণ হয় যখন বিদ্যুৎ গাছ, চালাঘর ইত্যাদিতে আঘাত করিয়া অগ্নিকাণ্ড সৃষ্টি করে। বিদ্যুতের শকেও (shock) অনেক সময় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে, কিন্তু তাহা অন্য ব্যাপার। আর বাড়ীর দেওয়ালের তারে আবদ্ধ বিদ্যুৎ বৈদ্যুতিক ষ্টোভ, ইস্ত্রি প্রভৃতির মধ্যে তাপে পরিবর্তিত হইয়া আমাদের নানা প্রয়োজন সিদ্ধ করে। ইহাদের কথা পরে আবার বলা হইবে। পূর্বেই বলা হইয়াছে বিদ্যুৎ-জনিত তাপ আসলে সূর্য হইতে আসিতেছে কারণ যে ডায়নামোর সাহায্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি হয় তাহা কয়লার সাহায্যে চালাইতে হয়। আর যখন জলের নিম্ন প্রবাহে চাকা ঘুরাইয়া বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয় (hydro-electricity) তখনও মনে রাখিতে হইবে সূর্যের শক্তিই এই জলকে সমুদ্র হইতে টানিয়া আকাশে তুলিয়াছিল।

তাপের প্রভাব—প্রসারণ
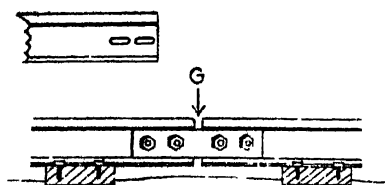
চিত্র নং ৮৫ : নীচে—রেলের লাইনে ফাঁক (G) না থাকিলে প্রসারণে বাঁকিয়া যাইত ; উপরে—নাট (nut)এর গর্ত দুইটি গোল না হইয়া কিছু লম্বা হয়—কেন বল দেখি ?

কোনও কারণে বস্তুর মধ্যস্থ অণুগুলি চঞ্চল হইয়া উঠিলে তাপ সৃষ্টি হয় তাহা বলা হইয়াছে। উহার ফলে অণুগুলির পরস্পরের দূরত্ব বাড়িয়া যায় এবং সমগ্র বস্তুটি আয়তনে বড় হইয়া উঠে ; ঠাণ্ডা হইলে আবার আয়তনে

কমিয়া যায়। পৃথিবীর প্রায় যাবতীয় বস্তু এইভাবে উত্তাপে প্রসারিত ও ঠাণ্ডায় সংকুচিত হয়। তাই যেখানেই যন্ত্রপাতি প্রভৃতি ব্যবহারকালে উত্তপ্ত হইবার সম্ভাবনা আছে সেখানেই এই সংকোচন-প্রসারণের হিসাব রাখিয়া ব্যবস্থা করিতে হয়, নচেৎ নানাপ্রকার গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা। এখন তাপের ফলে বিভিন্ন বস্তুর প্রসারণের কয়েকটি দৃষ্টান্ত ও পরীক্ষার উল্লেখ করা হইতেছে :—

কঠিন পদার্থের প্রসারণ—পরীক্ষা : এই পরীক্ষায় একটি লোহার বল ও আংটাকে এমন মাপে মাপে প্রস্তুত করা হইয়াছে যে স্বাভাবিক অবস্থায় বলটি ঠিক আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া যায়। এখন বলটিকে (বল ও আংটার পরীক্ষা (ball and ring experiment). বাহাতে পড়িয়া না যায় এজন্য উহা একটি চেন দিয়া আংটার সহিত আঁটা থাকে) একটি স্পিরিট ল্যাম্পে বেশ কিছুক্ষণ উত্তপ্ত করিয়া আংটার উপর স্থাপন করিয়া দেখ—উহা আর আংটার ভিতর দিয়া গলিতেছে না। ঐ অবস্থায় রাখিয়া দিলে কিছুক্ষণ পরে বলটি আবার হঠাৎ আংটার মধ্য দিয়া গলিয়া নীচে ঝুলিয়া পড়িবে। ইহা হইতে বুঝা যায় যে উত্তাপের ফলে বলটি আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং ঠাণ্ডা হইলে সংকুচিত হইয়া পুনরায় পূর্ব আয়তন ফিরিয়া পাইয়াছে।
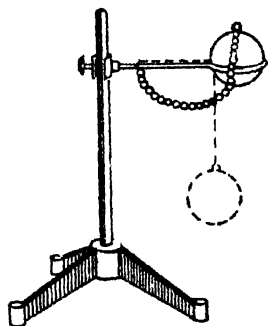
চিত্র নং ৮৬ : বল ও আংটার পরীক্ষা—তাপে বড় হইয়া বলটি আংটার ভিতর দিয়া আর গলিতেছে না

তাপের ফলে বস্তুর এই প্রসারণশীলতার নানা ঘরোয়া দৃষ্টান্ত আমাদের অভিজ্ঞতায় রহিয়াছে। শিশির মুখে কাচের ছিপি বা ধাতুর ক্যাপ (cap) শক্ত হইয়া বসিয়া গেলে অনেক সময় শিশির গলাটিকে বা ধাতুর ক্যাপটিকে সাবধানে গরম করিলে শিশির মুখ খুলিতে পারা যায়। কাচের গেলাসে হঠাৎ গরম জল ঢালিলে বা গরম চিমনীতে হঠাৎ ঠাণ্ডা জলের ছিটা লাগিলে অনেক সময় ফাটিয়া যায়। এ সবই তাপের প্রভাবে প্রসারণ ও

ঠাণ্ডায় সংকোচনের ব্যাপার।

প্রায় সব জিনিসের উপরই তাপের এই প্রভাব লক্ষিত হইলেও কয়েক-প্রকার **সংকর** (মিশ্র) **ধাতু** (alloy) প্রস্তুত হইয়াছে যাহারা প্রবল তাপেও প্রসারিত হয় না। **রবার** আবার **তাপে সংকুচিত হয়।** এইগুলি অবশ্য-ব্যতিক্রমের পর্যায়ে পড়ে।

পরীক্ষা ঃ প্রায় ২ ফুট লম্বা একটি লোহার সরু দণ্ড লইয়া উহার এক প্রান্ত ভাল করিয়া আঁটিয়া দাও অর্থাৎ যেন ঐ দিকে দণ্ডটি নড়িতে না পারে এবং অপর প্রান্তটি একটি সূচক কাঁটার গোড়ায় ঠিক স্পর্শ করিয়া
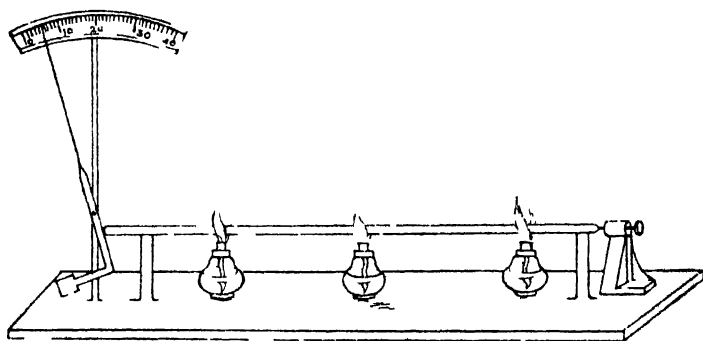
চিত্র নং ৮৭ : লৌহদণ্ডের তাপে প্রসারণ—প্রসারণের পরিমাণ বৃত্তাকার স্কেলে সূচক কাঁটাটির সাহায্যে মাপা যায়

থাকে। সূচক কাঁটাটি একটি **প্রথম শ্রেণীর লিভারের** কৌশলে গঠিত। ইহার গোড়ার দিকটি ক্ষুদ্র বাহুর প্রান্ত সুতরাং এই প্রান্ত এক পার্শ্বে সামান্য একটু সরিলে অপর প্রান্তে উহা বহুগুণে বর্ধিত হইয়া দেখাইবে এবং ইহার পরিমাণও সংশ্লিষ্ট বৃত্তাকার স্কেলে মাপা যাইবে। এইবার দণ্ডটির নীচে কয়েকটি স্পিরিট ল্যাম্প বসাইয়া উহাকে ভাল করিয়া উত্তপ্ত কর। দেখিবে সূচকের উপরের প্রান্তটি স্কেলের গায়ে নড়িতে আরম্ভ করিয়াছে এবং পরিশেষে একস্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়াছে। সূচকটির নিম্ন প্রান্ত ভারী বলিয়া দণ্ডটি ঠাণ্ডা হইয়া সংকুচিত হইবার সঙ্গে সঙ্গে সূচকটিও স্কেলের উপর পূর্ব অবস্থানে ফিরিয়া আসিবে।

ইহা হইতে কঠিন পদার্থ যে তাপে প্রসারিত হয় বোঝা গেল। লোহার দণ্ডটির স্থলে সমান মাপের অন্যান্য ধাতুর দণ্ড লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে মোটামুটিভাবে বোঝা যাইবে সকল ধাতুর প্রসারণ ক্ষমতা এক নহে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, **পিতলের প্রসারণশীলতা লোহার অপেক্ষা বেশী।**

সেইরূপ, **তাপের প্রভাবে সকল কঠিন পদার্থও সমানভাবে প্রসারিত হয় না**; ধাতুর প্রসারণশীলতা সাধারণত অধাতু অপেক্ষা বেশী। নিম্নের পরীক্ষাটি বেশ শিক্ষাপ্রদ—

পরীক্ষাঃ চিত্রের ন্যায সমান মাপের একটি লোহা ও একটি পিতলের পাতলা পাত এক সঙ্গে ভাল করিয়া জুড়িয়া দাও। জুড়িবার জন্য পাত দুইটিকে একত্র করিয়া পেরেক দিয়া কয়েকটি গর্ত কর এবং উহাদের মধ্য দিয়া ছোট স্ক্রু ও নাট (nut) পরাইয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া দাও। এইবার স্পিরিট ল্যাম্পের উপর জোড়া পাতটি উত্তপ্ত করিয়া দেখ— উহা **একদিকে বাঁকিয়া যাইবে**। কোন্‌দিকে বাঁকিয়া যাইবে একটু ভাবিয়া বল দেখি?
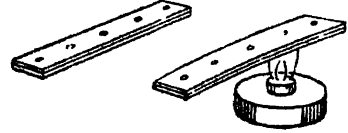
চিত্র নং ৮৮ঃ লোহা ও পিতলের জোড়া পাত উত্তপ্ত করিলে বাঁকিয়া যায়

অটোম্যাটিক ফায়ার এলার্ম-এ (fire alarm) কৌশলে এই ব্যবস্থাটির প্রয়োগ করা হইয়া থাকে।

নিম্নে ব্যবহারিক জীবনে তাপের ফলে বস্তুর প্রসারণশীলতার প্রভাবের দুইটি চিত্র দেওয়া হইল—
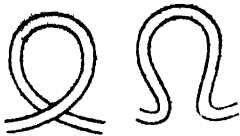
চিত্র নং ৮৯ঃ বাষ্পবহনের পাইপে (pipe) মধ্যে মধ্যে এইরূপ বাঁক থাকে বলিয়া প্রসারণে ফাটিতে পারে না
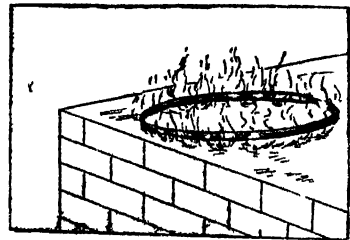
চিত্র নং ৯০ঃ গোরুর গাড়ীর চাকার লোহার বেড় আগুনে উত্তপ্ত করিয়া পরাইলে আঁটিয়া যায়

তরল পদার্থের প্রসারণ—তরল পদার্থও কঠিন পদার্থের ন্যায় তাপে প্রসারিত হয় এবং সাধারণত ইহাদের প্রসারণশীলতা কঠিন পদার্থের অপেক্ষা অধিক।
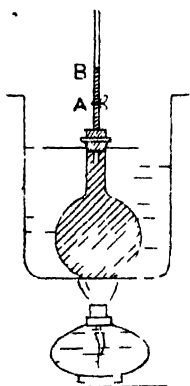
চিত্র নং ৯১ : তাপে তরল পদার্থের প্রসারণ —নলে জল A হইতে B পর্যন্ত উঠিয়াছে

পরীক্ষা : একটি কাচের ফ্লাস্ক রঙীন জল দ্বারা মুখ পর্যন্ত পূর্ণ কর। একটি কর্ক লইয়া ছিদ্র করিয়া একটি কাচের সরু নল উহার মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও এবং নল-আঁটা কর্কটি ফ্লাস্কের মুখে ভাল করিয়া চাপিয়া আঁটিয়া দাও। দেখিবে জলের উপর ছিপির চাপে নলের মধ্যে রঙীন জল কিছুদূর পর্যন্ত উঠিয়াছে। ঐ স্থানটিতে একটি রঙীন সুতা বাঁধিয়া চিহ্ন দিয়া রাখ (A)। এইবার একটি পাত্রে গরম জল রাখিয়া ফ্লাস্কটি উহাতে বসাইয়া দাও। দেখিবে—সরু নলে জল **চিহ্নিত স্থান হইতে প্রথমে সামান্য কিছু নীচে নামিয়া** পরে দ্রুতগতিতে উপরে উঠিতেছে। ইহা হইতে উত্তাপের ফলে জলের আয়তন বৃদ্ধির প্রমাণ পাওয়া গেল। শুধু তাহাই নহে—কাচ ও জলের মধ্যে কোনটির প্রসারণশীলতা বেশী তাহাও একই সঙ্গে এই পরীক্ষার মধ্য দিয়া প্রমাণিত হইল। কেমন করিয়া বল দেখি ?
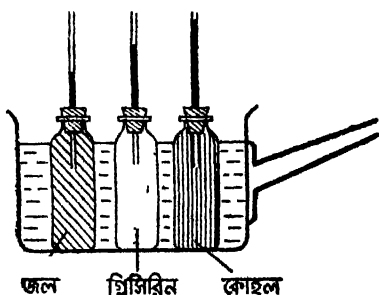
চিত্র নং ৯২ : সমান তাপে বিভিন্ন তরল পদার্থ সমান পরিমাণে প্রসারিত হয় না

পরীক্ষা : এইবার একটি সস্-প্যানএ (sauce pan) গরম জল লও। কয়েকটি **সমান আয়তনের** শিশি বিভিন্ন তরল পদার্থে পূর্ণ করিয়া পূর্বের ন্যায় সরু, কিন্তু সমান ব্যাসার্ধের, নল-বসানো ছিপি দিয়া আঁটিয়া দাও এবং সস্-প্যানে বসাইয়া পরীক্ষা

করিয়া দেখ—শিশিতে বিভিন্ন তরল পদার্থগুলি নলের মধ্যে বিভিন্ন উচ্চতা পর্যন্ত উঠিযাছে। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে—

(১) সকল প্রকার তরল পদার্থ (অবশ্য পৃথিবীর সকল প্রকার তরল পদার্থের উপর পরীক্ষা না করিয়া এরূপ সিদ্ধান্ত করা যুক্তিসিদ্ধ নহে) তাপের ফলে প্রসারিত হয় ;

(২) বিভিন্ন তরল পদার্থের প্রসারণশীলতা এক নহে।

বায়বীয় পদার্থের প্রসারণ—পরীক্ষা ঃ পূর্বের ন্যায় একটি ফ্লাস্ক, কিন্তু এবারে শূন্য অর্থাৎ কেবলমাত্র বায়ুপূর্ণ, লও। ঠিক পূর্বের ন্যায় আবার একটি সরু নল-বসানো ছিপি তৈয়ারি করিয়া ঐ সরু নলের মধ্যে একটু রঙ্গীন জল ঢুকিয়া তুলিযা লও। এখন ফ্লাসটিকে ক্ল্যাম্পের (clamp) মধ্যে শোয়াইয়া উহার মুখে নলসহ ঐ ছিপিটি আটকাইয়া ফ্লাসটিকে সোজা করিয়া বসাও। রঙীন জলের টুকরাটুকু নলের মধ্যে এক স্থানে স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে। (কেন বল দেখি ?) এখন দুই হাত ভাল করিয়া ঘসিয়া গরম করিয়া ফ্লাসটিকে চাপিয়া ধর; দেখিবে রঙ্গীন জলের টুকরাটুকু নল বাহিয়া সর সর করিয়া উঠিয়া যাইতেছে, হয়তো বা এত বেশী দূর উঠিবে যে নলের খোলা প্রান্ত দিয়া বাহির হইয়াই পড়িবে। ইহার কারণ সহজেই বোঝা যায়। হাতের উত্তাপে ভিতরের বাতাস প্রসারিত হইয়া জলের টুকরাটিকে উপরে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছে। এইবার একই অবস্থায় জলের প্রসারণের পরীক্ষাটি আবার করিয়া দেখ কোনটির প্রসারণশীলতা বেশী—জল না বাতাস ? এই পরীক্ষাগুলি হইতে সহজে বোঝা যাইবে যে সাধারণত—
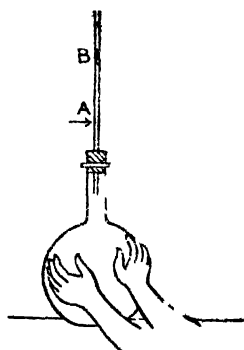
চিত্র নং ৯৩ : হাতের তালুর উত্তাপে পাত্রের বায়ু A হইতে B পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে

ক। তরল পদার্থ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয়।

খ। বায়বীয় পদার্থ তরল পদার্থ অপেক্ষা বেশী প্রসারিত হয়।

তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণ আমাদের জীবনে নানা প্রয়োজনে লাগে। পাঁউরুটি, রুটি, লুচি যে ফুলিয়া উঠে তাহার কারণ উহাদের মধ্যস্থ বাতাস বা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের প্রসারণ। এই প্রসারণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োগ বোধ হয় **পেট্রল ইঞ্জিন**। পেট্রল ইঞ্জিনে পেট্রল গ্যাস বাতাসের সহিত পুড়িয়া বিস্তৃত হইয়া ঐ চাপে একটি পিষ্টনকে সিলিণ্ডারের (cylinder) মধ্যে আসা-যাওয়া করায় এবং উহার সাহায্যে একটি চাকা ঘোরায়।
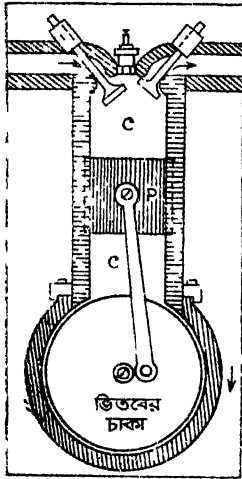
চিত্র নং ২৪ : পেট্রল ইঞ্জিনের সিলিণ্ডারে (C) পিষ্টন (P) প্রসারিত গ্যাসের চাপে ওঠা নামা করিয়া একটি চাকা ঘোরায়

সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ু—ব্যবহারিক জীবনে তাপের ফলে গ্যাসের প্রসারণের আর একটি ফল হইল—সমুদ্র বায়ু ও স্থল বায়ু। যদি পুরী বা দীঘার সমুদ্রতীরে বেড়াইতে যাও তাহা হইলে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে যে—

ক। দিনের বেলায় সমুদ্র হইতে স্থলের দিকে একটানা একটা মৃদু বাতাসের স্রোত বহিতে থাকে।

চিত্র নং ২৫ : দিবাভাগে সমুদ্রবায়ু জল হইতে স্থলের দিকে ও রাত্রে স্থলবায়ু জলের দিকে প্রবাহিত হয়

খ। রাত্রে ঐ স্রোত বিপরীতমুখে স্থলভাগ হইতে জলের দিকে বহিতে থাকে।

ইহার মূল কারণ হইল—তাপে গ্যাসীয় পদার্থের আয়তন বৃদ্ধি। স্থল জলের অপেক্ষা বেশী তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় বলিয়া দিনের বেলায় স্থলের উপরিভাগের বায়ু প্রসারিত হইয়া উপরে উঠিয়া যায়। কিন্তু **বাতাস প্রসারিত হইলে উপরে উঠে কেন?** ইহার কারণ—প্রসারিত হওয়ার অর্থ একই পরিমাণ বস্তু অধিকতর স্থান দখল করিবে, কাজে কাজেই উহা পাতলা অর্থাৎ হালকা হইয়া পড়ে। ভূপৃষ্ঠের পাতলা বাতাস উপরের অপেক্ষাকৃত **ঠাণ্ডা—সুতরাং ভারী**—বাতাসে ভাসিয়া উঠিবে (Archimedes' Principle এর কথা মনে কর) অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে। ফলে উহার স্থান অধিকার করিবার জন্য সমুদ্রপৃষ্ঠের অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা ও ভারী বাতাস ঐ দিকে ছুটিয়া আসিবে। ইহাই হইল—**সমুদ্রবায়ু**।

সূর্যাস্তের পর জল ও মাটি উভয়ই **ঠাণ্ডা** হইতে আরম্ভ করে, কিন্তু জল মাটি অপেক্ষা দেরীতে ঠাণ্ডা হয় বলিয়া সমুদ্রের উপরিভাগের বাতাস যখন গরম আছে, ভূপৃষ্ঠের বাতাস তখন অনেকটা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। সুতরাং পূর্বের নিয়মে সমুদ্রের বাতাস উপরের দিকে উঠিয়া যাইবে এবং উহার স্থান পূরণ করিবার জন্য স্থলভাগের ঠাণ্ডা, ভারী বাতাস সমুদ্রের দিকে ছুটিয়া যাইবে। ইহাই হইল **স্থলবায়ু**।

ভূপৃষ্ঠে বিভিন্ন প্রকার বায়ুপ্রবাহের মূল কারণও ইহাই অর্থাৎ পাশাপাশি অঞ্চলে উত্তাপের বিভিন্নতার জন্য বায়ুর ঘনত্বের তারতম্য ও তজ্জনিত উপরোক্ত রীতিতে বায়ুপ্রবাহের উৎপত্তি।

তাপ ও উষ্ণতা (Heat and Temperature)

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই পরিচ্ছেদে বর্ণিতব্য বিষয়ের আলোচনায় **তাপ** (বা উত্তাপ) এই শব্দটি মাত্র ব্যবহার করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন আমাদের আলোচনায় আর একটি নূতন শব্দ প্রয়োগ করিবার প্রয়োজন হইতেছে—**উষ্ণতা** (temperature)। আমরা বাংলায় উষ্ণতা শব্দটি বেশী ব্যবহার করি না এবং তাপ-সম্পর্কিত বিভিন্ন

অবস্থা বুঝাইতে 'তাপ' শব্দটিই বিভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করি। যেমন রোগীর গায়ের তাপ কত? আবহাওয়ার খবরে গতকালের তাপ কত ছিল? কত তাপে লোহা গলে?—ইত্যাদি। বৈজ্ঞানিকভাবে এ সব ক্ষেত্রে তাপ না বলিয়া **উষ্ণতা** শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। ইংরাজীতেও অনেক সময় বলা হয়—"red heat" বা "white heat" অবস্থা, আসলে কিন্তু এ সব ক্ষেত্রে **উত্তাপ না বুঝাইয়া উষ্ণতাই নির্দেশ করিতেছে।**

পরীক্ষা ঃ একটি ১০০০ সিঃসিঃ বিকারে ৫০০ সিঃসিঃ জল, ও একটি ৫০০ সিঃসিঃ বিকারে ২৫০ সিঃসিঃ জল লইয়া ত্রিপদ আধারে (stand) বসাইয়া দুইটি একই শক্তির বুনসেন বার্ণার লইয়া দুইটি পাত্রে **সমানভাবে** তাপ প্রয়োগ কর। প্রতি আধ মিনিট অন্তর প্রত্যেক বিকারের জল ভাল করিয়া আলোড়ক (stirrer) দিয়া নাড়িয়া দিয়া থার্মমিটরে উষ্ণতা পরীক্ষা কর। দেখিবে ছোট বিকারটির জলের উষ্ণতা বড় বিকারটির জলের উষ্ণতা অপেক্ষা দ্রুত বাড়িতেছে এবং বড় বিকারটির জল ফুটিবার বেশ পূর্বেই ছোট বিকারটির জল ফুটিতে আরম্ভ করিয়াছে। নীচে সুবিধার জন্য পরীক্ষার ফল স্তম্ভাকারে সাজানো হইল—
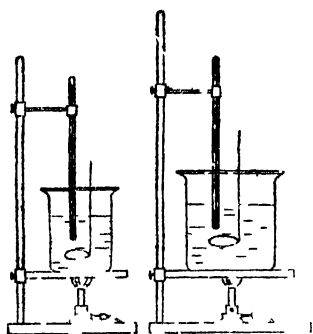
চিত্র নং ৯৬ ঃ তাপ ও উষ্ণতা—সমান তাপে বিভিন্ন পরিমাণ জল বিভিন্ন উষ্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে

পরীক্ষা	পর্যবেক্ষণ	সিদ্ধান্ত
ক। বিকারে ৫০০ সিঃসিঃ জলে নির্দিষ্ট শক্তির বুনসেন বাতি হইতে উত্তাপ প্রয়োগ।	১। প্রতি আধ মিনিট অন্তর উষ্ণতা পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল লেখ (graph) আকারে অংকন—উষ্ণতা ধীরে ধীরে বাড়িতেছে।	ক। দুইটি পাত্রের জল নির্দিষ্ট সময়ে একই পরিমাণ তাপ গ্রহণ করিলেও একই উষ্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই।

খ। বিকারে ২৫০ সিঃসিঃ জলে একই শক্তির বুনসেন বাতি হইতে উত্তাপ প্রয়োগ।

২। প্রতি আধ মিনিট অন্তর উষ্ণতা পরীক্ষা এবং পরীক্ষার ফল লেখ (graph) আকারে অংকন—উষ্ণতা অপেক্ষাকৃত দ্রুত গতিতে বাড়িতেছে।

খ। অধিক পরিমাণ জলের উষ্ণতা কম ও কম পরিমাণ জলের উষ্ণতা বেশী হইয়াছে।

গ। সম পরিমাণ তাপ—(১) অধিক পরিমাণ জলে সঞ্চারিত হইয়া উষ্ণতা কম হইয়াছে; (২) অল্প পরিমাণ জলে সঞ্চারিত হইয়া উষ্ণতা অধিক হইয়াছে।

অনুরূপ বিষয়ের তুলনায় বুঝিতে সুবিধা হইলে নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তটি লও—

পরীক্ষা ঃ দুইটি বড় কাচের গ্লাসের একটিতে এক কাপ জল ও আর একটিতে দুই কাপ জল লও। এইবার প্রথম গ্লাসে তিন বড় চামচ চিনি ও দ্বিতীয় গ্লাসে চার বড় চামচ চিনি দিয়া ভাল করিয়া মিশাইয়া দাও। এখন বল—

ক। কোন গ্লাসে চিনির পরিমাণ অধিক?

খ। কোন গ্লাসে জল অধিক মিষ্ট বোধ হইবে? কেন?

এই দৃষ্টান্তে—চিনির পরিমাণ → তাপ

জলের মিষ্টত্ব → উষ্ণতা—নির্দেশ করিতেছে।

তাপ ও উষ্ণতার পার্থক্য বোধ হয় এখন সুস্পষ্ট হইয়াছে। নীচের পরীক্ষায় এই পার্থক্য অন্য আর একদিক হইতে স্পষ্টতর হইবে—

পরীক্ষা ঃ চিত্রের ন্যায় একটি যন্ত্র সাজাও: একদিকে একটি বেলজার

একটি নল দিয়া অপর দিকে একটি অপেক্ষাকৃত সরু কাচের পাত্রের সহিত যুক্ত আছে। নলের মধ্য দিয়া যাতায়াতের পথ একটি ক্লিপ দিয়া বন্ধ করা যায়। এইবার ক্লিপটি বন্ধ অবস্থায় A পাত্রে কিছু জল ঢাল এবং B পাত্রে উহার প্রায় অর্ধেক পরিমাণ জল ঢাল। দেখিবে B পাত্রে জল কম হইলেও পাত্রটি অনেক ছোট বলিয়া উহাতে জলের উচ্চতা A পাত্রের জলের উচ্চতা অপেক্ষা বেশী হইয়াছে। এখন ক্লিপটি খুলিয়া দিলে দেখিবে B পাত্র হইতে জল A পাত্রে প্রবেশ করিতেছে।
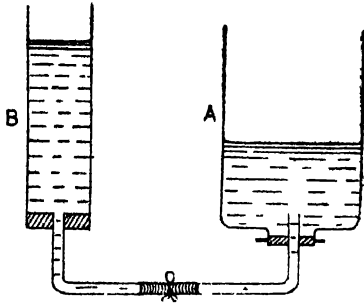
চিত্র নং ৯৭ : B পাত্রের জল পরিমাণে কম হইলেও উহার উচ্চতা বেশী বলিয়া ক্লিপ খুলিলে A পাত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইবে

এই পরীক্ষায়—

জলের পরিমাণ → তাপ

জলের উচ্চতা → উষ্ণতা—নির্দেশ করিতেছে।

যেমন দুইটি পরস্পর-সংযুক্ত পাত্রে জল কোনদিকে প্রবাহিত হইবে তাহা উভয় পাত্রে জলের উচ্চতার পার্থক্য দ্বারা নির্ণীত হয়, (পরিমাণের পার্থক্য দ্বারা নহে) তেমনি **তাপ কোন দিকে প্রবাহিত হইবে** তাহা উভয় বস্তুর **উষ্ণতার পার্থক্য** দ্বারা নির্দিষ্ট হয়, **তাপের পরিমাণের পার্থক্য** দ্বারা নহে।

আরও একটি দৃষ্টান্ত বিবেচনা কর : এক বালতি গরম জলের **তাপ** একটি **আগুনে লাল-করা** লোহার মারবেল অপেক্ষা নিশ্চয় অনেক বেশী কিন্তু **উষ্ণতা** যে অনেক কম—সহজেই বুঝা যায়। অতএব জলে ডুবাইলে লোহার মারবেলটি হইতে তাপ জলের মধ্যে প্রবাহিত হইবে যতক্ষণ পর্যন্ত না উভয়ের উষ্ণতা এক হয়।

উষ্ণতার তারতম্য অনেক সময় আমাদের ইন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব করা কঠিন হইয়া পড়ে। যেমন হাত ঠাণ্ডা থাকিলে যে জল স্পর্শ করিয়া গরম

মনে হয়, উহাই আবার হাত গরম থাকিলে ঠাণ্ডা বোধ হইবে। আবার দেখ কোনও দিন খুব গরম বোধ হইল অথচ পরের দিন আবহাওয়া সংবাদে দেখা গেল সেদিন উষ্ণতা তত অধিক ছিল না, কিন্তু যে দিন এমন কিছু অসহ্য গরম বোধ হইল না, হয়তো আবহাওয়া সংবাদে তাহার পরের দিন ঘোষিত হইল—"গতকল্য এ পর্যন্ত বৎসরের উষ্ণতম দিন ছিল।"

থার্মমিটার (Thermometer)

সুতরাং ল্যাবরেটরীতে যেখানে উষ্ণতার সূক্ষ্ম পরিবর্তনও আমাদের বিবেচনা করিতে হইবে সেখানে ইন্দ্রিয়ের অনুভূতি যে একেবারে অচল সহজেই বুঝা যায়। এই জন্যই **থার্মমিটার** (thermos অর্থ তাপ, meter অর্থ মাপক) যন্ত্রের আবিষ্কার। পূর্বের পরীক্ষায় আমরা উষ্ণতা মাপিবার জন্য থার্মমিটার ব্যবহার করিয়াছি। এই থার্মমিটার যাহা মাপিয়াছিল তাহাকে আমরা বস্তুর **একপ্রকার তাপীয় অবস্থা** (thermal state) বলিতে পারি। **ইহাকেই** বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় আমরা **উষ্ণতা বলিয়াছি।** ব্যবহারিক জীবনে তাপ অপেক্ষা উষ্ণতা **জানিবারই** প্রয়োজন হয় আমাদের বেশী। তাই থার্মমিটারের এত ব্যাপক ব্যবহার।

থার্মমিটারের গঠন ও নির্মাণ পদ্ধতি—একটি সরু কাচের নলের মধ্যে লম্বালম্বি, চুলের ন্যায় সূক্ষ্ম একটি রন্ধ্র রাখা হইয়াছে। নলটির এক প্রান্তে একটি ছোট্ট **কুণ্ড** (bulb) ফুঁ দিয়া ফুলাইয়া তৈরি করা হইয়াছে। ঐ সূক্ষ্ম রন্ধ্রের মধ্য দিয়া **কৌশলে** কিছু **পারদ** নলটির মধ্যে প্রবেশ করাইয়া বাল্বটি ও নলের কিছু অংশ পারদে ভর্তি করা হয়। এখন বাল্বটিকে উত্তপ্ত করিলে যখন ভিতরের পারদ আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া সমস্ত রন্ধ্রটিকে পূর্ণ করিবে তখন তাড়াতাড়ি নলটির খোলা প্রান্ত আগুনে গলাইয়া নরম করিয়া বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঠাণ্ডা হইলে পারদস্তম্ভ সংকুচিত হইয়া কুণ্ড ও রন্ধ্রের সামান্য কিছু অংশ পর্যন্ত ভর্তি করিবে; বাকী

চিত্র নং ১৮ : থার্মমিটার—কুণ্ড ও রন্ধ্রের কিছু অংশ পারদ ভর্তি রহিয়াছে

অংশ সম্পূর্ণ শূন্য অর্থাৎ **বায়ুশূন্য**। এইবার যন্ত্রটিতে উষ্ণতার **মাত্রা নির্দেশক চিহ্ন** (scale) অংকিত করিতে হইবে—

ইহার জন্য প্রযোজন দুইটি **নির্দিষ্ট উষ্ণতা** বা **স্থিরাঙ্ক** (fixed points)—যাহাদের ভিত্তি করিয়া অন্য তাপাঙ্কগুলি চিহ্নিত করিতে হইবে। প্রকৃতির বিধানে এরূপ সুবিধাজনক দুইটি তাপাঙ্ক নির্দিষ্ট হইয়াছে। ইহারা হইল—

ক। বিশুদ্ধ **গলমান বরফের** (melting ice) উষ্ণতা;

খ। বিশুদ্ধ **ফুটন্ত জলের** উষ্ণতা (বায়ুমণ্ডলের সাধারণ চাপে), কারণ আমরা জানি এই দুইটি উষ্ণতার মাত্রা নির্দিষ্ট অর্থাৎ ইহাদের তারতম্য হয় না।

স্থিরাঙ্ক নির্ণয়—থার্মমিটরটিকে **লম্বভাবে** একটি আধারে (stand) আঁটিয়া উহার কুণ্ডটিকে একটি বেসিন বা ফানেলের মধ্যে পরিষ্কার বরফের টুকরা ভর্তি করিয়া উহাতে ডুবাইয়া রাখা হয় যতক্ষণ পর্যন্ত না পারদস্তম্ভটি এক জায়গায় নামিয়া আসিয়া স্থির হইয়া দাঁড়ায়। এই জায়গায় একটি **দাগ কাটা** হয়। ইহাই হইল—নিম্ন মানবিন্দু (lower fixed point) বা **হিমাঙ্ক** (freezing point)।
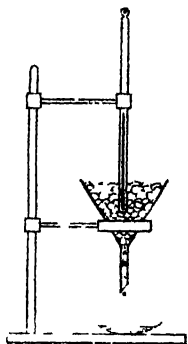
চিত্র নং ৯৯ : থার্মমিটরের নিম্ন মানবিন্দু নির্ণয়

চিত্র নং ১০০ : থার্মমিটরের ঊর্ধ্ব মানবিন্দু নির্ণয়
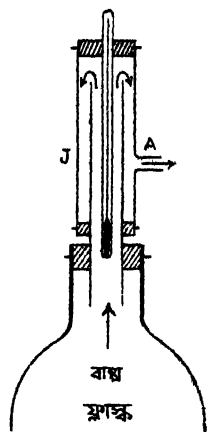
ইহার পর আবার থার্মমিটরটিকে একটি ফ্লাস্কের **ফুটন্ত জলের বাষ্পে** বেশ কিছুক্ষণ ঝুলাইয়া রাখিয়া যখন দেখা যাইবে যে পারদস্তম্ভ একটি স্থান পর্যন্ত উঠিয়া স্থির হইয়া আছে তখন ঐ স্থানে আর একটি দাগ কাটা হয়। উপরের চিত্রে যেরূপ যন্ত্র দেখানো হইয়াছে ঐরূপ ব্যবস্থা এই উদ্দেশ্যে প্রযোজন। ইহাতে লক্ষ্য কর—

ক। পাতন প্রণালীতে লিবিগ শীতকের (condenser) ন্যায় ফ্লাস্কের মুখে একটি সরু নলের চারিদিকে আর একটি মোটা কাচের নলের (jacket) ব্যবস্থা আছে—যাহাতে পারদস্তম্ভের সমগ্র অংশ ফুটন্ত জলের বাষ্পে থাকিতে পারে।

খ। বাষ্পের চাপ যাহাতে বাহিরের বায়ুমণ্ডলের চাপের অপেক্ষা কম বা বেশী না হয় সেজন্য ফ্লাস্কের ভিতর ও বায়ুমণ্ডলের সহিত A নলের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখা হইয়াছে।

গ। থার্মমিটারের কুণ্ড জল স্পর্শ না করিয়া ঠিক উপরে আছে, কেন না জল বিশুদ্ধ না হইলে উহার স্ফুটনাঙ্ক বেশী হইবে, কিন্তু বাষ্প সব সময়ই বিশুদ্ধ।

এখন যদি **সেণ্টিগ্রেড** (Centegrade) **থার্মমিটবের স্কেল** তৈয়ার করিতে হয় তাহা হইলে নিম্নাঙ্কটিতে 0° ও ঊর্ধ্বাঙ্কটিতে 100 চিহ্ন দিয়া মধ্যের অংশটি **সমান** ১০০ ভাগে (থার্মমিটর দেখিবার সুবিধার জন্য প্রতি ৫ম ঘরের দাগটিকে একটু বেশী লম্বা করিয়া ও ১০ম ঘরের দাগটিকে আরও একটু বেশী লম্বা করিয়া টানা হয়) ভাগ করা হয়। তাহা হইলে এক একটি ঘর এক এক ডিগ্রী **সেণ্টিগ্রেড** উষ্ণতা জ্ঞাপন করিবে(১° সেঃ বা 1°C)।

চিত্র নং ১০১ ফ্যারেনহাইট ও সেণ্টিগ্রেড থার্মমিটারের স্কেল চিহ্নিত করিবার নীতি

ঐরূপ **ফ্যারেনহাইট** (Fahrenheit) **স্কেলে**—

নিম্নাঙ্কটিকে 32° ও ঊর্ধ্বাঙ্কটিকে 212° চিহ্নিত করিয়া মধ্যের অংশটিকে সমান ১৮০ ভাগে ভাগ করা হয়, তখন এক একটি ঘর এক ডিগ্রী **ফ্যারেনহাইট** উষ্ণতা নির্দেশ করিবে (১°ফাঃ বা 1°F)।

অতএব **থার্মমিটরের মূল নীতি** হইল উত্তাপে তরল পদার্থের প্রসারণ—
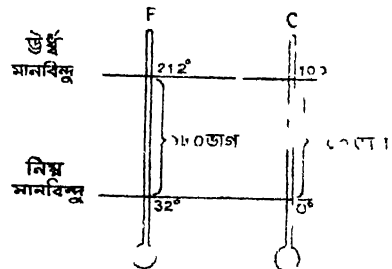
ক। বরফ বা ফুটন্ত জলের বাষ্পের সংস্পর্শে যখন থার্মমিটরের পারদ-স্তম্ভকে রাখিয়া দেওয়া যায় তখন পারদের উষ্ণতা যথাক্রমে উহাদের উষ্ণতার সমান হয় এবং তদনুযায়ী পারদস্তম্ভ দৈর্ঘ্যে সংকুচিত বা প্রসারিত হয়।

খ। যদিও মাত্র দুইটি স্থিরাঙ্কের উষ্ণতা প্রথমে থার্মমিটরের গাত্রে চিহ্নিত করিয়া লওয়া হয়, **মধ্যের রন্ধ্রটি বরাবর সমান বলিয়া** আমরা ধরিয়া লইতে পারি যে এই দুই স্থিরাঙ্কের সীমার মধ্যে (বা বাহিরে) উষ্ণতা যখন যে পরিমাণে বাড়িবে বা কমিবে পারদস্তম্ভের দৈর্ঘ্যও ঠিক **সেই অনুপাতে** বাড়িবে বা কমিবে। কাজেই থার্মমিটরের গায়ে চিহ্নিত স্কেলে ঐ দৈর্ঘ্য দেখিয়া আমরা বস্তুটির উষ্ণতা জানিতে পারিব।

পারদ কেন ব্যবহার হয়

পারদ (১) একমাত্র **তরল ধাতু**. (২) ইহার হিমাঙ্ক খুব নিম্নে এবং স্ফুটনাঙ্ক বেশ উপরে—সুতরাং ইহার সাহায্যে খুব শীতল ও খুব উষ্ণ বস্তুরও উষ্ণতা মাপার সুবিধা হয়, (৩) ইহা উষ্ণতার সহিত **সমান অনুপাতে প্রসারিত বা সংকুচিত হয়** এবং আরও নানা কারণে পারদই সচরাচর থার্মমিটরে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শারীর থার্মমিটর (**clinical thermometer**)—পরিবারে থার্মমিটরের ব্যবহার হইল সাধারণত রোগীর জ্বর দেখিবার জন্য। ল্যাবরেটরীতে যে বস্তুর উষ্ণতা মাপিতে হইবে সেই বস্তুর **সংস্পর্শে থাকাকালীন অবস্থায়ই** থার্মমিটর দেখা হয়। কিন্তু রোগীর জ্বর দেখিবার জন্য যখন থার্মমিটর ব্যবহৃত হয় তখন উহাকে মুখ বা বগল হইতে **বাহির করিয়া** উষ্ণতার চিহ্ন দেখিতে হইবে। কিন্তু এইটুকু সময়ের মধ্যেই থার্মমিটরের পারদের উষ্ণতার পরিবর্তন ঘটিতে পারে (ঘরের বাতাসের সংস্পর্শে) এবং তখন আমরা থার্মমিটরের স্কেলে যে উষ্ণতা দেখিব তাহা **রোগীর গায়ের উষ্ণতা না-ও হইতে পারে**। এই অসুবিধা দূর করিবার উপায় কি? পরবর্তী চিত্রটি দেখ—

থার্মমিটরের মধ্যের রন্ধ্রটি কুণ্ডের কিছু উপরে এক স্থানে (c বিন্দুতে) খুব সংকুচিত হইয়া গিয়াছে। কুণ্ডটি রোগীর দেহের সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইলে
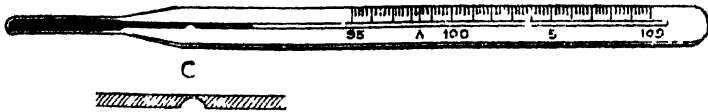
চিত্র নং ১০২ : শারীর থার্মমিটর—রন্ধ্রের সংকুচিত স্থানটির (C) গঠন লক্ষ্য কর

কুণ্ডের পারদ প্রসারিত হইয়া ঐ সংকুচিত স্থানের বাধা অতিক্রম করিয়া রন্ধ্রের মধ্যে চলিয়া আসে। কিন্তু থার্মমিটরটি বাহিরে আনিলে যদি কুণ্ডের পারদ সংকুচিত হয়, তাহা হইলেও প্রসারিত পারদস্তম্ভ ঐ সংকুচিত স্থান অতিক্রম করিয়া আর কুণ্ডে ফিরিয়া আসিতে পারে না, কারণ তাহার **পূর্বেই কুণ্ডের পারদ দ্রুত সংকুচিত হওয়ায় ঐ স্থানে পারদস্তম্ভটি ছিঁড়িয়া যায়।** রন্ধ্রের পারদস্তম্ভও অবশ্য সংকুচিত হয় কিন্তু তাহার পরিমাণ এত কম যে তাহাতে কিছুই যায় আসে না।

শারীর থার্মমিটরের কুণ্ডের কাচ খুব পাতলা বলিয়া উহাকে **যেন কখনও গরম জলে ডুবানো না হয়,** তাহা হইলে উহা ফাটিয়া যাইবে।

এই থার্মমিটর পুনরায় ব্যবহার করিবার জন্য ইহাকে **'ঝাড়িয়া'** লইতে হয় অর্থাৎ ঝাঁকানি দিয়া রন্ধ্রের মধ্যস্থ পারদকে কুণ্ডের দিকে ফিরাইয়া আনিতে হয়। এই থার্মমিটারে 95° হইতে 109 বা 110° পর্যন্ত দাগ কাটা থাকে কারণ রোগীর দেহের উষ্ণতা এই সীমার মধ্যেই ওঠানামা করে। এইজন্য এই থার্মমিটর আকারে অনেক ছোট। সুবিধার জন্য স্কেলের **98.4° দাগে** একটি তীর চিহ্ন দেওয়া আছে। কারণ ইহা সুস্থ অবস্থায় মুখের (জিহ্বার নীচে) উষ্ণতা জ্ঞাপন করে অর্থাৎ ইহা মানুষের **দেহের স্বাভাবিক উত্তাপ** (normal temperature)

লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মমিটর (maximum and minimum thermometer)—অনেক সময় দিনের মধ্যে কোনও স্থানে উচ্চতম ও নিম্নতম উষ্ণতা কত হইয়াছিল তাহা জানা প্রয়োজন হয়। যেমন বোটানিক্যাল গার্ডেনসের (Botanical Gardens) **গ্রীন হাউস**এ (green house) অনেক সযত্নপালিত উদ্ভিদ রক্ষিত হয় সুতরাং ইহার উষ্ণতার তারতম্য নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। কিন্তু এই উদ্দেশ্যে উষ্ণতা দেখিবার জন্য দিবারাত্র কোনও

লোককে বসাইয়া না রাখিয়া **লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মমিটর** ব্যবহার করিলেই চলে। এখানে এই জাতীয় থার্মমিটরের চিত্র ও বর্ণনা দেওয়া হইল :—

লঘিষ্ঠ থার্মমিটর—এখানে পারদের পরিবর্তে থার্মমিটরের মধ্যে **কোহল** (alcohol) রহিয়াছে এবং থার্মমিটরটিকে ভূমির সহিত **সমান্তরালভাবে** রাখা হয়। ভিতরে **কোহলে ডুবানো** একটি ছোট কাচের পিন আছে। উহাই **সূচক** (index)এর কাজ করে।

চিত্র নং ১০৩ : লঘিষ্ঠ থার্মমিটর—সূচকটিকে পিছনে ফেলিয়া কোহল প্রসারিত হইয়া সামনে আগাইয়া গিয়াছে

উষ্ণতা কমিলে যখন কোহল সংকুচিত হয় তখন উহার **অবতল** উপরিভাগ (menicus) পিনটিকে টানিয়া পিছনে লইয়া যায়। কিন্তু উষ্ণতা বাড়িলে আবার যখন কোহলের প্রসারণ হয় তখন পিনটি যেখানে ছিল সেখানেই পড়িয়া থাকে। সুতরাং পিনের **অগ্রভাগ** দিবসের **নিম্নতম** উষ্ণতা জ্ঞাপন করে। যন্ত্রটিকে পুনরায় সেট (set) করিবার জন্য একটু সামনের দিকে হেলাইয়া ধরা হয়, তখন সূচকটি নিজের ভারে কোহলের মধ্য দিয়া নামিয়া আবার উহার প্রান্ত ভাগে আসিয়া অবস্থান করে।

গরিষ্ঠ থার্মমিটর—এখানেও একই ব্যবস্থা, শুধু (১) কোহলের পরিবর্তে থার্মমিটরে পারদ ব্যবহার করা হয়, (২) কাচের পিনটি পারদের **বাহিরে** থাকে। উষ্ণতা বাড়িলে পারদস্তম্ভের **উত্তল** উপরিভাগ পিনটিকে ঠেলিয়া আগাইয়া লইয়া যায়। আবার পারদস্তম্ভের সংকোচন হইলে যখন পারদস্তম্ভটি পিছাইয়া আসে তখন পিনটি পূর্বের স্থানেই রহিয়া যায়। সুতরাং পিনটির **পশ্চাদ্ভাগ** দিবসের **উচ্চতম** উষ্ণতা নির্দেশ করে।
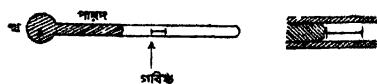
চিত্র নং ১০৪ : গরিষ্ঠ থার্মমিটর—সূচকটিকে সম্মুখে রাখিয়া পারদ সংকুচিত হইয়া পিছাইয়া আসিয়াছে

এই উভয় ব্যবস্থা একটি থার্মমিটরের মধ্যেও একত্র করা যাইতে পারে। Six's Maximum and Minimum Thermometer এই জাতীয় থার্মমিটর।

সিক্সের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মমিটর—ইহা একটি U-আকৃতির নল বিশেষ। ইহার চিত্রটি ভাল করিয়া দেখিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর। এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয়—

চিত্র নং ১০৫ : সিক্সের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মমিটরের গঠন-নীতি—সূচকটি যাহাতে স্থানচ্যুত না হয় এজন্য স্প্রিং দিয়া আঁটা থাকে

ক। প্রসারণ প্রকোষ্ঠ (expansion chamber) B—প্রসারণের জায়গা দিবার জন্য ইহার কিছু অংশ শূন্য থাকে।

খ। কাচের পিনের পরিবর্তে একটি **ইস্পাতের পিনকে** স্প্রিং (spring) দিয়া নলের দেওয়ালের সহিত আঁটিয়া রাখা হয়, যেন উহা আপনা হইতে নিজের স্থান হইতে সরিয়া না যায়। পিনটিকে নাড়াচাড়া করিবার জন্য বাহির হইতে একটি **চুম্বক** ব্যবহার করিয়া সারিতে হয়।

চিত্র নং ১০৬ : সিক্সের লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মমিটর, ডান পার্শ্বে কোহল ও বাম পার্শ্বে পারদ সূচক দুইটিকে যথাস্থানে টানিয়া বা ঠেলিয়া লইয়া যায়

গ। এখানে মূল প্রসারণশীল তরল পদার্থটি হইল A পাত্রস্থ কোহল। যন্ত্রের অন্যান্য অংশের তরল পদার্থগুলি কিছু কিছু প্রসারিত হইলেও উহাদের প্রসারণ উপেক্ষা করা চলিতে পারে। (এখানে ইস্পাতের পিন, স্প্রিং ও চুম্বক ব্যবহার করা প্রয়োজন কেন ভাবিয়া বল)।

ঘ। স্কেল দুইটির তাপাঙ্ক এক বাহুতে **উপর হইতে নীচের দিকে** ও অন্য বাহুতে **নীচে হইতে উপরের দিকে** বাড়িয়া গিয়াছে—কারণ লক্ষ্য

কর উষ্ণতা মাপিবার জন্য দুই বাহুতে সূচক দুইটির অবস্থান থার্মমিটারের স্কেলে এই ভাবেই দেখিতে হইবে।

সিক্সের থার্মমিটরের **সচরাচর যেরূপ গঠন** হইয়া থাকে তাহার একটি চিত্র (চিত্র নং ১০৬) দেওয়া হইয়াছে: ইহাতে প্রভেদের মধ্যে লক্ষ্য কর—শুধু পূর্বের চিত্রের A পাত্রটির (এখানে B ও C) গলা বাঁকাইয়া উহাকে U-নলের দুই বাহুর মধ্যে আনা হইয়াছে যাহাতে সমগ্র যন্ত্রটিকে বেশী বড় না করিয়া A পাত্রটিকে আয়তনে যথাসম্ভব বড় করা যায়। কারণ পাত্রস্থ কোহল যত বেশী হইবে তাহার সংকোচন-প্রসারণও তত অধিক হইবে এবং যন্ত্রটিও তত সূক্ষ্ম হইবে।

অবস্থার পরিবর্তন

পূর্বে বলা হইয়াছে যে তাপ প্রয়োগের ফলে পদার্থের অণুগুলির চঞ্চলতা বৃদ্ধি পাইলে (১) উহার উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়, (২) অণুগুলির ব্যবধান বাড়িয়া যাওয়ার ফলে পদার্থের আয়তনও বাড়িয়া যায়। এইভাবে আয়তন বাড়িয়া যখন উহা একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছে তখন পদার্থের রূপান্তর ঘটিতে থাকে এবং উহা কঠিন পদার্থ হইলে তরল পদার্থে ও তরল পদার্থ হইলে গ্যাসীয় পদার্থে পরিণত হয়। বিপরীতক্রমে—তরল পদার্থকে শীতল করিলে কঠিন পদার্থে ও বায়বীয় পদার্থকে শীতল করিলে তরল পদার্থে পরিণত হয়। তাপের প্রভাবে **জলের এই রূপান্তর** আমাদের সহজেই চোখে পড়ে। জলকে আমরা সাধারণত তরল পদার্থ বলিয়া থাকি। কিন্তু তুন্দ্রা অঞ্চলে **এস্কিমোরা জলকে কঠিন পদার্থ বলিয়াই মনে করে।** সুতরাং কোনও বস্তু কঠিন, কি তরল বা গ্যাসীয় ইহা বলা বৈজ্ঞানিকভাবে সম্পূর্ণ নিভুর্ল নহে কারণ এই গুণগুলি **নির্দিষ্ট উষ্ণতায়** বস্তুর এক একটি অবস্থা মাত্র।

চিত্র নং ১০৭ : এক গ্লাস বরফ জল ; পাত্রে বরফ, জল ও বাষ্পের একত্র মিলন—বাহিরের গায়ে বাষ্পের ঘনীভবন

নারিকেল তৈল, গালা, মোমবাতি, ঘৃত প্রভৃতির ক্ষেত্রে কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় রূপান্তর আমরা প্রায়ই দেখিয়া থাকি। তেমনি স্পিরিট, ক্লোরোফরম (chloroform) ইহাদের ক্ষেত্রে তরল অবস্থা হইতে বায়বীয় অবস্থায় রূপান্তর সচরাচর লক্ষ্য করিয়া থাকি। কিন্তু উপরোক্ত প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়া আমরা তৃতীয় অবস্থাটির সৃষ্টি করিতে পারি। তেমনি সোনা, লোহা, পারদ প্রভৃতি ধাতু, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি গ্যাস—প্রায় সকল প্রকার পদার্থকেই ইহাদের সাধারণ অবস্থা হইতে অপর দুইটি অবস্থায় পরিণত করা যাইতে পারে। কল্পনা করিয়া দেখ—
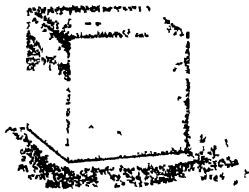
চিত্র নং ১০৮ : বরফ বটে, কিন্তু শুষ্ক অর্থাৎ জমাট কার্বন ডাই-অক্সাইডের এক খণ্ড—কঠিন অবস্থা হইতে একেবারে বাষ্পে পরিণত হয় বলিয়া ইহার নাম "শুষ্ক বরফ" (dry ice)
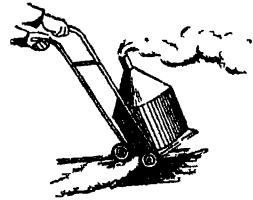
চিত্র নং ১০৯ : ধূমায়মান তরল অক্সিজেন তাপরোধক পাত্রে ঠেলিয়া লইয়া যাওয়া হইতেছে

খানিকটা **সোনার বাষ্প, কঠিন বাতাস** বা **তরল অক্সিজেন** লইয়া নাড়াচাড়া করিতেছ—বেশ মজার ব্যাপার নহে কি? কিন্তু কাঠ, কয়লা, কাগজ প্রভৃতি বস্তুকে তরল বা বায়বীয় অবস্থায় লইয়া যাওয়া যায় না, কারণ তাপে ইহাদের **অবস্থার পরিবর্তন** ঘটিবার পূর্বেই **রাসায়নিক পরিবর্তন** ঘটিয়া উহারা ভিন্ন বস্তুতে পরিণত হয়।

যে উষ্ণতায় কোনও পদার্থের রূপান্তর ঘটে তাহার এক একটি নির্দিষ্ট মাত্রা আছে এবং সাধারণতঃ ইহার পরিবর্তন ঘটে না। তাই বিভিন্ন বস্তুকে চিনিতে উহাদের গলনাঙ্ক (melting point) বা স্ফুটনাঙ্ক (boiling point)এর সাহায্য লওয়া হয়। নীচে কয়েকটি বস্তুর অবস্থান্তর ঘটিবার নির্দিষ্ট তাপাঙ্কগুলি দেখানো হইল। এইগুলি অবশ্য

শুধু **বিশুদ্ধ পদার্থ** সম্বন্ধেই সত্য—

পদার্থ	গলনাঙ্ক	স্ফুটনাঙ্ক
১। ঈথর	...	35°c
২। ক্লোরোফরম	...	61°c
৩। কোহল	...	78°c
৪। জল	...	100°c
৫। গ্লিসিরিণ	...	220°c
৬। পারদ	...	357°c
১। বরফ	0°c	...
২। মাখন	30°c	...
৩। মোম	50 c	...
৪। গন্ধক	115°c	...
৫। সিসা	327°c	...
৬। তামা	1083°c	...
৭। লোহা	1527°c	...

অবিশুদ্ধ অর্থাৎ **মিশ্রিত পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক সাধারণত বিশুদ্ধ পদার্থের গলনাঙ্ক ও স্ফুটনাঙ্ক হইতে যথাক্রমে কম ও বেশী হয়।** এই কারণে ছাঁচে কুলপী মালাই বানাইতে হাঁড়ির মধ্যে বরফের টুকরার সহিত লবণ মিশ্রিত করা হয় কারণ ইহাতে বরফের উত্তাপ 0° সেঃ এর নীচে চলিয়া যায়।

এমন **সংকর ধাতু** (alloy) অর্থাৎ দুইটি বা তিনটি ধাতুর মিশ্রণ প্রস্তুত করা হইয়াছে যাহা মাত্র ৬৫°সেঃ উষ্ণতায় অর্থাৎ ধর চায়ের পেয়ালায় গলিয়া যাইবে। শীতের দেশে রাস্তার উপর জমা বরফ গলাইবার জন্য (যাহাতে গাড়ী পিছলাইয়া পড়িয়া না যায়) লবণ ছিটাইয়া দেওয়া হয়। (ঠিক এক জাতীয় ব্যাপার না হইলেও আমাদের দেশে রাস্তার গলা পীচ চাপা দিবার জন্য

বালি ছিটাইবার রীতি ইহার সহিত তুলনা করা চলে)। **কাচ** কতকগুলি পদার্থের **মিশ্রণ** বলিয়া কঠিন অবস্থা হইতে তরল অবস্থায় একেবারে পরিবর্তিত না হইয়া ধীরে ধীরে কর্দমের ন্যায় অবস্থার মধ্য দিয়া এই পরিবর্তন ঘটে এবং এজন্য উহাকে **ফুঁ দিয়া নানা জাতীয় কাচের পাত্রে পরিণত করার সুবিধা** হয়।

অধিক অংশ বস্তু গলিলে আয়তনে বাড়ে এবং কঠিন হইলে সংকুচিত হয়। এই কারণে সোনা ও রূপার **টাকা ছাঁচে প্রস্তুত করা যায় না**, উহাদের চাপ দিয়া মোহরাঙ্কিত করা হয়।

কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সাধারণ ধর্ম—কঠিন পদার্থের অণুগুলি কাছাকাছি থাকে বলিয়া উহাদের মধ্যে আকর্ষণ অধিক। তাই বস্তুটির একটি নির্দিষ্ট **আকার ও আয়তন আছে**—উহার সহজে পরিবর্তন হয় না। **তরল পদার্থের** অণুগুলি অপেক্ষাকৃত ছড়ানো, তাই উহাদের মধ্যে আকর্ষণও কম এবং সেই কারণে তরল পদার্থের যদিও নির্দিষ্ট **আয়তন আছে**, কিন্তু কোনও নির্দিষ্ট **আকার নাই** যেরূপ পাত্রে রাখা যায় সেইরূপ আকার ধারণ করে। **গ্যাসীয় পদার্থের** অণুগুলির ব্যবধান আরও অধিক, তাই উহাদের মধ্যে কোনও আকর্ষণ তো নাই-ই, উপরন্তু সব সময়ই উহারা পরস্পর হইতে দূরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছে। যেন গ্যাসীয় পদার্থের কোন নির্দিষ্ট **আকার ও আয়তন নাই**, আপনা হইতেই বিস্তৃত হইয়া আধারটিকে পূর্ণ করিয়া ফেলে।

অবস্থার পরিবর্তনে তাপের স্থান—এইবার তাপ প্রয়োগের সহিত পদার্থের রূপান্তরের কি সম্বন্ধ উহা একটু বুঝাইয়া দেখিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

পরীক্ষা: একটি ফ্লাস্কে জল রাখিয়া উহাকে উত্তপ্ত কর এবং জলের মধ্যে একটি থার্মমিটার রাখ। যখন জল ফুটিতে আরম্ভ করিবে তখন থার্মমিটারে উষ্ণতা লক্ষ্য কর—ইহা ১০০° সেঃ এর কাছাকাছি হইবে। ইহার পরও উত্তাপ দিয়া যাও—দেখিবে জল ফুটিয়া বাষ্প হইতে থাকিবে—কিন্তু থার্মমিটার সেই একই উষ্ণতা—১০০° সেঃ দেখাইয়া চলিবে।

জলের উষ্ণতা আর বাড়িতেছে না কেন? ব্যাপারটি এইরূপ—
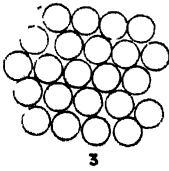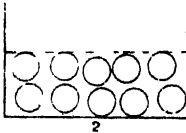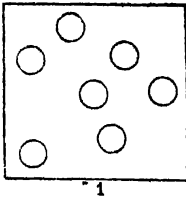
চিত্র নং ১১০ : 1—গ্যাসীয়, 2—তরল, 3—কঠিন পদার্থে অণুগুলির অবস্থান ; ব্যবধান কম বেশী লক্ষ্য কর

জল যদিও ক্রমাগত অগ্নি হইতে তাপ গ্রহণ করিয়া চলিয়াছে কিন্তু সে তাপ উহার উষ্ণতাকে না বাড়াইয়া উহার **রূপান্তরে সাহায্য করিতেছে।** আমরা কল্পনা করিতে পারি ঐ তাপ যেন শোষিত হইয়া বাষ্পের অণুগুলির মধ্যে অবস্থান করিতেছে। ঐরূপ, একটি টিনের মধ্যে বরফের কতকগুলি টুকরা লইয়া পাত্রটিকে মৃদু তাপে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিয়া দেখ যতক্ষণ পর্য্যন্ত এক টুকরা বরফ থাকিবে ততক্ষণ পর্যন্ত বরফ বা উহা হইতে উৎপন্ন জলের উষ্ণতা আর বাড়িবে না। এখানেও পূর্বের মত সমস্ত তাপ বরফের রূপান্তর ঘটাইতে ব্যয়িত হইতেছে অর্থাৎ উহা যেন জলের অণুগুলির মধ্যে শোষিত হইয়া যাইতেছে। সমস্ত বরফ গলিয়া জল হইয়া যাইবার পরও যদি তাপ প্রয়োগ করা হয় তবেই সে তাপ সাধারণ নিয়মে জলের উষ্ণতা বৃদ্ধি করিবে।

উভয় ক্ষেত্রে এই শোষিত তাপকে **সুপ্ত তাপ** (latent heat—latent অর্থ লুক্কায়িত) বলে। বিপরীতক্রমে, বাষ্প হইতে জল বা জল হইতে বরফ সৃষ্টি হইলে ঐ **সুপ্ত তাপ আবার বাহির হইয়া আসে।** উহা হইতে সাধারণভাবে বলা যায়—

ক। তরল পদার্থ উহা হইতে উৎপন্ন সমান পরিমাণ কঠিন পদার্থ অপেক্ষা বেশী তাপ ধারণ করে ;

খ। বাষ্পীয় পদার্থ উহা হইতে উৎপন্ন সমান পরিমাণ তরল পদার্থ অপেক্ষা বেশী তাপ ধারণ করে।

এই সূত্র দুইটির অনেকগুলি ব্যবহারিক দিক আছে। যেমন—

ক। **ফুটন্ত জল অপেক্ষা বাষ্পে শরীরের কোনও স্থান পুড়িয়া যাওয়া বেশী বিপজ্জনক,** কারণ উপরোক্ত সূত্র অনুযায়ী বাষ্পা

জলে রূপান্তরিত হইবার সময় তাপ মুক্ত করে।

খ। জল যখন আপনাআপনি বাষ্প হয় তখন **আবেষ্টনী হইতে বাষ্পের মধ্যস্থ সুপ্ত তাপ** সংগ্রহ করে, ফলে আবেষ্টনী শীতল হয়। যেমন মাটির কুঁজোর গায়ের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া জল বাহিরে আসিয়া বাষ্পীভূত হয়, এজন্য **কুঁজোর জল ধাতুর ঘড়ার মধ্যে রাখা জলের চেয়ে বেশী ঠাণ্ডা হয়।** নিম্নের পরীক্ষা হইতে বাষ্পীভবনের ফলে শৈত্য সৃষ্টির ব্যাপারটি সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইবে—

পরীক্ষা। টেবিলের উপর সামান্য কিছু জল ফেলিয়া ঐ জলের উপর একটি ছোট পাত্র বসাও। পাত্রে কিছু ঈথর (ether) (ইহা ক্লোরোফরমের ন্যায় এক প্রকার পদার্থ) ঢালিয়া উহার মধ্যে ফুটবল পাম্পের সাহায্যে রবার নলের মধ্য দিয়া বাতাস দিতে থাক (বাতাস দিলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়)। সমস্ত ঈথর বাষ্পীভূত হইয়া গেলে পাত্রটিকে টেবিলের উপর হইতে সরাইতে চেষ্টা কর—দেখিবে ঠাণ্ডায় জল জমিয়া গিয়া পাত্রের তলদেশ টেবিলের সহিত আঁটিয়া গিয়াছে।

চিত্র নং ১১১ : পাম্পের সাহায্যে ঈথরের ভিতর বাতাস দেওয়া হইতেছে

স্ফুটন (boiling) **ও বাষ্পীভবন** (evaporation)

স্ফুটন কাহাকে বলে? ইহার পূর্বে বাষ্পীভবনের বিষয়টি ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক। কাপড় রৌদ্রে বা বাতাসে মেলিয়া দিলে কিছুক্ষণের মধ্যে শুকাইয়া যায়। এখানে দুইটি ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়—

ক। কাপড় যত বেশী মেলিয়া দেওয়া যায় ততই উহা তাড়াতাড়ি শুখাইয়া যায়;

খ। রৌদ্র ও বাতাসের জোর যত বেশী হয় ততই কাপড় তাড়াতাড়ি শুখায়।

ইহা হইতে বুঝা যায়—

ক। **সিক্ত পদার্থের যত বেশী স্থান বাতাসের সংস্পর্শে** আসিবে ততই বাষ্পীভবন দ্রুত হইবে,

খ। উষ্ণতা বেশী হইলে এবং **ক্রমাগত নূতন বাতাস সিক্ত পদার্থের সংস্পর্শে** আসিলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়।

যেমন কালির কণিকাগুলি ব্লটিং কাগজের ভিতরের ছিদ্রগুলির মধ্যে শোষিত হয় তেমনি বাষ্পীভবনে জলের অণুগুলি বাতাসের অণুগুলির ফাঁকে ফাঁকে প্রবিষ্ট হইয়া যায়। সুতরাং ব্লটিং কাগজ বেশী ভিজিয়া গেলে যেমন মধ্যে মধ্যে পাল্টাইয়া দিতে হয় তেমনি ভিজা বস্তুর আশে-পাশের বাতাসও জলীয় বাষ্প শোষণ করিয়া বেশী সিক্ত হইয়া উঠিলে উহাকে সরাইয়া শুষ্ক বাতাস আনিয়া দিলে বাষ্পীভবন দ্রুত হয়। এইবার
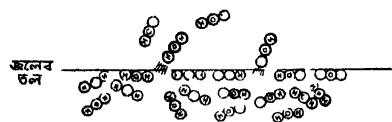
চিত্র নং ১১২ ; জলের বাষ্পীভবনে অণুগুলি জলের তল হইলে বায়ুমণ্ডলে চলিয়া আসিতেছে

বোধ হয় বুঝা যাইতেছে কেন **তপ্ত দুধকে প্রশস্ত পাত্রে ঢালিয়া বাতাস করিলে** তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা হয়।

তাহা হইলে দেখা যাইতেছে বাষ্পীভবন তরল পদার্থের উপরিতল (surface) হইতে ঘটে। ইহার সহিত স্ফুটনের পার্থক্য আছে।

৯১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষায় ফিরিয়া আসা যাক। এখানে মনে রাখিতে হইবে যে পাত্রে উত্তাপ দানের পর হইতেই বাষ্পীভবন চলিতেছিল। ইহার নানা দৃষ্টান্ত আমরা জানি। যে কোনও পাত্রে খানিকটা জল খোলা রাখিয়া দিলে বিনা উত্তাপে, স্বভাবিকভাবেই উহা কিছুদিন পরে অদৃশ্য হইয়া যায়। কিন্তু উত্তাপ দিতে থাকিলে পাত্রের জল যখন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায় পৌঁছে তখন হঠাৎ কোথা হইতে ইহার মধ্যে একটা আলোড়ন আসিয়া উপস্থিত হয়—আমরা বলি জল **ফুটিতেছে**। এই অবস্থায় শুধু জলের উপরিতলে

অর্থাৎ অনাবৃত অংশ মাত্রে নহে—উহার **সর্বত্র জল বাষ্পে পরিণত হইতে থাকে।** সুতরাং দেখা গেল—

ক। বাষ্পীভবন সকল উষ্ণতায়, শুধু **জলের উপরিতল হইতে ঘটে ;**

খ। স্ফুটন একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতায়, জলের সর্বস্থান হইতে ঘটে।

চিত্র নং ১১৭ A স্ফুটন—জলের সর্বত্র বাষ্প সৃষ্টি হইতেছে; B বাষ্পীভবন—কেবল জলের উপরিতলে বাষ্প সৃষ্টি হইতেছে

জলের স্ফুটন ও বাষ্পীভবন সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল তাহা সকল তরল পদার্থ সম্বন্ধেই সাধারণভাবে সত্য।

তাপ সঞ্চলন
(Transference of Heat)

চায়ের জন্য উনান হইতে এক কেটলি ফুটন্ত জল নামাইয়া পাথর আঁটা টেবিলের উপর রাখিয়া দেওয়া হইয়াছে। কাহারও অন্যমনস্কতার জন্য উহা ঐভাবেই থাকিয়া গেল। পরে দেখা গেল উহা ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। কি করিয়া হইল? বিষয়টি একটু তলাইয়া দেখা যাক :—
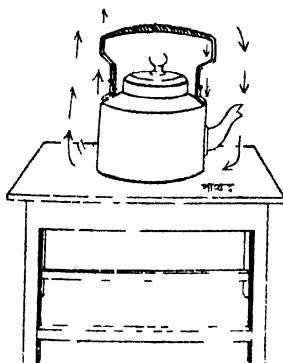
চিত্র নং ১১৪ : পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়ার তাপ হারাইয়া চায়ের কেটলি ঠাণ্ডা হইতেছে

ক। একটি উত্তপ্ত কেটলির নীচে টেবিলের উপর হাত দিয়া দেখ উহাও উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়াছে ;

খ। কিছু উপরে শূন্যে হাত রাখিয়া দেখ গরম বোধ হইবে ;

গ। পার্শ্বে কিছু দূরে হাত রাখিয়া দেখ—উত্তাপ অনুভব করিবে।

পরিবহন (convection)

টেবিলটি কি করিয়া গরম হইল ?

আমরা কল্পনা করিতে পারি—উত্তপ্ত কেটলির তলদেশ টেবিলের উপরিভাগের শীতল মার্বেলের অণুগুলির সংস্পর্শে আসিয়া উহাদের উত্তপ্ত করিয়া তুলিল।

কতক্ষণ এই তাপ সঞ্চলন চলিতে থাকিবে ?

যতক্ষণ না টেবিলের ও কেটলির উষ্ণতা সমান হইবে। কিন্তু আবার দেখ, টেবিলের উত্তপ্ত স্থান হইতে তাপ উহার শীতলতর অংশে একই প্রক্রিয়ায় সর্বত্র সঞ্চারিত হইতে থাকিবে যতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সকল অংশের উষ্ণতা টেবিলের উত্তপ্ত স্থানের (কেটলির নীচে) উষ্ণতার সহিত সমান না হয়। ইহাই **প্রধান প্রক্রিয়া** যাহার ফলে কেটলিটি শীতল হইতে থাকে। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম **পরিবহন**।

যখন সস্‌-প্যান্‌এ (sauce pan) জল দিয়া উনানে বসাইয়া দেই তখন কিছুক্ষণের মধ্যে উহার হাতলটি বেশ গরম হইয়া উঠে যদিও হাতলের সহিত অগ্নির সংস্পর্শ ঘটে নাই। ইহাও পরিবহন প্রক্রিয়ায় তাপের সঞ্চলন। পরিবহন প্রক্রিয়ায় তাপের সঞ্চলনের আরও নানা দৃষ্টান্ত আছে যাহা তোমরা নিজেরাই ভাবিয়া বাহির করিতে পারিবে। **ভাল পরিবাহকগুলি সবই প্রায় কঠিন পদার্থ**। কেন বলিতে পার কি ?

পরিবহন প্রক্রিয়ায় তাপ উত্তপ্ত পদার্থের অধিকতর উত্তপ্ত অণুগুলি হইতে কম উত্তপ্ত অণুগুলির মধ্যে **পরস্পর সংস্পর্শের দ্বারা** সঞ্চারিত হয় এবং এইভাবে তাপ বস্তুর সর্বত্র বিস্তৃত হইয়া পড়ে।

পরিচলন (convection)

এইবার ভাব—**কেটলির উপরে শূন্যে হাত রাখিয়া উত্তাপ অনুভূত হইয়াছিল কেন ?**

আমরা জানি উত্তপ্ত কেটলিটিকে বেষ্টন করিয়া বায়ুমণ্ডল রহিয়াছে। **কেটলির উপরিভাগের সংলগ্ন বায়ুস্তর** কেটলির সংস্পর্শে (পরিবহন প্রক্রিয়ায়) উত্তপ্ত হইয়া উঠিল—ফলে আয়তনে বৃদ্ধি পাইয়া ও

সেজন্য হালকা হইয়া উপরে উঠিয়া গেল। উপরের অপেক্ষাকৃত শীতল ও ভারী বায়ুস্তর কেটলির উপরিভাগে নামিয়া আসিল এবং পূর্বের ন্যায় উহার সংস্পর্শে উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিয়া গেল। এইভাবে একটা বায়ুস্রোত কেটলির চারিপার্শ্বে উপর হইতে নীচে ও নীচে হইতে উপরে ক্রমাগত ওঠানামা করিতে থাকে এবং এ ভাবেও কেটলিটি তাপ হারাইতে থাকে। এই প্রক্রিয়াকে তাপের **পরিচলন** বলে।

তাহা হইলে পরিচলন প্রক্রিয়ায় পদার্থের উত্তপ্ত অংশের অণুগুলি উহাদের নিজ নিজ স্থান ত্যাগ করিয়া অন্য স্থানে চলিয়া যায় এবং ঐ স্থানের শীতলতর অণুগুলি প্রথম স্থানে চলিয়া আসে—এইভাবে তাপ পদার্থটির সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। জল গরম করিলে বিশেষ করিয়া এই প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয়। প্রথমে তলদেশের জল উত্তপ্ত ও লঘু হইয়া উপরে উঠিয়া যায়, উপরের ঠাণ্ডা জল তখন নীচে নামিয়া আসিয়া ঐ স্থান পূরণ করে। এইভাবে কিছুক্ষণের মধ্যে জলের মধ্যে সমগ্র স্থান উত্তপ্ত হইয়া উঠে। জল নিকৃষ্ট পরিবাহক বলিয়া পরিবহন অপেক্ষা পরিচলন প্রক্রিয়ার সাহায্যেই জলের মধ্যে এক অংশ হইতে অন্য অংশে তাপ সঞ্চালিত হয়।

বলা বাহুল্য, **পরিচলন প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চলন শুধু তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের ভিতরই সম্ভব** কারণ কঠিন পদার্থের অণুগুলি এক স্থান হইতে অন্যস্থানে চলাফেরা করিতে পারে না। নিম্নের পরীক্ষা দুইটি এই পরিচলন প্রক্রিয়ার স্বরূপ বুঝিতে সাহায্য করিবে—

চিত্র নং ১১৫ : জল কুপরিবাহ বলিয়া উপরের অংশ ফুটিতে থাকিলেও তলায় বরফ গলে না

পরীক্ষা : একটি পাতলা টেস্ট-টিউবএর তলায় ছোট একখণ্ড বরফ রাখিয়া একটি স্প্রিং দিয়া বা একটুকরা ইট বাঁধিয়া চাপিয়া রাখ। টেস্ট-টিউবটিকে জল দিয়া প্রায় পূর্ণ কর এবং একটি **ছোট অগ্নি-শিখায় উহার উপরের অংশ** সাবধানে

উত্তপ্ত কর। দেখিবে উপরিভাগে জল ফুটিতে আরম্ভ করিলেও টেষ্ট-টিবের তলায় বরফটুকু তখনও গলিতেছে না, অর্থাৎ একটি আশ্চর্য ঘটনা—**বরফ ও জল একত্র ফোটানো সম্ভব হইয়াছে।**
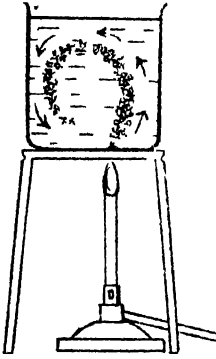
চিত্র নং ১১৬ : জলের মধ্যে পরিচলন স্রোত দেখাইবার পরীক্ষা

পরীক্ষা : একটি পাত্র জলে পূর্ণ কর এবং খুব সাবধানে ২।৩টি পটাশ পারমাঙ্গানেটের (patassium permanganate) দানা জলের তলদেশে ফেলিয়া দাও (যেন জলের বেশী স্থানে লাল রং ছড়াইয়া না যায়)। এখন ছোট একটি শিখা দিয়া (মোমবাতি হইলেও চলিবে) দানাগুলির ঠিক নীচে, কিন্তু একটু তফাতে, উত্তাপ দাও। দেখিবে নীচের (রঙীন) জল উত্তপ্ত হইয়া উপরে উঠিতেছে এবং উপরের (বর্ণহীন) ভারী জল নীচে নামিয়া আসিতেছে ও উত্তপ্ত হইয়া আবার উপরে উঠিতেছে। এই ভাবে **পরিচলন স্রোতটি** সত্য সত্যই চোখে দেখা যাইতে পারে এবং উহা যে কাল্পনিক ব্যাপার নয় বুঝা যাইবে।

এইবার সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর আলোচনায় ফিরিয়া আসা যাক। পূর্বে আমরা এই বায়ুপ্রবাহকে পদার্থের তাপে আয়তন বৃদ্ধি-জনিত ব্যাপার হিসাবে বিবেচনা করিয়াছিলাম। এখন উহার সম্পূর্ণ ব্যাখ্যা পাওয়া যাইবে। **বস্তুত সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ু একপ্রকার পরিচলন স্রোত।** এই প্রসঙ্গে **বায়ু সঞ্চলনের** ব্যাপারটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক :—

বায়ু-সঞ্চলন (ventilation)--পরীক্ষা : চিত্রের ন্যায় একটি কাঠের বাক্স লইয়া সামনের দিকে একটি কাচের দরজা বসাইয়া লও যেন দরজাটিকে সহজেই নড়াইয়া এপাশ ওপাশ করা যায়। বাক্সটির উপরে মাঝামাঝি আন্দাজ ১॥ ইঞ্চি ব্যাস পরিমিত দুইটি ছিদ্র রাখ এবং উহার মধ্যে দুইটি কাচের চিমনি আঁটিয়া বসাইয়া দাও। এখন একটি মোমবাতির ছোট টুকরা জ্বালাইয়া একটি চিমনির ঠিক নীচে রাখিয়া সামনের দরজা টানিয়া বন্ধ

করিয়া দাও। এইবার একটি ধূপকাঠি জ্বালাইয়া নিভাইয়া দাও এবং ধূমায়িত কাঠিটি পর পর দুইটি চিমনির মুখে ধরিয়া বায়ুপ্রবাহের গতি নিরীক্ষণ কর। দেখিবে প্রথম চিমনির মুখে বায়ুর গতি বাহিরের দিকে ও দ্বিতীয় চিমনির মুখে বায়ুর গতি ভিতরের দিকে। (তীর চিহ্ন দিয়া বায়ুপ্রবাহের গতি দেখানো হইয়াছে)। এখন তুলনা করিয়া বুঝিতে চেষ্টা কর—
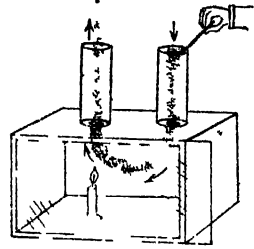
চিত্র নং ১১৭ : বায়ু সঞ্চলনের পরীক্ষা—ধূপের ধোঁয়ার গতিপথ লক্ষ্য কর : বাতিটি ডানপার্শ্বে সরাইয়া দিলে কি হইবে বল

ক। বাক্সটির মধ্যে বাতিটির আশেপাশের স্থানের অবস্থা পৃথিবীপৃষ্ঠে সূর্যের দ্বারা উত্তপ্ত অঞ্চলের অনুরূপ ;

খ। দ্বিতীয় চিমনির নীচের স্থান পৃথিবীপৃষ্ঠে যেখানে সূর্যের উত্তাপ অপেক্ষাকৃত ক্ষীণভাবে পড়িয়াছে—এরূপ অঞ্চল।

সুতরাং এরূপ অবস্থায় পৃথিবীপৃষ্ঠে বায়ু-প্রবাহ কিরূপ হইবে—তাহা বাক্সের মধ্যে বায়ু-সঞ্চলনের দৃষ্টান্ত হইতে বোঝা যাইবে।
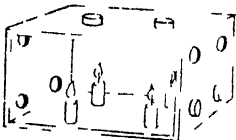
চিত্র নং ১১৮ : ঘরের মধ্যে বায়ু সঞ্চলনের পরীক্ষা—বাতিগুলিকে নানাভাবে জ্বালাইয়া ও বাক্সের ফুটাগুলি নানাভাবে খুলিয়া, বন্ধ করিয়া এই পরীক্ষা করা যায়

১১৮ নং চিত্রের ন্যায় বাক্সটিতে উপরে ও পাশে ১০টি ফুটা করিয়া ছিপি দিয়া উহাদের পর্যায়ক্রমে নানাভাবে খুলিয়া ও বন্ধ করিয়া (১) পূর্বের পদ্ধতিতে ও (২)
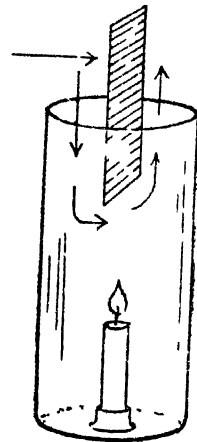
চিত্র নং ১১৯ : বায়ু সঞ্চলনের পরীক্ষা—পিচবোর্ডের পর্দাটি চিমনির মধ্যে (১) এপাশ ওপাশ করিয়া, (২) একেবারে সরাইয়া ফেলিয়া—ধূপের ধোঁয়ার গতি ও বাতিটি জ্বলিবার ভঙ্গী লক্ষ্য কর

বাতিগুলির জ্বলিবার ভঙ্গী (জোর বা মৃদু) পরীক্ষা করিয়া দেখ। ইহা হইতে আমাদের বসতবাড়ী বা ঘরের মধ্যে বায়ু-সঞ্চলনের অবস্থা অনেকটা অনুমান করা যাইবে।

শ্বাসক্রিয়ার ফলে ঘরের মধ্যে উষ্ণতা সাধারণত বাহিরের উষ্ণতা অপেক্ষা অধিক, তা ছাড়া নিঃশ্বসিত বায়ুতে জলীয় বাষ্প আছে (জলীয় বাষ্প বায়ুর অপেক্ষা হালকা)। এই উভয় কারণে ঘরের বায়ু হালকা হয় এবং উপরে উঠিয়া যায়। ছাদের নীচে **ভেন্টিলেটর** (ventilator) থাকিলে ঐ পথে উত্তপ্ত বায়ু বাহির হইয়া যায় এবং অপেক্ষাকৃত শীতল বায়ু বাহির হইতে বিপরীত দিকের ভেন্টিলেটর বা জানালা দরজা প্রভৃতির পথে ভিতরে প্রবেশ করে।
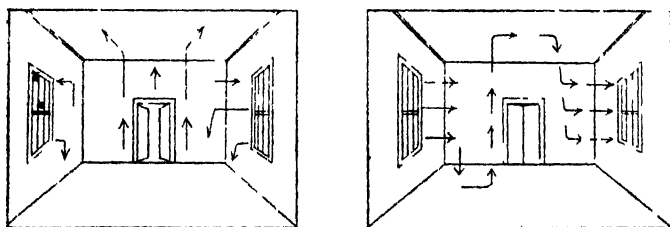
চিত্র নং ১২০. (১) দরজা খোলা রাখিয়া, ভেন্টিলেটর সহ, (২) দরজা বন্ধ রাখিয়া, ভেন্টিলেটর বিহীন ঘরে বায়ু সঞ্চলন যে ভাবে হয়

ভেন্টিলেটর না থাকিলে বা সামনা-সামনি জানালা থাকিলে—

ক। একটি জানালা দিয়া বাতাস ঢুকিয়া অপরটি দিয়া বাহিরে যাইতে পারে, অথবা,

খ। দুইটি জানালারই নীচের অংশ দিয়া বাতাস প্রবেশ করিয়া উপরের অংশ দিয়া বাহির হইয়া যাইতে পারে (চিত্র দেখ)।

ইহা নির্ভর করিবে ঘরের মধ্যে উষ্ণতা কিরূপভাবে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে অর্থাৎ কোথায় কম, কোথায় বেশী এবং কতখানি স্থানে ইত্যাদির উপর।

১১৮ নং চিত্রে মোমবাতির যে পরীক্ষা দেখানো হইয়াছে তাহার সাহায্যে ব্যাপারটি বুঝিতে সুবিধা হইবে।

গরম কেটলিটি এতক্ষণে বোধ হয় ঠাণ্ডা হইয়া গিয়াছে। আমরা উহার আলোচনা হইতে একটু দূরে চলিয়া গিয়াছিলাম, আবার ফিরিয়া আসা যাক। পরিবহন ও পরিচলন—এই দুই প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চলনের ব্যাপার আমরা বুঝিতে পারিলাম।

এইবার তৃতীয় প্রশ্ন—**কেটলির পার্শ্বে হাত রাখিলে উত্তাপ অনুভূত হইয়াছিল কেন?**

বিকিরণ (radiation)

পরিচলন প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত উত্তাপ সাধারণত উপরের দিকে অনুভূত হইবে কারণ পরিচলন প্রবাহ ঊর্ধ্বমুখী। তাহা হইলে আর একটি দৃষ্টান্তের কথা স্মরণ কর: কোটি কোটি মাইল দূরে, আকাশের সীমাহীন গভীরতা হইতে সূর্যের উত্তাপ পৃথিবীপৃষ্ঠে আসিতেছে কেমন করিয়া? পরিবহন, পরিচলন—কোনও প্রক্রিয়াই এখানে সম্ভব নহে, কারণ মধ্যে কোনও স্থূল পদার্থের সংযোগ নাই। কেটলির আশেপাশে (উপরের দিক ছাড়াও) যে উত্তাপ অনুভূত হয় তাহার সঞ্চলনও অন্য এক প্রক্রিয়ায়। ইহার নাম **বিকিরণ**। এই বিকিরণে কোনও মাধ্যমের (স্থূল বস্তুর) প্রয়োজন নাই, যেমন প্রয়োজন নাই **আলোকের বিকিরণে**।
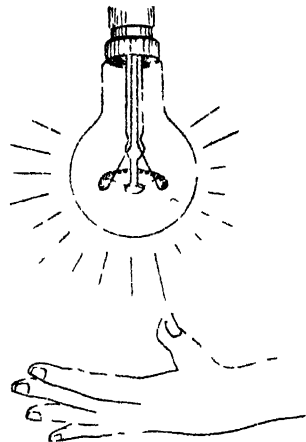
চিত্র নং ১২১. বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তাপ হাতের তালুতে আসিয়া পৌঁছে

পরীক্ষা: ঘরের ঝুলন্ত ইলেকট্রিক আলোর [illegible] ১০০ ওয়াট শক্তির একটি ইলেকট্রিক বাল্ব ফিট কর এবং টুলের উপর দাঁড়াইয়া বাল্বের আন্দাজ ৬" নীচে তালু উপরের দিকে করিয়া হাত রাখ। এইবার কাহাকেও আলোর সুইচটি টিপিতে বল। লক্ষ্য কর—আলো জ্বলিবার সঙ্গে সঙ্গে তুমি হাতের তালুতে কিছু উত্তাপ অনুভব করিবে।

এই উত্তাপ কি করিয়া বাহিত হইল? পরিচলন প্রক্রিয়া হইলে প্রথম, উত্তাপ নীচের দিকে আসিত না; দ্বিতীয়, এত শীঘ্র সঞ্চালিত হইত না। পরিবহনের প্রশ্নও উঠে না কারণ বায়ু খুব নিকৃষ্ট পরিবাহক। এখানে উত্তাপ ঐ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় তোমার হাতে পৌঁছিয়াছে। ঠিক আলোকের মতই উত্তাপ-তরঙ্গ বিকিরণ প্রক্রিয়ায় চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। লেন্সের দাহিকা শক্তির পরীক্ষাটির কথা মনে কর (৫৩ পৃষ্ঠা দেখ)। এখানে প্রকৃতপক্ষে সূর্যের আলোক-রশ্মি নয়—**উত্তাপ-তরঙ্গই লেন্সের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া দিয়াশলাইএর কাঠি জ্বালাইয়াছিল** (৭৩ নং চিত্র দেখ)।

উত্তপ্ত কেটলি হইতে তাপ সঞ্চলনের প্রসঙ্গে পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ—এই তিনটি প্রক্রিয়ার স্বরূপ সম্বন্ধে কিছু ধারণা পাওয়া গেল। এইবার এই প্রক্রিয়াগুলি সম্বন্ধে একটু বিশেষভাবে আলোচনা করা যাক :—

সুপরিবাহী ও অপরিবাহী পদার্থ (good and bad conductors)

সস্-প্যান (sauce pan) উনানে বসাইলে কিছুক্ষণ পরে হাতলটি এত গরম হইয়া উঠে যে ধরা যায় না, কিন্তু একটি কাঠের এক প্রান্তে আগুন ধরাইলে অপর প্রান্ত স্বচ্ছন্দে ধরিয়া রাখা যায়। ইহার কারণ কি?

ইহার কারণ এলুমিনিয়ম উৎকৃষ্ট পরিবাহক, কিন্তু কাঠ নিকৃষ্ট পরিবাহক। **সকল ধাতুই উৎকৃষ্ট পরিবাহক,** আর **কাচ, পশম, বাতাস, বেত, এস্‌বেষ্টস** (asbestos)—ইহারা **নিকৃষ্ট পরিবাহক**। এই জন্যই কেটলির হাতল বেতে জড়ানো থাকে, চায়ের ছাঁকনীর কাঠের হাতল হয়; প্রকৃতিতে দেখি শীতপ্রধান দেশের জন্তু-জানোয়ারের গায়ে লোম হয়, আমরা শীতের দিনে পশমের জামা ব্যবহার করি। পশম যে মন্দ পরিবাহক তাহার প্রধান কারণ উহার আঁশের ফাঁকে ফাঁকে প্রচুর বাতাস আবদ্ধ থাকে এবং বাতাস কুপরিবাহী পদার্থ। এই কারণেই **একটি মোটা** তুলা বা পশমের জামার অপেক্ষা ঐ পদার্থেরই **অর্ধেক পুরু দুইটি** জামা অধিক তাপ রোধকারী, কারণ দুইটি জামার স্তরের মধ্যে অতিরিক্ত আর একটি কুপরিবাহী বাতাসের স্তর যুক্ত হইয়া তাপ

সুপরিবাহী ও কুপরিবাহী পদার্থের প্রয়োজনীয়তা

পরিবহনে বাধা দেয়। অতএব তাপের সঞ্চলন যেমন আমাদের জীবনে নানা প্রয়োজনে লাগে তেমনি আবার প্রয়োজনে লাগে তাপের সঞ্চলন রোধ। সেইজন্য কি কি অবস্থায় উত্তম তাপ সঞ্চলন হয় যেমন জানিতে হইবে, কি করিয়া সঞ্চলন রোধ করিতে হয় তাহাও জানিতে হইবে।

এখানে কয়েকটি সুপরিবাহী ও কয়েকটি কুপরিবাহী পদার্থ সম্পর্কে পরীক্ষা বর্ণনা করা হইল—

পরীক্ষা। প্রায় ৮" লম্বা একটি ধাতুর নল লও ও সমান মাপের একটি মসৃণ কাঠের দণ্ড লইয়া একটি প্রান্তের খানিকটা চাঁচিয়া কিছু সরু করিয়া কাচের নলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও যেন সংযোগস্থলটি বেশ সমান হইয়া জুড়িয়া থাকে। এখন সংযোগস্থলে একটি সাদা কাগজ জড়াও এবং কাগজের উপর একটি অগ্নিশিখাকে তাড়াতাড়ি এপাশ ওপাশ করিয়া কাগজটিকে সংযোগস্থলের উভয় পার্শ্বে উত্তপ্ত কর। দেখিবে—ধাতুর দিকের অংশ কাগজটি পোড়ে নাই কিন্তু অপর দিক পুড়িয়া গিয়াছে। কেন, ভাবিয়া বল। ইহা সুপরিবাহী ও কুপরিবাহী পদার্থের মাধ্যমে তাপের পরিবহনের ব্যাপার।
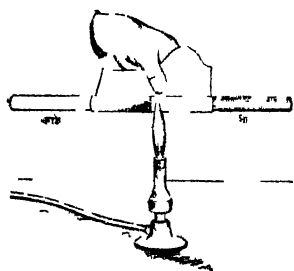
চিত্র নং ১২২ : কাঠ তাপের পরিবহনে বাধা দেয় বলিয়া ঐ পাশে পরের জড়ানো কাগজ পুড়িয়া গিয়াছে, ধাতু সুপরিবাহী বলিয়া ওপরের কাগজ পোড়ে নাই

ধাতুগুলি সুপরিবাহী বলিয়া **সকল ধাতুই যে সমান পরিবাহক তাহা নহে।** পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক—

পরীক্ষা : আন্দাজ ¼" ব্যাসার্ধ-বিশিষ্ট ও সমান দীর্ঘ কয়েকটি ধাতুর দণ্ড সংগ্রহ কর (ধর এলুমিনিয়ম, তামা, লোহা, দস্তা ও পিতল)। কিছু মোম গলাইয়া ইহাদের গায়ে পাতলা একটি আবরণ দাও এবং চিত্রের ন্যায় সাবধানে একটি আধারের (stand) উপর স্থাপন করিয়া প্রান্তগুলি একত্র মিলিত কর এবং সংযোগস্থলে একটি নাট (nut) ও বোল্ট (bolt) দিয়া চাপা দাও যাহাতে প্রান্তগুলি সরিয়া না যায়। এইবার সংযোগস্থলে
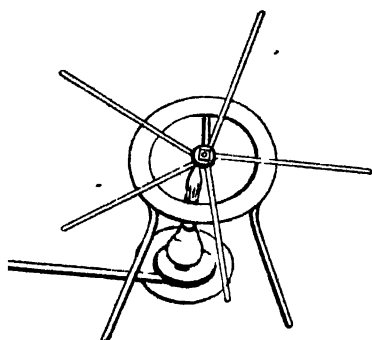
চিত্র নং ১২৩ : বিভিন্ন ধাতুর পরিবহন-ক্ষমতার পরীক্ষা—ঠিক সংযোগস্থলে দণ্ডগুলি যেন সমানভাবে তাপ পায় লক্ষ্য রাখিতে হইবে

সাবধানে উত্তাপ প্রয়োগ কর যেন সব কয়টি দণ্ডের প্রান্তভাগ সমান ভাবে উত্তাপ পায়। এইবার লক্ষ্য কর—**কোন দণ্ডে, কত তাড়াতাড়ি এবং কতদূর পর্যন্ত মোম গলিয়াছে** এবং ইহা হইতে ধাতুগুলিকে তাহাদের পরিবহন-ক্ষমতা অনুযায়ী সাজাও।

উত্তম ও নিকৃষ্ট বিকিরক (good and bad radiators)

এইরূপ বিকিরণ সম্বন্ধেও দেখা যায় সকল পদার্থের বিকিরণ ক্ষমতা সমান নহে—

পরীক্ষা : একটি গোল পরিষ্কার টিনের পার্শ্বদেশ উপর হইতে নীচে পর্যন্ত খাড়া ভাবে, একটু ফাঁক করিয়া চিরিয়া দুইটি সমানভাগে ভাগ কর। একটি অংশের ভিতরটি কেরোসিন ল্যাম্পের কালি দিয়া আবৃত কর, অপর অংশটি যেমন চকচকে ছিল তেমনি থাক। এইবার টিনটির ঠিক মধ্যস্থলে একটি ছোট মোমবাতি জ্বালাইয়া দাও এবং বাহিরে হাত রাখিয়া অনুভব কর কোন পার্শ্বটি বেশী উত্তপ্ত হইয়াছে। যদি পূর্ব হইতে প্রত্যেক অংশে বাহিরের গায়ে একটি দিয়াশলাই এর কাঠি মোম দিয়া আটকাইয়া রাখা যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে **কাল অংশের কাঠিটির মোম প্রথমে** গলিয়া কাঠিটি খসিয়া পড়িয়াছে।
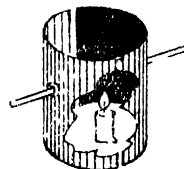
চিত্র নং ১২৪ : তাপ শোষণ ও বিকিরণের পরীক্ষা—টিনটির কাল, অনুজ্জ্বল পার্শ্ব অপর পার্শ্ব অপেক্ষা বেশী উত্তপ্ত হইবে

এখানে বাতি হইতে নির্গত উত্তাপ-তরঙ্গ টিনের ভিতরের দিকে চকচকে অংশ অপেক্ষা কাল অংশে **বেশী শোষিত হইয়াছে** এবং পরে

বাহিরের দিক দিয়া বিকীর্ণ হইয়াছেও বেশী। এই কারণে উহার উষ্ণতাও বেশী হইয়াছে, (দিয়াশলাই ইহার গাত্র হইতে প্রথমে খসিয়া পড়িয়াছিল) আবার উহা হইতে বিকিরণও বেশী হইয়াছে বলিয়া বাহিরে হাত রাখিয়া বেশী উত্তাপ অনুভূত হইয়াছিল।

সাধারণতঃ **যে সকল বস্তু ভাল শোষক তাহারাই ভাল বিকিরক হয়** এবং বিপরীতভাবে, মন্দ শোষক হইলে মন্দ বিকিরক হয়। আবার **স্থলবায়ু** ও **সমুদ্রবায়ুর** প্রসঙ্গ স্মরণ করিয়া দেখ—পরিচলন প্রক্রিয়া ব্যতীত ইহাদের সৃষ্টির পিছনে যে আর একটি নীতি কাজ করিতেছে তাহা এই শোষণ-বিকিরণের ব্যাপার। জল ধীরে ধীরে তাপ শোষণ করিয়া ধীরে ধীরে বিকিরণ করে, মাটি দ্রুত তাপ শোষণ করিয়া যেমন তাড়াতাড়ি উত্তপ্ত হয় তেমনি দ্রুত তাপ বিকিরণ করিয়া দ্রুত ঠাণ্ডা হইয়াও যায়। ধাতুগুলির ধর্মও এই মাটির ধর্মের অনুরূপ।

আলোক ও উত্তাপের তুলনা

আলোকের সাথে উত্তাপ-তরঙ্গও একটি উত্তল লেন্সের মধ্য দিয়া কেন্দ্রীভূত হইয়া দিয়াশলাইয়ের কাঠি জ্বালাইয়া দেয়—তাহা দেখা হইয়াছে। সাধারণভাবে বলা যায়, **বিকীর্ণ উত্তাপ** ঠিক আলোকের মত কোনও বস্তুর উপর পড়িলে হইলে—

ক। কিছু অংশ উহা ভেদ করিয়া যায় (বিশেষ করিয়া কাচ)

খ। কিছু অংশ উহাতে শোষিত হয়, (সকল প্রকার বস্তু, বিশেষ করিয়া কাল, অনুজ্জ্বল ধরনের পদার্থ)

গ। কিছু অংশ উহা হইতে প্রতিফলিত হয় (বিশেষ করিয়া আরশির ন্যায় চকচকে মসৃণ পদার্থ)।

চিত্র নং ২৫ তাপরশ্মি আয়নায় প্রতিফলিত হইয়া ফোকসে কেন্দ্রীভূত হইয়াছে

তোমরা উত্তল লেন্সের দাহিকা শক্তির পরীক্ষায় (২৩ নং চিত্র দেখ) যদি লেন্স ও ফোকসের মধ্যে একটি আয়না রাখিয়া আন্দাজ করিয়া

চিত্র নং ১২৬ : থার্মফ্লাস্ক ও উহার লম্বচ্ছেদ ; A—কাপ, B—ছিপি, C—রূপার প্রলেপ দেওয়া গাত্র, D—ধাতুর আধার, E—দুই দেওয়াল বিশিষ্ট ফ্লাস্ক, F—নড়াচড়া রোধ করিবার প্যাকিং, G—বায়ুশূন্য স্থান, H—ছিপির ঠেস (support)

প্রতিফলিত উত্তাপ তরঙ্গগুলির ফোকসটি খুঁজিয়া বাহির কর এবং ঐখানে পূর্বের ন্যায় একটি দিয়াশলাই এর কাঠি ধর উহা এভাবেও জ্বলিয়া উঠিবে।

পরিবহন, পরিচলন ও বিকিরণ প্রক্রিয়াগুলির নীতি কৌশলে প্রয়োগ করিয়া তাপ-নিরোধক একটি বিখ্যাত পাত্র উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহার নাম **থার্মফ্লাস্ক** (thermos flask) ; ইহার সহিত তোমাদের সকলেরই বোধ হয় পরিচয় আছে।

অনুশীলনী (I)

১। গৃহের পরিবেশে আমরা (ক) সূর্য, (খ) যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও (গ) বিদ্যুৎ—তাপের এই তিনটি উৎসের সাহায্যে যে যে কাজ করি তাহাদের একটি লিষ্ট (list) তৈয়ারি কর। কোনও কাজে একাধিক উৎসজাত তাপ প্রযুক্ত হইলে তাহাও বল।

২। (ক) গৃহস্থালীতে, (খ) শিল্পজগতে ও (গ) প্রকৃতিতে—তাপের প্রভাবে (১) প্রসারণ-সংকোচন, (২) অবস্থা-পরিবর্তন—প্রত্যেকের দুইটি করিয়া উদাহরণ দাও।

৩। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রগুলিতে সূর্যই যে প্রকাশিত তাপশক্তির মূল উৎস—কার্যকারণ সূত্র ধরিয়া বুঝাইতে চেষ্টা কর :—

ক। দেহের স্বাভাবিক তাপ,

খ। রেলগাড়ী চলিয়া যাইবার পর রেলের লাইনে উৎপন্ন তাপ,

গ। জলবিদ্যুৎ-জাত তাপ ;

ঘ। সাইকেল পাম্প কিছুক্ষণ চালাইবার পর উহার মধ্যে সৃষ্ট তাপ,

৪। শারীর থার্মমিটারের রন্ধ্রে একস্থানে যে সংকোচনটি (constriction) রহিয়াছে উহা না থাকিলে রোগীর গায়ের উষ্ণতা দেখিতে কি ভুল হওয়ার সম্ভাবনা থাকিত বুঝাইয়া বল। সংকোচনটি কুণ্ডের কাছাকাছি না দূরে থাকা উচিত?

৫। ঈথরের সাহায্যে জল জমাইবার যে পরীক্ষাটি পুস্তকে বর্ণনা করা হইয়াছে উহাতে কাঠের টেবিলের পরিবর্তে ধাতুর টেবিল ব্যবহার করিলে পরীক্ষাটি সুসম্পন্ন করা কঠিন হইত কেন?

৬। জলের বিকিরণ ধর্ম স্থলে এবং স্থলের বিকিরক ধর্ম জলে সঞ্চারিত হইলে সমুদ্রবায়ু ও স্থলবায়ুর প্রবাহে কি তারতম্য ঘটিত বুঝাইয়া বল। এই বায়ুপ্রবাহের ব্যাপারে তাপ সঞ্চলনের যে তিনটি প্রক্রিয়ার কথা পড়িয়াছ উহারা কোথায় কি ভাবে কাজ করিতেছে বুঝাইয়া বল।

৭। যে যে অবস্থায় তাপ প্রয়োগ সত্ত্বেও উষ্ণতা বৃদ্ধি পায় না ঐগুলি কারণসহ বর্ণনা কর।

৮। নিম্নলিখিত বস্তু বা বিষয়গুলি আমাদের ব্যবহারিক জীবনে কোথায়, কি প্রয়োজনে লাগে দৃষ্টান্তসহ বুঝাইয়া বল:—

ক। উত্তম পরিবাহক, খ। নিকৃষ্ট পরিবাহক, গ। উত্তম বিকিরক, ঘ। নিকৃষ্ট বিকিরক, ঙ। তরল পদার্থে পরিচলন, চ। তাপে গ্যাসের প্রসারণ, ছ। অবিশুদ্ধ পদার্থের নিম্নতর হিমাঙ্ক।

৯। 4 সেঃ উষ্ণতায় জলের গুরুত্ব (density) সর্বাপেক্ষা বেশী হয়। শীতমণ্ডলে জলের নীচে বাসকারী প্রাণীদের ইহাতে কি সুবিধা হইবে বুঝাইয়া বল। (জল 0° সেঃ উষ্ণতায় বরফ হয়)।

১০। থার্মোমিটর সম্পর্কে নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির সংক্ষেপে উত্তর দাও:—

ক। থার্মোমিটরে পারদের পরিবর্তে জল ব্যবহার করিলে কি অসুবিধা হইত?

খ। শারীর থার্মোমিটর ব্যবহারের পূর্বে "ঝাড়িয়া" লইতে হয়, কিন্তু ল্যাবরেটরীর থার্মোমিটর ঐরূপ ঝাড়িবার প্রয়োজন নাই কেন?

গ। একটি থার্মোমিটরের সব কিছু ঠিক রাখিয়া যদি উহার রন্ধ্রের ব্যাসার্ধ কোনও প্রকারে বড় করিয়া দেওয়া হয় তাহা হইলে উহার পাঠ (reading) কি ঠিক থাকিবে? কেন?

ঘ। লঘিষ্ঠ ও গরিষ্ঠ থার্মোমিটরে কোহলকে প্রসারক তরল ও পারদকে সূচক (index) তরল হিসাবে ব্যবহার করা হয় কেন?

অনুশীলনী (II)

HE ১। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কোনগুলি সত্য নহে বল:—

ক। সাধারণত গ্যাসীয় পদার্থের প্রসারণশীলতা তরল পদার্থের অপেক্ষা বেশী।

খ। পরিচলন বস্তুর সম্পর্ক ব্যতিরেকে ঘটিয়া থাকে।

গ। ছাতার কাপড় সাদা হইলে ইহার তাপ-প্রতিরোধক ক্ষমতা অধিক হইত।

ঘ। যে সকল বস্তু উত্তম তাপ-শোষক তাহারা নিকৃষ্ট বিকিরক।

ঙ। দুইটি বস্তুর মধ্যে যাহার তাপ বেশী তাহার উষ্ণতাও বেশী।

চ। জল ত্বকে শোষিত হয় বলিয়া ভিজা কাপড় ঠাণ্ডা লাগে।

ছ। অগ্নিকাণ্ডের সময় পার্শ্বে যে উত্তাপ অনুভব করা যায় তাহা বিকিরণ প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত।

জ। ঘরে ভেন্টিলেটর না থাকলে বায়ু-সঞ্চলন হইতে পারে না।

২। প্রদত্ত তিনটি শব্দ বা বাক্যাংশ হইতে একটি বাছিয়া লইয়া নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলি শুদ্ধভাবে পূরণ কর :—

ক। হাত দিয়া স্পর্শ করিলে শীতকালে কাঠ অপেক্ষা লোহা বেশী ঠাণ্ডা মনে হয়, কারণ—

(i) লোহা শীতে বেশী ঠাণ্ডা হয়।

(ii) ধাতুর তাপ পরিবহন ক্ষমতা বেশী।

(iii) লোহা মসৃণ পদার্থ বলিয়া হাতের অধিক স্থান স্পর্শ করে।

খ। থার্মমিটারে পারদ ব্যবহার করা হয়, কারণ—

(i) পারদ সহজে উত্তপ্ত হয়।

(ii) পারদ ভারী পদার্থ।

(iii) পারদের প্রসারণশীলতা সকল তরল পদার্থ হইতে অধিক।

গ। (i) পরিবহন
(ii) পরিচলন
(iii) বিকিরণ
} প্রণালীতে তাপ শুধু ঊর্ধ্বদিকে সঞ্চালিত হয়।

ঘ। শীতকালে পশমের কাপড় ব্যবহার করা হয়, কারণ—

(i) পশমের কাপড় গরম।

(ii) পশম তাপ-অপরিবাহী পদার্থ।

(iii) পশমের কাপড় পুরু ও ভারী।

ঙ। ১০০° সেঃ উষ্ণতার পর জলে তাপ প্রয়োগ করিলেও উহার উষ্ণতা বাড়ে না কারণ—

(i) জল আর তাপ গ্রহণ করতে পারে না।

(ii) তাপ জলের বাষ্পীভবনে ব্যয়িত হয়।

(iii) জলের স্ফুটনাঙ্ক ১০০°।

৩। নিম্নে বামদিকের সারিতে কয়েকটি বস্তু বা বিষয়ের নাম ও ডানদিকের সারিতে উহাদের সহিত বৈজ্ঞানিক সম্পর্কযুক্ত কতকগুলি বস্তু বা বিষয়ের নাম এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। ডানদিকের সারির বস্তু বা বিষয়গুলি নম্বর অনুযায়ী বামদিকের সারির সহিত শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

(১) বাষ্পীভবন	(১) হিমাঙ্কের নিম্নগমন
(২) পারদ	(২) তাপের পরিবহন

(৩) লবণ-যুক্ত বরফ
(৪) সমুদ্র বায়ু
(৫) জল
(৬) ভ্যাকুয়ম
(৭) উষ্ণতার প্রভেদ
(৮) ৩২° ফা:
(৯) সিক্ত বাতাস
(১০) তাপের পরিচলন

(৩) নিকৃষ্ট পরিবাহক
(৪) শৈত্য (cooling)
(৫) মন্দ বাষ্পীভবন
(৬) ঊর্ধ্বগামী
(৭) উত্তম পরিবাহক
(৮) জলের হিমাঙ্ক
(৯) তাপের বিকিরণ
(১০) দিবাভাগ

চতুর্থ অধ্যায়

রাসায়নিক ক্রিয়া

অম্ল, ক্ষার ও লবণ

তোমরা পূর্বের শ্রেণীতে **রাসায়নিক ক্রিয়া** কাহাকে বলে শিখিযাছ। এই সম্পর্কে **মৌলিক** ও **যৌগিক** পদার্থের সহিতও পরিচয় হইয়াছে। মৌলিক পদার্থগুলি দুইটি প্রধান ভাগে পড়ে, ধাতু ও অধাতু। স্বর্ণ, লৌহ, তামা, দস্তা, পারদ প্রভৃতি ধাতু। আর কয়লা, গন্ধক, ফসফরস, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন, ক্লোরিণ প্রভৃতি পদার্থ হইল অধাতু। রাসায়নিক ক্রিয়াগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত এবং জীবনে সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় হইল—**দহন**।

যে কোনও বস্তুর সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগ ঘটিলে তাহাকে দহন বলে এবং যে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হয তাহাদের শ্রেণী হিসাবে **অক্সাইড** বলে। সুতরাং ধাতুগুলির ক্ষেত্রে যেমন—লৌহ-অক্সাইড, (iron oxide বা ferrous oxide), তাম্র-অক্সাইড (copper oxide), দস্তা-অক্সাইড (zinc oxide) প্রভৃতি, অন্যদিকে তেমনি গন্ধক-অক্সাইড (sulphur di-oxide, di-অর্থাৎ দুই, কারণ ইহাতে দুইটি অক্সিজেনের পরমাণু আছে) অঙ্গার-অক্সাইড (carbon-di-oxide) ইত্যাদি। ধাতুর অক্সাইডগুলিকে শ্রেণীগত ভাবে **ক্ষারধর্মী অক্সাইড** (basic oxide) এবং অধাতুর অক্সাইডগুলিকে **অম্লধর্মী অক্সাইড** (acidic oxide) বলে। ইহার কারণ প্রথম শ্রেণীর অক্সাইডগুলির সহিত জল মিশাইলে **ক্ষার** (base) প্রস্তুত হয় এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর অক্সাইডগুলির সহিত জলের ক্রিয়া ঘটিলে **অম্ল** (acid) প্রস্তুত হয়। খুব পরিচিত দুইটি দৃষ্টান্ত দিতেছি—

ক্ষারধর্মী অক্সাইড—ক্যালসিয়ম (calcium) বলিয়া একটি ধাতু আছে তোমরা শুনিয়া থাকিবে। খাদ্যে এই ধাতুর অভাবে শিশুদের ভাল

করিয়া অস্থি গঠিত হইতে পারে না। এই ধাতুরই অক্সাইড হইল—সুপরিচিত চুন যাহা বাড়ীর চুনকাম করিবার কাজে বা পানে খাইবার উপকরণ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। পান খাইবার চুনের ঢেলায় জল দিলে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে—এমন উত্তাপ নির্গত হয় যে সমস্ত মিশ্রণ টগবগ করিয়া ফুটিতে থাকে। এইবার যে **সিক্ত চুন** (slaked lime : slaked অর্থ যাহার পিপাসা মিটিয়াছে) প্রস্তুত হইল তাহাই প্রকৃতপক্ষে পানের সহিত খাওয়া হয়। লবণের যেমন সুপরিচিত একপ্রকার আস্বাদ আছে, অম্লের যেমন বিশেষ এক প্রকার (টক) আস্বাদ আছে, তেমনি ক্ষারেরও এক প্রকার আস্বাদ আছে, তাহা চুন একবার জিহ্বায় ঠেকাইলেই বোঝা যায়। ভাল পায়খানা না হইলে, হাত-পা জ্বালা স্বভাব ইত্যাদি লক্ষণ থাকিলে ডাক্তার অনেক সময় রোগীকে alkali mixture খাইতে দেন—ইহাতে যথেষ্ট ক্ষারজাতীয় ঔষধ থাকে। পূর্বের আলোচনায় আমরা দেখিয়াছি যে **আমাদের ইন্দ্রিয়ানুভূতি সূক্ষ্ম হিসাবের ক্ষেত্রে অচল**। সেজন্য বৈজ্ঞানিক বিষয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার সাহায্যেই সিদ্ধান্তে পৌঁছিতে হইবে। ক্ষারের এই সূক্ষ্ম পরীক্ষা হইল **লাল লিটমাসকে নীল বর্ণে** পরিবর্তিত করা (লিটমাস এক প্রকার উদ্ভিজ্জ রং)।

অম্লধর্মী অক্সাইড—পূর্বেই বলা হইয়াছে অধাতুর অক্সাইড, যেমন কার্বন-ডাই অক্সাইড—ইহাকে জলে দ্রবীভূত করিলে যে নূতন পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহাদের সাধারণ নাম **অম্ল** বা **অ্যাসিড**। এখানেও সূক্ষ্ম পরীক্ষা করিয়া অম্লমাত্রায় কোনও অ্যাসিডের অস্তিত্ব ধরিতে হইবে। এই পরীক্ষা হইল -**নীল লিটমাসকে লাল বর্ণে পরিবর্তিত করা**। সালফিউরিক অ্যাসিড, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড—ইহারা সুপরিচিত পদার্থ। সালফিউরিক অ্যাসিড বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগের একটি অপরিহার্য সামগ্রী। রাসায়নিক শিল্পে প্রায় সব অত্যাবশ্যক প্রক্রিয়াগুলি সালফিউরিক অ্যাসিডের উপর নির্ভর করিতেছে। তাই **কোনও দেশের শিল্প-সমৃদ্ধির মান ঐ দেশে সালফিউরিক অ্যাসিড ব্যবহারের পরিমাণ হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হয় না**। নাইট্রিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডও নানা প্রকার বৃহৎ শিল্পে ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসিড ও ক্ষার পরস্পর-বিরোধী পদার্থ। ইহাদের মিলিত করিলে উভয়ের মধ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার ফলে যে নূতন পদার্থ সৃষ্টি হয় তাহাকে **লবণ** বলে। আমরা মনে করিতে পারি লবণের মধ্যে অ্যাসিড ও ক্ষার প্রত্যেকের স্ব স্ব ধর্ম হারাইয়া সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। কারণ লবণ **প্রশমিত** (neutral) **পদার্থ** অর্থাৎ না-অ্যাসিড, না-ক্ষার। পৃথিবীর যৌগিক পদার্থগুলির এক বৃহৎ অংশ এই লবণ শ্রেণীভুক্ত।

পরীক্ষা: একটি বেসিনে কিছু অ্যামোনিয়া মিশ্রিত (অ্যামোনিয়া একপ্রকার ক্ষার গ্যাস) জল লইয়া লিটমাস কাগজ (লিটমাস রঙে ভিজাইয়া শুখানো কাগজ) দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ—লাল লিটমাস নীলবর্ণ হইয়া যাইবে। উহাতে এইবার একটি ড্রপার (dropper) হইতে ফোঁটা ফোঁটা সালফিউরিক অ্যাসিডের জলীয় দ্রবণ দিতে থাক এবং মধ্যে মধ্যে লাল লিটমাস দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ। কিছুক্ষণ পরে দেখিবে—লাল লিটমাস আর নীল হইতেছে না, নীল লিটমাস দিয়া পরীক্ষা করিলেও লাল হইবে না—যদি হয় সামান্য কয়েক ফোঁটা অ্যামোনিয়া দ্রবণ দিয়া সম্পূর্ণ প্রশমিত (neutralise) কর। এখন পাত্রে **অ্যামোনিয়ম সালফেট লবণ প্রস্তুত হইয়াছে।** ইহা একটি উত্তম সার। যদি পাত্রটিকে উত্তপ্ত করিয়া মিশ্রণের জলীয় ভাগ বাষ্পীভূত করিয়া দাও—তাহা হইলে পাত্রে অ্যামোনিয়ম সালফেটের গুঁড়া পড়িয়া থাকিতে দেখিবে।

লবণের আস্বাদ কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। গল্পে আছে, ভালবাসার পরীক্ষায় ছোট মেয়ে পিতাকে বলিয়াছিল—বাবা, আমি তোমাকে লবণের মত ভালবাসি। সত্যিই মানুষকে শাস্তি দেওয়ার এক অভিনব ব্যবস্থা হইল তাহাকে কিছুদিন বিনা লবণে তরিতরকারী খাইতে দেওয়া।

আমরা যাহা আলোচনা করিলাম তাহার ভিত্তিতে এইবার রাসায়নিক পদার্থগুলির একটা শ্রেণীবিভাগ করা যাক—
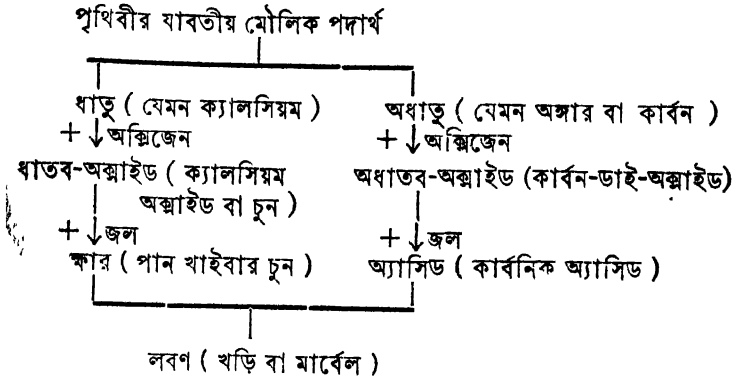
অ্যাসিডের গুণ ও ব্যবহার—অ্যাসিডগুলি **কি করিতে পারে** জানিলে অ্যাসিডগুলি কিরূপ পদার্থ তাহা বুঝা সহজ হইবে :—

অ্যাসিডের একটি প্রধান রাসায়নিক ক্রিয়া হইল ধাতুর সহিত। সালফিউরিক ও হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের সংস্পর্শে লোহা, দস্তা প্রভৃতি ধাতু আনিলে হাইড্রোজেন উৎপন্ন হয় তাহা তোমরা পূর্বে শিখিয়াছ। এই কারণেই ধাতুগুলি অ্যাসিডের ক্রিয়ায় ক্ষয় হইয়া যায় এবং ধাতুর কোনও পাত্রে অ্যাসিড রাখা উচিত নহে। ঘন অবস্থায় এই দুইটি অ্যাসিড মানুষের ত্বকও পোড়াইয়া ক্ষত সৃষ্টি করে। খবরের কাগজে অনেক সময় নাইট্রিক অ্যাসিড খাইয়া মৃত্যু হইয়াছে কিংবা ঝগড়াঝাঁটি, মারামারিতে অ্যাসিড-ভরা (পাতলা কাচের) বাল্ব্ ছুড়িয়া মারা হইয়াছে—এরূপ সংবাদ দেখা যায়। তবে জলের সহিত খুব পাতলা দ্রবণে ইহাদের ঔষধরূপে সেবন করাও যাইতে পারে। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো আমাদের পাকস্থলীতেই রহিয়াছে। **Acid N. M. dil** (dilute nitro-muriatic acid অর্থাৎ নাইট্রিক অ্যাসিড ও হাইড্রোক্লোরিক (muriatic) অ্যাসিডের পাতলা মিশ্রণ) অনেক সময় পেটের অসুখে খাইতে দেওয়া হয়। এ ছাড়া কতকগুলি **জৈব অম্ল** (organic acid) আছে যাহা আমরা নানাভাবে খাইয়া থাকি। যেমন সাইট্রিক অ্যাসিড (লেবু ও কাঁচা-ফলের মধ্যে), টার্টারিক অ্যাসিড (তেঁতুলের মধ্যে), অ্যাসিটিক অ্যাসিড

(ভিনিগার, সস্ প্রভৃতির মধ্যে), ল্যাক্‌টিক অ্যাসিড (টক দধির মধ্যে), **স্টিয়ারিক** অ্যাসিড (চর্বির মধ্যে) ইত্যাদি।

শিল্পজগতে সালফিউরিক অ্যাসিডের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলা হইয়াছে। নীচে একটি লেখ-চিত্রের (graph) মাধ্যমে ইহার কতকগুলি প্রয়োজনীয় ব্যবহারের উল্লেখ করা হইল :—
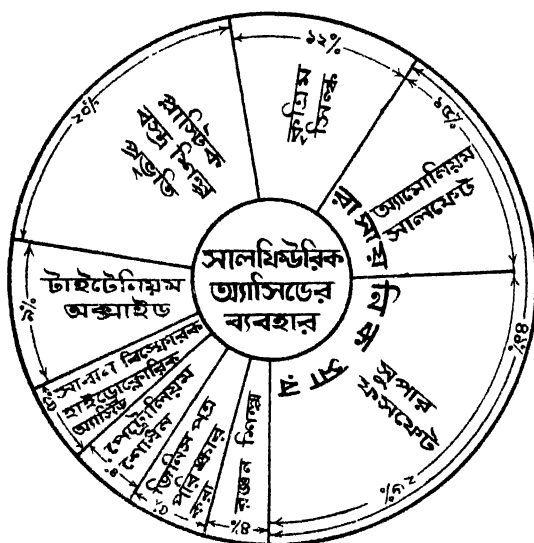
চিত্র নং ১২৭

এ ছাড়া অপর দুইটি প্রধান অ্যাসিড—**হাইড্রোক্লোরিক** ও **নাইট্রিক অ্যাসিড**—ইহারাও সালফিউরিক অ্যাসিড হইতে প্রস্তুত হয়।

(১) ঔষধ হিসাবে, (২) ল্যাবরেটরীতে নানা প্রকার পরীক্ষায় ও (৩) **রঞ্জনশিল্পে** ইহাদের উভয়ের ব্যবহার হয়। এ ছাড়া নাইট্রিক অ্যাসিডের প্রধান চাহিদা **নাইট্রো-গ্লিসিরিণ** (nitro-glycerin), পিকরিক অ্যাসিড, **টি-এন-টি** (T. N. T.) প্রভৃতি **বিস্ফোরক** (explosives) প্রস্তুতিতে। সম্প্রতি রাশিয়া কর্তৃক বিস্ফোরিত যে **মেগাটন** (megaton) **বোমা**গুলির কথা আমরা শুনিয়াছি—তাহা হইল

"লক্ষ লক্ষ টন টি-এন-টির সমান শক্তিবিশিষ্ট বোমা (mega = 10 লক্ষ)। সুতরাং টি-এন-টির শক্তিকেই বিস্ফোরক পদার্থগুলির শক্তির মাপ-কাঠি হিসাবে ব্যবহার করা হয়। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের প্রধান প্রয়োজন হইল ক্লোরিণ ও বিভিন্ন প্রকার ধাতব ক্লোরাইড প্রস্তুত করিতে।

কার্বনিক অ্যাসিড—কার্বন-ডাই-অক্সাইড জলে গুলিলে কার্বনিক অ্যাসিড হয়। এই অ্যাসিড অপর অ্যাসিডগুলির ন্যায় মোটেই শক্তিশালী নহে, এমন কি ইহাকে অ্যাসিড বলাই বোধ হয় সঙ্গত হয় না। জলে অতি পাতলা দ্রবণ হিসাবেই কার্বনিক অ্যাসিড পরিচিত। ইহাকে উত্তাপ দিয়া ঘন

চিত্র নং ১২৮ : সোডা-ওয়াটারের গ্যাসে মোমবাতি নিভিয়া যাইতেছে
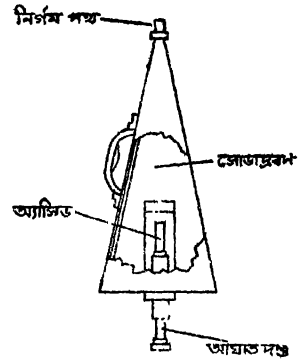
চিত্র নং ১২৯ : অগ্নিনির্বাপক—অ্যাসিড পাত্র ভাঙ্গিয়া অ্যাসিড সোডাদ্রবণে মিশিলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড বেগে বাহির হইয়া আগুন নিভাইয়া দেয়

করিতে চেষ্টা করিলেই ইহা বিশ্লিষ্ট হইয়া জল ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডএ পরিণত হয়। কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসকে যদি চাপ দিয়া জলে অধিক পরিমাণে দ্রবীভূত করা যায় তাহা হইলে যে দ্রবণ প্রস্তুত হয় তাহাকে আমরা **সোডা ওয়াটার** (soda water) বলিয়া থাকি। তাই সোডা ওয়াটারের বোতল খুলিলে এই গ্যাস বুদ্‌বুদ্‌ আকারে **ঝাঁকে-ঝাঁকে বাহির হইতে থাকে** (effervescence)। সোডা ওয়াটারে সিরাপ ও একটু গন্ধদ্রব্য মিশাইলে নানা প্রকার মিষ্ট **বাতান্বিত-জল** (aerated

waters) প্রস্তুত হয়; কোকা-কোলা, আইস-ক্রীম সোডা প্রভৃতি নানা নামে ইহারা আমাদের সুপরিচিত। তাহা হইলে **সোডা ওয়াটারে সোডা নাই** জানিয়া রাখ।

কষ্টিক পটাশ ও কষ্টিক সোডা (caustic potash and caustic soda)—চুন ক্ষারটির কথা বলা হইয়াছে। ইহা ছাড়া দুইটি বিখ্যাত তীব্র ক্ষার আছে। ইহাদের নাম কষ্টিক পটাশ ও কষ্টিক সোডা (caustic অর্থ—যাহা পোড়াইয়া দেয়)। ইহারা যথাক্রমে পটাশিয়ম ও সোডিয়ম নামক দুইটি ধাতুর অক্সাইড হইতে উৎপন্ন। কষ্টিক সোডা হইতেই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড সহযোগে **খাদ্য-লবণ** (common salt)—সোডিয়ম ক্লোরাইড—উৎপন্ন হয়। আর কষ্টিক পটাশ হইতে নাইট্রিক অ্যাসিডের সহযোগে যে লবণ প্রস্তুত হয় তাহার রাসায়নিক নাম পটাশিয়ম নাইট্রেট—সাধারণ ভাষায় যাহার নাম **শোরা**। এই শোরা কালীপূজার বিখ্যাত **তুবড়ী**-বাজির একটি প্রধান উপাদান। শোরায় প্রচুর রাসায়নিকভাবে যুক্ত অক্সিজেন আছে এবং এই অক্সিজেনই অগ্নিসংযোগে মুক্ত হইয়া তুবড়ীর বারুদের অন্যান্য উপাদানগুলিকে তীব্রভাবে উজ্জ্বল আলোক বিকিরণ করিয়া জ্বালাইতে সাহায্য করে।

মিল্ক অব্ ম্যাগ্নেশিয়া (milk of magnesia) নামে ডাক্তারখানায় যে বিখ্যাত ঔষধটি বিক্রয় হয় তাহা আসলে ম্যাগনেশিয়ম ধাতুর ক্ষার, চুন যেমন ক্যালসিয়ম ধাতুর ক্ষার। ইহা অম্ল, অজীর্ণ প্রভৃতি রোগে পরম উপকারী ঔষধ।

বিভিন্ন লবণের ব্যবহার—লবণজাতীয় পদার্থগুলি একত্রে একটি বৃহৎ শ্রেণী। ইহারা যে কত রকমের আছে এবং মানুষের কত বিচিত্র প্রয়োজনে লাগে তাহার তুলনা নাই। এখানে মাত্র কয়েকটি প্রয়োজনীয় লবণ ও সংক্ষেপে তাহাদের ব্যবহারের উল্লেখ করা হইল :—

লবণ	ব্যবহার
১। সোডিয়ম কার্বনেট	১। কাপড় কাচিবার সোডা—ইহা জল মৃদু করিবার জন্য (softening), কাচ, কাগজ, সাবান প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহার হয়।
২। সোডিয়ম বাই-কার্বনেট	২। খাইবার সোডা—অম্লরোগে ইহা পাকস্থলীর অতিরিক্ত অ্যাসিড প্রশমিত করিবার জন্য দেওয়া হইয়া থাকে; পাঁউরুটি, নিমকি প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ময়দার সহিত অল্প পরিমাণে মাখিয়া দিলে পরে উত্তাপে ইহার মধ্যস্থ কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত হইয়া পাঁউরুটি, নিমকি ফুলিয়া বেশ নরম হয়।
৩। ম্যাগনেসিয়ম সালফেট	৩। সংক্ষেপে ম্যাগ-সালফ্ (mag. sulph.) বলা হয়; ইহা একটি সুপরিচিত **বিরেচক পদার্থ** অর্থাৎ জোলাপ (purgative)।
৪। অ্যামোনিয়ম সালফেট ও অ্যামোনিয়ম ফস্ফেট	৪। বিখ্যাত নাইট্রোজেন-সংবলিত সার।
৫। এলুমিনিয়ম সালফেট (ফট্‌কিরী)	৫। জল-বিশোধক—জলে দিলে ময়লাগুলি জমাট বাঁধিয়া নীচে পড়িয়া যায়; কাপড়ের রং পাকা করিবার জন্যও জলীয় দ্রবণ করিয়া ব্যবহার করা হয়।
৬। কপার সালফেট (তুঁতে)	৬। জীবাণু-নাশক পদার্থ—উদ্ভিদ-দেহের নানা রোগ দূর করিতে ব্যবহৃত হয়; **ইলেক্ট্রোপ্লেটিং** (electroplating)-এ ব্যবহার করা হয়।

নাইট্রোজেন ও নাইট্রোজেন চক্র

(Nitrogen and Nitrogen Cycle)

প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনে নাইট্রোজেনের চাহিদা

পূর্ব অধ্যায়ে আমরা উদ্ভিদের সার হিসাবে (ক) **অ্যামোনিয়াম** সালফেট ও অ্যামোনিয়াম ফসফেট লবণের কথা বলিয়াছি। এ ছাড়া (খ) **নাইট্রেট ও নাইট্রাইট** লবণও উদ্ভিদদেহের পুষ্টির জন্য একান্ত আবশ্যক। এই উভয় জাতীয় লবণেরই একটি সাধারণ উপাদান হইল—**নাইট্রোজেন,** যাহা বায়ুর মধ্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে বর্তমান। সুতরাং দেখা যাইতেছে বায়ুর নাইট্রোজেন জীবের শ্বাসকার্যে প্রত্যক্ষ কোনও সাহায্য না করিলেও উদ্ভিদের খাদ্যের ইহা অপরিহার্য উপাদান। শুধু উদ্ভিদ কেন, প্রাণীর খাদ্যেরও একটি অত্যাবশ্যক উপাদান হইল নাইট্রোজেন। এই নাইট্রোজেন অবশ্য বিশুদ্ধ গ্যাসীয় নাইট্রোজেন রূপে কোনও প্রাণীই খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করিতে পারে না, যদিও কোনও কোনও উদ্ভিদ ইহা কিছু পরিমাণে করিতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ উদ্ভিদ নাইট্রোজেন গ্রহণ করে মাটির নাইট্রোজেন-সংবলিত লবণের ভিতর দিয়া যাহাদের কথা এখনই বলা হইল। এই প্রক্রিয়াটিও প্রাণীদের আয়ত্তে নহে, তাহাদের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটে উদ্ভিদদেহে প্রস্তুত নাইট্রোজেন-যুক্ত খাদ্য হইতে। ইহাদের উদ্ভিজ্জ **প্রোটীন** (protein) বলে। **মাংসাশী প্রাণীর** কথা মনে আসিতেছে? কিন্তু তাহারাও তো শেষ পর্যন্ত উদ্ভিদের উপরই নির্ভর করিতেছে—একটু ভাবিলেই বুঝিতে পারিবে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে—পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের নাইট্রোজেনের বিরাট চাহিদার সম্বল হইতেছে—মূলতঃ মৃত্তিকার নাইট্রোজেন ভাণ্ডার এবং কিছু পরিমাণে বাতাসের গ্যাসীয় নাইট্রোজেন। কিন্তু পৃথিবীর সমুদয় জীবরাজি যদি একাদিক্রমে এই পদার্থটি মৃত্তিকা ও বাতাস হইতে আহরণ করিয়াই

নাইট্রোজেন চক্রের তাৎপর্য

চলিত তাহা হইলে এতদিনে বোধ হয় পৃথিবীতে ইহার উৎস নিঃশেষ হইয়া যাইত। কিন্তু প্রকৃতির সামঞ্জস্যের বিধানে এই অঘটন ঘটিবার উপায় নাই। কিরূপে ইহা সম্ভব হয় তাহারই আলোচনা এখানে করা যাইবে।

নাইট্রোজেন-সংযোজনকারী ব্যাকটিরিয়া (nitrifying bacteria)

মৃত্তিকার মধ্যে অবস্থিত নাইট্রোজেন-সংবলিত লবণগুলির দ্রবণ উদ্ভিদ শিকড়ের মধ্য দিয়া নিজেদের শরীরে গ্রহণ করিয়া প্রোটীনে পরিবর্তিত করে এবং সেই প্রোটীন হইতে প্রাণীরা তাহাদের দেহের প্রোটীন সংশ্লেস করে। সুতরাং প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের এই প্রোটীনকে ভাঙ্গিয়া পুনবায় উহাকে নাইট্রেট আদি লবণে পরিবর্তিত করিয়া মাটিতে ফিরাইয়া দিতে পারিলে চাহিদা ও যোগানের সামঞ্জস্য রক্ষিত হয়। আমাদের চক্ষুর অগোচরে মৃত্তিকাবাসী একজাতীয় জীবাণু দ্বারা জীবজগতের এই মহাপ্রয়োজনীয় কার্য সাধিত হইতেছে। ইহা মূলতঃ এক প্রকার **পচন-প্রক্রিয়া।** ফলমূল, মাছমাংস, মলমূত্র যে কোনও জৈব পদার্থ কিছুদিন রাখিয়া দিলে পচিতে আবম্ভ করে। আমাদের জীবনের ছোট গণ্ডীতে গৃহের ও সমাজের পবিবেশে এই পচন অতি ঘৃণ্য, অবাঞ্ছিত ব্যাপার এবং নানা উপায়ে আমবা এই প্রক্রিয়ার রোধ করিতে চেষ্টা করি। কিন্তু বিশ্বের জীবনের লীলায ইহার যে মহৎ পবিত্র স্থান তাহার তুলনা নাই।

পচন—পচন-সংঘটনকাবী জীবাণু উদ্ভিদজাতীয় এক প্রকাব সূক্ষ্মদেহী জীব—ইংরাজীতে ইহাদের নাম **ব্যাকটিরিয়া** (bacteria)। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র ব্যতীত উহাদের দেখা অসম্ভব। ইহাদেব দেহে **ক্লোরোফিল** (chlorophyll) নাই—সুতরাং সাধারণ উদ্ভিদের ন্যায় বাতাস বা মৃত্তিকা হইতে প্রয়োজনীয় উপকরণ সংগ্রহ করিয়া খাদ্য প্রস্তুত করিবাব ক্ষমতা ইহাদের নাই। তাই ইহারা সাধারণ উদ্ভিদ বা প্রাণীর দেহের **প্রস্তুত খাদ্যের** উপর নির্ভবশীল। সুতরাং সকল প্রকার জৈব পদার্থ, বিশেষ করিয়া মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের দেহ হইতে পুষ্টি গ্রহণ করিয়া ইহারা প্রাণ-ধারণ করে। ইহাদের এই প্রাণধারণের প্রক্রিয়াই হইল **পচন**। জীবের প্রস্রাব কিছুক্ষণ পড়িয়া থাকিলে উহা হইতে যে একপ্রকার উগ্রগন্ধী গ্যাস—

অ্যামোনিয়া—সৃষ্ট হয় তাহা আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। এই ভাবে অ্যামোনিয়া ও আরও দুর্গন্ধযুক্ত নানা পদার্থের সৃষ্টির মধ্য দিয়া জীব-দেহের প্রোটীন অবশেষে সম্পূর্ণরূপে ভাঙ্গিয়া নাইট্রোজেন-যুক্ত বিভিন্ন লবণে পরিণত হয়। মাটির যে সকল লবণের কথা বলা হইল তাহারা এই-ভাবেই মাটিতে আসে। মৃত্তিকার জীব আবার মৃত্তিকায় পরিণত হয়—বাইবেলের সেই মহাবাণী, Dust thou art, and unto dust shalt thou return.

মৃত্তিকাবাসী এই ব্যাকটিরিয়ার অনেকগুলি জাতি আছে। ইহারা ধাপে ধাপে, এক প্রকার রিলে পদ্ধতিতে (relay system—তোমরা যেমন relay race করিয়া থাক) জীবদেহের এই পরিবর্তন ঘটায়—এক এক জাতীয় ব্যাকটিরিয়ার উপর যেন পচনের এক এক পর্যায়ের ভার দেওয়া আছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে পৃথিবী হইতে কোন কারণে সমুদয় জীবাণু অপসারিত হইলে শুধু যে মৃত জীবজন্তু, উদ্ভিদের অবিকৃত দেহাবশেষে ভূপৃষ্ঠ সমাকীর্ণ হইয়া পড়িত তাহা নহে, উহাদের দেহের নাইট্রোজেন ভাণ্ডারও চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হইয়া যাইত। ফলে মৃত্তিকাস্থিত নাইট্রোজেনের ভাণ্ডার নিঃশেষিত হইয়া প্রথমে উদ্ভিদ ও পরিণামে প্রাণিরাজি অনাহারে মরিত।

বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের বন্ধন
(Fixation of Atmospheric Nitrogen)

ক। **ব্যাকটিরিয়া**—নাইট্রোজেনের অভাবের কথা উঠিলে স্বভাবতই বায়ুমণ্ডলের বিপুল নাইট্রোজেন ভাণ্ডারের কথা মনে পড়িয়া যায়। বায়ু-মণ্ডলের মুক্ত নাইট্রোজেনও কয়েক প্রকার উদ্ভিদ সরাসরি তাহাদের দেহের পুষ্টির প্রয়োজনে গ্রহণ করিতে পারে। ইহাদের **শিম্বি-গোত্র** (leguminous) **উদ্ভিদ** বলে, যেমন মটর শিম ইত্যাদি। শিম্বী নাম হইবার কারণ—তোমরা দেখিযা থাকিবে এই সব উদ্ভিদের বীজ একটি আবরণের মধ্যে ঢাকা থাকে। ঐ আবরণটিকে শিম্ব (legume) বলে। ইহাদের মাটি হইতে উপড়াইয়া শিকড়গুলি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহাদের স্থানে স্থানে কতকগুলি স্ফীতাকার পদার্থ রহিয়াছে। এইগুলিকে

অর্বুদ (nodules) বলে। অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলে দেখা যায় এই সব অর্বুদের ভিতর অসংখ্য ব্যাকটিরিয়া বাসা বাঁধিয়া আছে। এই ব্যাকটিরিয়ার দল মাটির মধ্যস্থ বাতাসের নাইট্রোজেন ও কার্বন-ডাই-অক্সাইডের সমাবেশ ঘটাইয়া এক অপূর্ব প্রক্রিয়ায় উহাদের প্রোটীনে রূপান্তরিত করে। এই কারণে উহাদের **নাইট্রোজেন-বন্ধনকারী** (nitrogen fixing) **ব্যাকটিরিয়া** বলে। ব্যাকটিরিয়া-সংগঠিত এই প্রোটীনই উদ্ভিদ্‌দেহের প্রয়োজনীয় প্রোটীন যোগায়। দেখা গিয়াছে যে বালি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় জীবাণুমুক্ত করিয়া সেই বালিতে বীজ বপন করিলে ঐ সকল উদ্ভিদের শিকড়ে
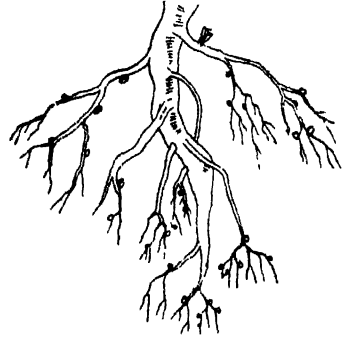
চিত্র নং ১৩০ : শিম্বি-গোত্র উদ্ভিদের শিকড়ে অর্বুদ (nodules) জন্মাইয়াছে
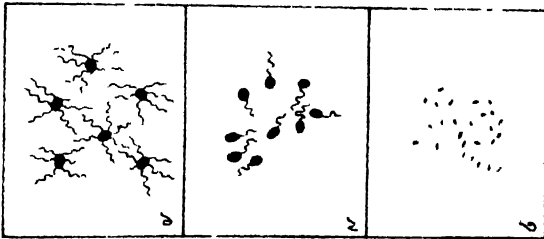
চিত্র নং ১৩১ : বিভিন্ন শ্রেণীর হিতকারী ব্যাকটিরিয়া ; ১—শিম্বি-গোত্র উদ্ভিদের শিকড়ের অর্বুদবাসী ব্যাকটিরিয়া ; ২, ৩—মৃত্তিকাবাসী দুই শ্রেণীর ব্যাকটিরিয়া—যাহারা অ্যামোনিয়ম লবণকে নাইট্রাইট লবণে পরিবর্তিত করে

এই অর্বুদ জন্মে না এবং তখন উদ্ভিদের খাদ্যে নাইট্রোজেন-যুক্ত লবণ আলাদাভাবে না দিলে উহারা বাঁচে না। ব্যাকটিরিয়াগুলি অবশ্য নিঃস্বার্থ ভাবে উদ্ভিদের এই উপকার সাধন করে না। গাছকে যেমন তাহারা প্রোটীন সরবরাহ করে তেমনি উহার নিকট হইতে শর্করা-জাতীয় ও অন্যান্য

প্রস্তুত খাদ্য গ্রহণ করে। জীববিদ্যায় এই জাতীয় পরস্পর-নির্ভরতাকে **মিথোজীবিতা** (symbiosis) বলে।

হিসাব করিয়া দেখা গিয়াছে—এক একর জমিতে এই শিম্বি-গোত্রীয় উদ্ভিদ চাষ করিলে প্রায় ২৫০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন-যুক্ত সার সঞ্চিত হয়। সুতরাং লক্ষ্য রাখিতে হইবে যেন জমির অবস্থা জীবাণুগুলির জীবন ধারণের, অনুকূল হয়। অতএব মৌলিক নাইট্রোজেন—যাহার রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তার জন্য সহজে কাজে লাগাইতে পারা যায় না—এইভাবে নাইট্রোজেন-যুক্ত লবণে পরিবর্তিত হইয়া জীবজগতের প্রয়োজনে লাগে। এই প্রক্রিয়াকে **বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের বন্ধন** বলা হয়।

খ। **বিদ্যুৎস্ফুরণ**—বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনের বন্ধনের আর একটি স্বাভাবিক উপায় আছে। তাহা হইল আকাশের বিদ্যুৎস্ফুরণ। এই বিদ্যুৎস্ফুরণের ফলে বাতাসের নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের সংশ্লেষণ ঘটিয়া জলের সংযোগে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয ও উহা বৃষ্টির সহিত ভূপৃষ্ঠে পড়িয়া মৃত্তিকার মধ্যে বিভিন্ন ধাতুর নাইট্রেট লবণে পরিবর্তিত হয।

সুতরাং বোঝা গেল উদ্ভিদের পুষ্টির জন্য মাটির মধ্যে নাইট্রোজেন-যুক্ত কয়েকপ্রকার ও আরও কয়েক শ্রেণীর লবণের প্রয়োজন। আসলে মাটির কাজ এই লবণগুলি সরবরাহ করা, মৃত্তিকার নিজের কোনও পুষ্টিকারক গুণ নাই। সুতরাং মাটির পরিবর্তে যদি লবণগুলিকে অন্য কোনও আধারে উদ্ভিদের পরিবেশন করা হয় তাহা হইলেও উদ্ভিদের প্রাণধারণে কোনও অসুবিধা নাই। আমেরিকায় **হাইড্রোপনিক্স** (hydroponics) বলিয়া এক প্রকার মৃত্তিকাবিহীন চাষ ধীরে ধীরে বৃদ্ধিলাভ করিতেছে। লম্বা, অগভীর বেসিনে বালি ভর্তি করিয়া ঐ বালি প্রয়োজন মত লবণের দ্রবণে সিক্ত করা হয়, আর জল নিষ্কাশনের সুব্যবস্থা থাকে। মরুভূমিতেও এভাবে স্বচ্ছন্দে চাষ করা যাইতে পারে। তা ছাড়া এই পদ্ধতিতে বড বড ক্ষেত, ভূমিকর্ষণ, সার—সাধারণ চাষের এ সব ঝঞ্ঝাট নাই।

নীচে প্রকৃতিতে স্বাভাবিক নাইট্রোজেন চক্রের একটি চার্ট (chart) দেওয়া হইল। ইহার সাহায্যে এই প্রক্রিয়ার একটি সমগ্র রূপ চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠিবে :—
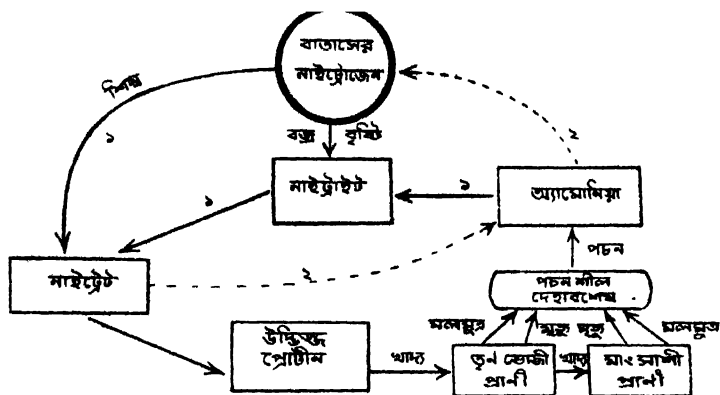
চিত্র নং ১৩২ : প্রকৃতির নাইট্রোজেন-চক্র—অর্থাৎ নাইট্রোজেনের মুক্তি ও বন্ধনের লীলা : ১—নাইট্রোজেন বন্ধনকারী ব্যাকটিরিয়ার সাহচর্য ; ২—নাইট্রোজেন মুক্তকারী ব্যাকটিরিয়ার সাহচর্য

শস্য পর্যায় (Rotation of crops)—

উপরে **উদ্ভিদদেহের পুষ্টিসাধনের** কথা বলা হইয়াছে। এই পুষ্টিসাধন দুইভাবে ঘটে—

ক। পাতার মাধ্যমে কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করিয়া জলের সাহায্যে দেহে **শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয়** পদার্থের সৃষ্টি ,

খ। শিকড়ের মাধ্যমে নাইট্রোজেন-সংবলিত লবণ গ্রহণ করিয়া পাতায় কার্বন-ডাই-অক্সাইড-এর সহিত মিলিত করিয়া **প্রোটীন জাতীয় পদার্থের** সংশ্লেষণ।

প্রথম প্রক্রিয়াটি সকল সাধারণ উদ্ভিদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। শেষের প্রক্রিয়াটি সম্পর্কে বিভিন্ন উদ্ভিদে বিভিন্ন প্রকার ব্যবস্থা আছে তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি।

পুরাকাল হইতেই মানুষ লক্ষ্য করিয়া আসিতেছে যে ধান, গম ইত্যাদি শস্য একই জমিতে বছরের পর বছর চাষ না করিয়া মধ্যে মধ্যে ঐ জমিতে **শিম্বি-গোত্রের উদ্ভিদ** ও কয়েক জাতীয় ঘাস বপন করিলে ফসল ভাল হয়। সাধারণ শস্য মাটি হইতে যে সকল নাইট্রোজেনযুক্ত লবণ গ্রহণ করিয়া মাটিকে সারশূন্য করে সেই নাইট্রোজেন পুনরায় এই জাতীয় উদ্ভিদের

দ্বারা পূর্ববর্ণিত প্রক্রিয়ায় মাটিতে প্রত্যর্পিত হয়, সুতরাং মৃত্তিকার উৎপাদন-শক্তি অক্ষুণ্ণ থাকে বা প্রকৃতপক্ষে বৃদ্ধি পায়। ইহাকেই ইংরাজীতে **rotation of crops** বলে। (এখানে **rotation** অর্থ—ঘুরাইয়া ফিরাইয়া করা)।

চুন ও চুন হইতে উৎপন্ন পদার্থসমূহ

একটি সাধারণ পরীক্ষার সহিত বিজ্ঞানের ছাত্র মাত্রেরই পরিচয় আছে : একটি টেষ্টটিউবে চুনের জল লইযা কিছুক্ষণ উহাতে কার্বন-ডাই-অক্সাইড চালনা করিলে **ঘোলাটে** হইয়া যায়—ইহা কার্বন-ডাই-অক্সাইডের একটি নির্ভর যোগ্য পরীক্ষা। কেন ঘোলাটে হয় ?—

নিশ্চয় উহাদের পরস্পর ক্রিযার ফলে এমন একটি নূতন পদার্থ সৃষ্টি হইয়াছে যাহা **জলে অদ্রবণীয়**—সুতরাং জলের মধ্যে সর্বত্র ভাসমান হইয়া রহিয়াছে আর জল ঘোলাটে দেখাইতেছে। এই পদার্থটি তোমাদের সকলেরই সুপরিচিত। ইহা হইল—**খড়ি**। টেষ্ট-টিউবটি **কিছুক্ষণ** রাখিয়া দিলে—খড়ির গুঁড়াগুলি থিতাইযা নীচে পডিয়া যাইবে। চুনের জলের রাসায়নিক পরিচয় পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে ; ইহা একটি ক্যালসিয়মের ক্ষার এবং ইহার সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড (বা কার্বনিক অ্যাসিড) মিশিয়া যে পদার্থের সৃষ্টি হয় তাহা অবশ্যই লবণ শ্রেণীতে পড়ে। এই লবণই হইল উপরোক্ত খড়ি—ক্যালসিয়ম কার্বনেট (calcium carbonate)।
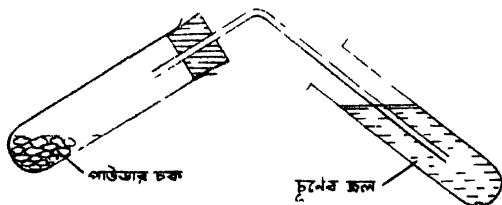
চিত্র নং ১৩৩ : তাপ-প্রয়োগে গুঁড়া খড়ি হইতে নির্গত গ্যাসে চুনের জল ঘোলা হইয়া যায়

প্রকৃতির বিভিন্নদ্রব্যে খড়ি পাওয়া যায—মার্বেল পাথর, পাথুরে চুন, শামুক চুন ইত্যাদি। ইহাদের উপর তীব্র উত্তাপ প্রয়োগ করিলে ভাঙ্গিয়া

কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাস বাহির হইয়া যায় এবং সাধারণ চুন পড়িয়া থাকে। বাজারে এই চুন শক্ত ডেলা ডেলা আকারে বিক্রীত হয়। ইহার রাসায়নিক গঠন হইল—ক্যালসিয়ম অক্সাইড। প্রত্যেক ধাতব অক্সাইডে জল দিলে পুনরায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া ক্ষার প্রস্তুত হয়; এক্ষেত্রেও তাহাই হইবে। বোধ হয় লক্ষ্য করিয়া থাকিবে চুনে জল দিলে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়: দৃঢ় কঠিন পদার্থ দেখিতে দেখিতে ফুলিয়া, ফাঁপিয়া ধ্বসিয়া পড়ে এবং এমন তীব্র উত্তাপের সৃষ্টি হয় যে জল ফুটিতে থাকে। মিশ্রণটি শান্ত হইলে নরম সাদা কাদার ন্যায় দেখিতে, বা জল পরিমাণ মত হইলে—সাদা, গুঁড়াগুঁড়া পদার্থ পড়িয়া থাকে। ইহাই হইল চুনের ক্ষার। জলের সহিত চুনের এই প্রবল **বিক্রিয়ার** (reaction) জন্য উহার ইংরাজী নাম দেওয়া হইয়াছে—**quick lime** অর্থাৎ জীবন্ত চুন। সত্যিই তখন উহাকে জীবন্ত বলিয়াই বোধ হয়। বাংলায় উহাকে **কলিচুন** বলিতে পারি।

চিত্র নং ১৩৪ : কলিচুনে জল দিলে যাহা হয় :
ক—জল ঢালা, খ—তাপে বাষ্প সৃষ্টি হইয়া চুনের খণ্ডটি ফুলিয়া উঠিতেছে গ—শেষ অবস্থায় সিক্ত চুনে পরিণত হইয়াছে

সিক্ত বা ক্ষারচুন জলে অতি অল্প দ্রবণীয়। সুতরাং জলের সহিত নাড়িয়া দিলে খুব সামান্য পরিমাণ দ্রবীভূত হইয়া **চুনের জল** (lime water) প্রস্তুত হয় এবং বাকী অংশ জলে ভাসমান থাকিয়া 'চুনের দুগ্ধ' (milk of lime) প্রস্তুত হয়। এই "চুনের দুগ্ধ"ই বাড়ী চুনকাম করিবার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়। ক্ষার অম্লকে প্রশমিত করিতে পারে। এজন্য হজম না হইয়া

'অম্বল' হইলে অর্থাৎ পাকস্থলীতে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডের পরিমাণ বেশি হইলে অনেক সময় শিশুদের চুনের জল খাইতে দেওয়া হয়। ইহাতে বিষম অবস্থার উপশম হয়।

চুনের জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইডএর সংযোগ ঘটাইলে খড়ি উৎপন্ন হইয়া জল ঘোলাটে হইয়া যায়, এই পরীক্ষার কথা প্রথমেই বলা হইয়াছে। ইহার পর যদি আরও কার্বন-ডাই-অক্সাইড চালনা করা হইতে থাকে তাহা হইলে দেখা যাইবে যে ঘোলাটে ভাব কাটিয়া গিয়া মিশ্রণটি পুনরায় পরিষ্কার হইয়া যাইতেছে অর্থাৎ **কার্বন-ডাই-অক্সাইড সংযোগে খড়ি জলে দ্রবীভূত হইয়া যায়**। এই ব্যাপারটি সম্পর্কে পরেব অধ্যায়ে পুনরায আলোচনা করা হইবে।

চুনাপাথর প্রভৃতি উত্তপ্ত করিয়া চুনে পরিণত করার প্রক্রিয়াকে সাধারণ ভাষায় **চুন-পোড়ানো** (burning of lime) বলে। চুন-পোড়ানো একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ শিল্প. কারণ চুনের অনেক ব্যবহার আছে। শুধু চুনকামের জন্য নহে, দেওয়াল গাঁথিতে রাজমিস্ত্রীরা যে 'মসলা' (mortar) ব্যবহার করে তাহাতে বালি ও সিমেণ্টের সহিত অনেক সময় এই চুন যথেষ্ট পরিমাণে মিশ্রিত করা হয়। কয়েক জাতীয় সিমেণ্ট প্রস্তুত করিতেও চুনের প্রয়োজন হয়। তা ছাড়া কৃষিকার্যেও জমির উন্নতি-বিধানের জন্য খড়ি, ক্ষারচুন ও কলিচুনের মিশ্রণ ব্যবহার করা হয়। চামড়া-শিল্পে চামড়া হইতে চুল বিচ্ছিন্ন করিবার জন্যও চুনের এক বিশেষ দ্রবণ ব্যবহার হয়।

চুনেব ব্যবহাব

চুন-পোড়াইবার জন্য বিশেষ গঠনের এক প্রকার চুল্লী ব্যবহার করা হয়। ইহাকে চুন-পোড়ানো চুল্লী (lime kiln) বলে। চুনাপাথর কয়লার সহিত মিশাইয়া চুল্লীর উপরের মুখ দিয়া ভিতরে ফেলা হয় এবং চুল্লীতে আগুন ধরানো হয়। ১৬০০ ফাঃ উত্তাপে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। পরে কিছু কয়লার ছাই-মিশ্রিত কলিচুন চুল্লীর তলদেশ হইতে কোদাল দিয়া চাঁচিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। চুনের মধ্যে এইটুকু ছাইএর উপস্থিতি "ম স লা" (mortar) বা সিমেণ্ট তৈরির কাজে বিশেষ ক্ষতি করে না। চুল্লীর মধ্যে সংঘটিত

চুন পোড়াইবার প্রক্রিয়া

রাসায়নিক ক্রিয়া আর কিছুই নহে—উত্তাপের ফলে চুনাপাথর ভাঙ্গিয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড বাহির হইয়া যায় এবং কলিচুন পড়িয়া থাকে।

এইবার আমরা দেওয়ালে চুন প্রভৃতি মিশাইয়া মসলা করিয়া পলস্তারা (plaster) দেওয়া হয় কেন তাহা বুঝিতে পারিব।

পলস্তারার বৈজ্ঞানিক ভিত্তি

ক্ষার চুনের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত করিলে খড়ি প্রস্তুত হয় দেখিয়াছি। এখানেও তেমনি মসলার চুনের সহিত বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিলিত হইয়া দৃঢ়, কঠিন চুনাপাথর পুনরুৎপাদিত হইয়া ইটগুলিকে পরস্পর শক্ত করিয়া টানিয়া ধরে। বালির কাজ হইল উহার কণাগুলির মধ্যস্থ ফাঁক দিয়া বাতাস প্রবেশের পথ রাখা এবং মসলা জমিয়া যাইবার পর টানে যাহাতে বেশী সংকুচিত না হইয়া যায় তাহার উপায় করা।
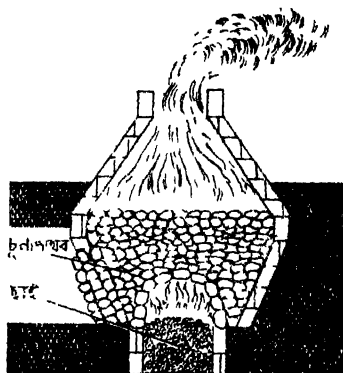
চিত্র নং ১৩৪ : চুনের ভাটি (lime kiln) : কয়লার আগুনে চুনাপাথর পোড়াইয়া কলিচুনে পরিণত করা হয়

চুনের প্রকার ভেদ

চুন (lime) কথাটি বেশ ব্যাপক অর্থে ব্যবহার হয়। অনেক সময় যে ক্যালসিয়ম ধাতু চুন জাতীয় সকল পদার্থের মূল উপাদান তাহাকেও আমরা চুন বলিয়া থাকি। তা ছাড়া—খড়ি, মার্বেল, পাথুরে চুন, কলিচুন, ক্ষার চুন (slaked lime—যাহা পানের সহিত ব্যবহৃত হয়)—ক্যালসিয়ম সংক্রান্ত যাবতীয় পদার্থ সাধারণ ভাষায় 'চুন' বলিয়া পরিচিত। কিন্তু ইহাদের বিভিন্ন রাসায়নিক গঠন সম্বন্ধে আমাদের যেন পরিষ্কার ধারণা থাকে। এখানে বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি চার্টে চুনের বিভিন্ন রূপ ও উহাদের পরস্পর সম্পর্ক দেখানো হইল :—

ক্যালসিয়ম ধাতু

+↓অক্সিজেন

কলিচুন (calcium oxide)

+↓জল

ক্ষার চুন (calcium hydroxide)

(পান খাইবার চুন ও চুনকাম করিবার চুন)

+↓কার্বন-ডাই-অক্সাইড

খড়ি, মার্বেল, চুনাপাথর, প্রবাল (coral)
মুক্তা, শামুকের খোলা প্রভৃতি } (calcium carbonate)

পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা মূল্যবান "পাথর" হীরক যেমন সামান্য কয়লার রূপান্তর তেমনি আর একটি মূল্যবান পাথর মুক্তা—তাহাও সাধারণ চুনেরই এক অভিনব রূপ! সকল প্রকার ক্যালসিয়ম কার্বনেটই অ্যাসিডে দ্রবীভূত হইয়া যায়। গল্প আছে ইজিপ্টের রাণী, বিখ্যাত সুন্দরী ক্লিওপেট্রা একবার বাজী ধরিয়াছিলেন যে তিনি তাঁহার একবারের আহারে ১৫,০০০ পাউণ্ড খরচ করিতে পারেন। অসম্ভব কথা! কিন্তু তিনি বোধ হয় বিজ্ঞান জানিতেন। বিস্ফারিত-নেত্র দর্শকদের সম্মুখে তিনি তাঁহার কান হইতে মুক্তাটি খুলিয়া এক কাপ (acetic acid) ভিনিগারের মধ্যে ফেলিয়া দিলেন। উহা কিছুক্ষণের মধ্যে গলিয়া মিশিয়া গেল এবং তিনি সেই দ্রবণ পান করিলেন। আর একটি কানের মুক্তাটিও খুলিতে যাইতেছেন, (কারণ মুক্তা দুইটির দাম একত্রে ১৫,০০০ পাঃ ছিল) দর্শকেরা বাধা দিলেন—তাঁহার বাজীতে জয়লাভ তো হইয়াই গিয়াছে।

ক্লিওপেট্রার বাজী

খর জল ও মৃদু জল

(Hard Water and Soft Water)

পূর্বের প্রসঙ্গে বলা হইযাছে যে চুনের জলে কার্বন-ডাই-অক্সাইড এবং পরে আরও কার্বন-ডাই-অক্সাইড চালিত করিলে জলটি ঘোলাটে হইয়া ক্রমশঃ আবার পরিষ্কার হইয়া যায় অর্থাৎ **খড়ি কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জলে দ্রবণীয়।** কিন্তু এখানে বলিয়া রাখি—দ্রবণ দুইভাবে

সম্ভব হয়—(১) দ্রাবক ও দ্রাব্যের মধ্যে এক বিশেষ সম্পর্ক অনুযায়ী। যেমন লবণ জলে দ্রবীভূত হয় কিন্তু কোহলে হয় না, অপরপক্ষে আয়োডিন কোহলে দ্রবীভূত হয়, কিন্তু জলে হয় না। এই জাতীয় দ্রবণ একটা অবস্থাগত পরিবর্তনের (physical change) ব্যাপার। কিন্তু (২) খড়ির কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জলে দ্রবণ একটা রাসায়নিক পরিবর্তনের ব্যাপার। এখানে খড়ি আর ঠিক পূর্বের খড়ি থাকিল না, **কার্বন-ডাই-অক্সাইড সহযোগে অন্য বস্তুতে পরিণত হইল** এবং এই নূতন বস্তুটি হইল জলে দ্রবণীয়। সুতরাং 'কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জল'—বিবেচনা না করিয়া জল জলই রহিল, আর কার্বন-ডাই-অক্সাইড খড়ির সহিত সংযুক্ত হইয়া জলে দ্রাব্য এক নূতন পদার্থে পরিণত হইল—এইভাবে দেখিলে বৈজ্ঞানিক দিক দিয়া যুক্তিসঙ্গত হয়। কি এই নূতন পদার্থ? ইহাও একপ্রকার ক্যালসিয়ম জাতীয় লবণ; ইহার নাম ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেট। কাপড়-কাচা সোডার সহিত খাইবার সোডার যে সম্পর্ক, খড়ির সহিত এই ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেটেরও ঠিক সেই সম্পর্ক। এইবার আমাদের আলোচ্য বিষয়ের আর একটু কাছে আসা যাক।

দ্রবণ কেন ঘটে

সাবানের সহিত জলের ক্রিয়া

কলিকাতায় বা কলিকাতার বাহিরে যদি কোথাও tube-well বা পাতকুয়ার জল ব্যবহার করা হয় সেখানে প্রায়ই লক্ষ্য করা যায় যে সাবান দিয়া কাপড় কাচিলে কাপড় কাচার জায়গা ছানার ন্যায় গুঁড়া গুঁড়া একপ্রকার পদার্থে ভরিয়া গিয়াছে এবং প্রচুর সাবান ব্যবহার করিয়াও **কাপড়ে যথেষ্ট ফেনা হইতেছে না**। অবস্থাটি খুবই বিরক্তিকর সন্দেহ নাই। ব্যাপার আর কিছুই নহে, কুয়ার জলে উপরে বর্ণিত ব্যাপার ঘটিয়াছে—অর্থাৎ উহাতে কিছু ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত হইয়া গিয়াছে। এরূপ জলকে **খর জল** (hard water) বলে। 'কঠিন' জলে সব কাজ সত্যিই কঠিন হইয়া পড়ে। কুয়ার জল মাটির নীচে হইতে আসিতেছে—সুতরাং লবণ দ্রবীভূত হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। আমরা শুনিয়াছি যে বিভিন্ন স্থানের জলে বিভিন্ন রকমের লবণ দ্রবীভূত

থাকে—তাহাতে কখনও স্বাস্থ্যের উপকার, কখনও বা অপকার হয়। কিন্তু উহাতে সাবানের সহিত কি শত্রুতা ঘটিল ?

সাবান হইল সোডিয়ম বা পটাসিয়ম ধাতুর লবণ। লবণ হইলেই কোনও অ্যাসিডের সহিত নিশ্চয় যোগ আছে। কিন্তু এই অ্যাসিডগুলি ঠিক সাধারণ অ্যাসিড নহে। ইহাদের তৈল বা চর্বি জাতীয় পদার্থে পাওয়া যায়, সেজন্য ইহাদের **জৈব অ্যাসিড** (organic acids) বলে (১১৩ পৃঃ)।

সাবানের উপাদান

যে জলে ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেট দ্রবীভূত আছে সেই জলে সাবান দিলে সাবানের সহিত জলের মিলনে আসল পরিষ্করণ ক্রিয়া না ঘটিয়া সাবানের সহিত ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেটের রাসায়নিক ক্রিয়া হইতে থাকে এবং ইহার ফলে ক্যালসিয়মের সহিত সাবানের জৈব অ্যাসিড-ঘটিত লবণ সৃষ্টি হইতে থাকে। এই লবণ জলে অদ্রবণীয় এবং ইহাকেই গুঁড়া গুঁড়া আকারে আমরা কাপড় কাচিবার স্থানে পূর্বে লক্ষ্য করিয়াছি। এইভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম সাবানের সহিত ক্রিয়ায় তলায় পড়িয়া দূরীভূত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত সাবানের স্বাভাবিক কাজে বিঘ্ন ঘটে এবং ফেনা উৎপন্ন হইতে পারে না। ইহাই হইল খর জলে সাবান কাচার অসুবিধার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা।

অস্থায়ী খর জল কিরূপে মৃদু করা যায়

ক। **সাবানের সাহায্যে**—তাহা হইলে ধর উপরোক্ত প্রকার **কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ খর** জল লইয়া যদি কাপড় কাচা যায় তাহা হইলে কিছু সাবান বৃথা ব্যয় হওয়ার পর ঐ জল যখন ক্যালসিয়ম-মুক্ত হইবে তখন আবার উহাতে ফেনা উঠিবে। তখন জল আর খর রহিল না—ইহার খরতা দূর হইয়া **মৃদু জলে** (soft water) পরিণত হইল।

খ। **জল ফুটানো**—কিন্তু সাবান অপচয় করিয়া এরূপে খর জলকে মৃদু জলে পরিণত করা কোনও কাজের কথা নহে। **সাবান ব্যবহারের পূর্বেই** খর জলকে মৃদু জলে পরিণত করিতে হইবে। আলোচ্য ক্ষেত্রে ইহার ব্যবস্থা খুব সহজ এবং একটু চিন্তা করিলেই তোমরা ইহার উপায় বাহির করিতে পারিবে।

অস্থায়ী খরতা

উপায় হইল **দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম লবণকে অদ্রবণীয় লবণে পরিণত করা** এবং ঐ জলকে থিতাইয়া বা পরিস্রুত করিয়া বিশুদ্ধ করা। তোমরা পূর্বেই শিখিয়াছ—ক্যালসিয়ম বাই-কার্বনেটকে ফুটাইলে পুনরায় ক্যালসিয়ম কার্বনেট (অদ্রাব্য) উৎপন্ন হয়। এই প্রকার খর জল যাহাকে শুধু ফুটাইয়া মৃদু জলে পরিণত করা যায় তাহাকে অস্থায়ী খর জল এবং এই প্রকার খর অবস্থাকে **অস্থায়ী খরতা** (temporary hardness) বলে। ম্যাগনেশিয়ম বাই-কার্বনেট যুক্ত জলও এরূপ অস্থায়ী খর জল।

স্থায়ী খর জল কিরূপে মৃদু করা যায়

কিন্তু যখন ক্যালসিয়ম বা ম্যাগনেশিয়মের **সালফেট বা ক্লোরাইড লবণগুলি** জলে দ্রবীভূত থাকে তখন ফুটাইয়া ইহাদের খরতা দূর করিবার কোনও উপায় নাই। এরূপ খরতাকে **স্থায়ী খরতা** (permanent hardness) বলে। ইহা দূর করিবার নানা প্রকার উপায় আছে। নীচে তাহাদের বর্ণনা করা হইল :—

১। **সাবানের সাহায্যে**—ইহাতে যে সাবানের অপচয় ঘটে তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে।

২। **কাপড়-কাচা সোডার সাহায্যে**—খর জলে যথেষ্ট পরিমাণ কাপড় কাচিবার সোডা দিয়া নাড়িয়া দাও, সাদা তলানি যাহা পড়িবে তাহাকে পরিস্রবণ করিয়া সরাইয়া দাও। এখন পরিস্রুত জল মৃদু জলে পরিণত হইয়াছে।

উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম বা ম্যাগনেশিয়ম লবণের সহিত সোডিয়াম কার্বনেটের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া **অদ্রবণীয় ক্যালসিয়ম বা ম্যাগনেশিয়ম কার্বনেট** উৎপন্ন হয় এবং পাত্রের তলায় নিক্ষিপ্ত হয়। সোডিয়ম (বা পটাশিয়ম) লবণ জলে খরতা আনিতে পারে না কারণ ইহাদের সহিত সাবানের জৈব অ্যাসিডের যোগে যে লবণ হয় তাহারা দ্রবণীয় বলিয়া জলের মধ্যেই থাকে—কাজেই সাবানে ফেনা হইতে কোনও বাধা হয় না।

৩। **বাজার-চলন প্রক্রিয়া** (commercial process)—এই
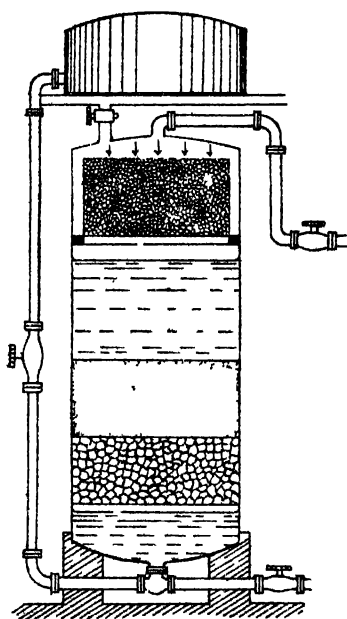
চিত্র নং ১৩৬ : পারমুটিট প্রক্রিয়ায় খর জল মৃদু জলে পরিণত হইতেছে—উপরে নীচে নুড়ির স্তর

প্রক্রিয়াগুলি বেশী পরিমাণ খর জল মৃদু করিতে ব্যবহৃত হয়। ইহাদের মূল নীতি একই—অর্থাৎ বিশেষ কোনও ধাতব লবণ ব্যবহার করিয়া দ্রবীভূত ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেশিয়ম লবণগুলিকে অদ্রবণীয় লবণে পরিণত করা। এখানে একটি প্রক্রিয়ার বর্ণনা করা যাইতেছে—

পারমুটিট (Permutit) বা জিয়োলাইট (Zeolite) প্রক্রিয়া—

পারমুটিট বলিয়া একপ্রকার সোডিয়ম ও এলুমিনিয়ম ঘটিত লবণ একটি জলাধারে ভর্তি করিয়া উহার মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে খর জল চালিত করা হয় (জিয়োলাইট একই লবণ, তবে ইহা স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিতে পাওয়া যায়, কিন্তু পারমুটিট কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত)। পূর্বের পদ্ধতিতে ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেশিয়ম পারমুটিটের সহিত রাসায়নিকভাবে যুক্ত হইয়া যায় এবং পারমুটিটের সোডিয়ম আসিয়া ক্যালসিয়ম বা ম্যাগনেশিয়মের স্থান অধিকার করে। বাজার-চলন প্রক্রিয়ায় অল্প খরচে অধিক কাজ করিতে হইবে। এইভাবে ক্রিয়া করিবার পর কিছুকালের মধ্যেই সমস্ত পারমুটিট ক্যালসিয়ম ও ম্যাগনেশিয়ম-পরিপৃক্ত হইয়া ইহার কার্যকারিতা হারায়—সুতরাং তখন উহা ফেলিয়া না দিয়া পুনরায় পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে পারিলে খরচ বাঁচে। এই উদ্দেশ্যে খাদ্য-লবণের দ্রবণ পারমুটিটের মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে প্রবাহিত করানো হয়। তখন পূর্বের প্রক্রিয়া বিপরীত মুখে চলে—অর্থাৎ পারমুটিটের ক্যালসিয়ম বা ম্যাগনেশিয়ম অপসারিত হইয়া

উহার স্থানে পুনরায় খাদ্য-লবণের সোডিয়ম ফিরিয়া আসে এবং পারমুটিট পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।
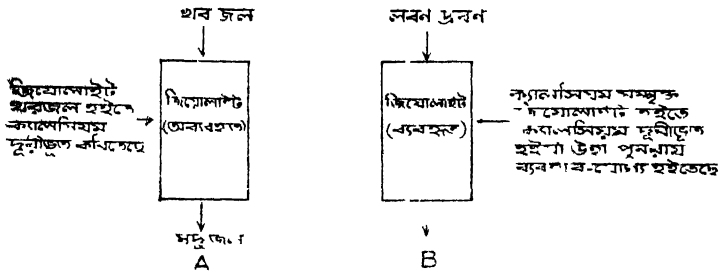
চিত্র নং ১৩৭ : খরজলের মৃদুকরণে জিযোলাইট যে ভাবে বার বার ব্যবহৃত হয

জলের খরতার পরীক্ষা

জলের খরতা বুঝিবার জন্য স্থূলভাবে কাপড় কাচিবার পদ্ধতির উপর নির্ভর না করিয়া আরও সূক্ষ্ম পরীক্ষা করা যায়। কিছু গুঁড়া সাবান (যেমন Surf বা Lux) গরম জলে গুলিয়া সাবানের দ্রবণ প্রস্তুত কর। এইবার দুইটি পরীক্ষা-নলে সমান পরিমাণ খর ও মৃদু জল লইয়া একটি ড্রপার দিয়া ফোঁটা ফোঁটা করিয়া ঐ সাবান জল প্রত্যেকটি পরীক্ষা-নলে দাও এবং প্রত্যেকবার ভাল করিয়া নাড়িয়া দাও। এখন প্রত্যেক পরীক্ষা-নলে এইভাবে এক ইঞ্চি পরিমাণ ফেনা উৎপন্ন করিতে কিরূপ বিভিন্ন পরিমাণ সাবান জল প্রয়োজন হয় লক্ষ্য কর।

জলের খরতার সহিত আমাদের ব্যবহারিক জীবনের আরও কিছু কিছু সম্পর্ক রহিয়াছে। কেটলিতে ক্রমাগত খর জল ফোটাইতে ফোটাইতে উহার তলদেশে ক্যালসিয়ম কার্বনেটের জমাট স্তর পড়িয়া যায় এবং তখন উহার উত্তপ্ত হইবার ক্ষমতা কমিয়া যায়। **ইঞ্জিনের বয়লারে** (boiler) খর জল ব্যবহারের ফলে অনুরূপভাবে উহার ভিতরের গায়ে ঐ স্তর সঞ্চিত হইয়া পরিণামে ইঞ্জিনের কার্যশক্তি বিশেষভাবে ব্যাহত হয়। ইহার জন্য পূর্ব হইতেই

খর জলের অন্যান্য অসুবিধা

সাবধান হওয়া প্রয়োজন। কিছুদিন আগে কাগজে বাহির হইয়াছিল যে শিয়ালদহ ডিভিসনের ইঞ্জিনগুলি খরজল ব্যবহারের ফলে ধীরে ধীরে অকেজো হইয়া আসিতেছে।

অনুশীলনী (I)

১। প্রকৃতিতে চুন জাতীয় যত প্রকার পদার্থ তোমার জানা আছে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও এবং উহারা রাসায়নিকভাবে কোনটি কি শ্রেণীতে পড়ে বল। মুক্তা কি পদার্থ?

২। লবণ জলে মিশাইয়া দ্রবণটি বাষ্পীভূত করিলে লবণ ফিরিয়া পাওয়া যায়। তেমনি কলিচুন (ক্যালসিয়ম অক্সাইড) জলের সহিত মিশাইয়া দিয়া ঐ মিশ্রণ যদি বাষ্পীভূত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে পূর্বের কলিচুন ফিরিয়া পাওয়া যাইবে কি না বুঝাইয়া বল। জলে লবণ দ্রবীভূত হয়, আবার কার্বন-ডাই-অক্সাইড মিশ্রিত জলে খড়ি দ্রবীভূত হয়—উভয় প্রকার দ্রবণের প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রভেদ কি?

৩। চুনের জলের সহিত কার্বন-ডাই-অক্সাইডের ক্রিয়া বুঝাইয়া বল। উভয়ের মধ্যে ক্রিয়া সম্পূর্ণ হইলে শেষে যে পদার্থটি উৎপন্ন হইবে উহাকে (ক) ফুটাইলে, (খ) সাবান-গোলা জল দিয়া নাড়িলে কি হইবে বল।

৪। নিম্নলিখিত রাসায়নিক বিক্রিয়া (reaction) গুলির ফলে যে যে পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহাদের রাসায়নিক শ্রেণী ও ধর্ম আলোচনা কর এবং প্রত্যেক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত একটি করিয়া পদার্থের নাম কর :—

(ক) ধাতুর সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়া (reaction);

(খ) অধাতুর সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়া;

(গ) উপরোক্ত (ক) বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বস্তুর সহিত জলের ক্রিয়া;

(ঘ) উপরোক্ত (খ) বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বস্তুর সহিত জলের ক্রিয়া;

(ঙ) উপরোক্ত (ক) বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন বস্তুর সহিত অ্যাসিডের ক্রিয়া।

(গ) ও (ঘ) এ বর্ণিত বিক্রিয়ার পর প্রত্যেক পাত্রে লিটমাস দিয়া পরীক্ষা করিলে কি দেখা যাইবে?

৫। হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ও সালফিউরিক অ্যাসিডের প্রধান প্রধান ব্যবহারগুলি বর্ণনা কর। এই তিনটি অ্যাসিডের মধ্যে কোনটিকে প্রধান বলিতে পারা যায় এবং কেন? কয়েকটি জৈব অ্যাসিডের নাম কর এবং উহারা কোনটি কোথায় পাওয়া যায় বল।

৬। "নাইট্রোজেন চক্র" (Nitrogen Cycle) বলিতে কি বুঝায়? প্রকৃতিতে জীবনের লীলায় ইহার গুরুত্ব আলোচনা কর। এই চক্রে বিভিন্ন জাতীয় জীবাণু কি সাহায্য করে? "শস্য

পর্যায়" (rotation of crops) কাহাকে বলে ? "জীবাণু না থাকিলে পৃথিবীতে অন্য কোনও জীব বাঁচিতে পারিত না"—এই উক্তির সার্থকতা বুঝাইয়া বল।

৭। তিনটি পরীক্ষা নলে (ক) শুখাইয়া গুঁড়া-করা খড়ি, (খ) কলিচুন ও (গ) ক্ষারচুন রহিয়াছে, উহাদের কি কি পরীক্ষা করিয়া চিনিবে—যুক্তিসহ বল। এই পদার্থ তিনটির পরস্পরের রাসায়নিক সম্পর্ক বুঝাইয়া দাও।

৮। উদ্ভিদের জীবনে সারের প্রয়োজনীয়তা কি ? কয়েকটি বিখ্যাত সারের পরিচয় দাও। মাটি ব্যতীত চাষ কিরূপে সম্ভব দৃষ্টান্ত সাহায্যে বুঝাইয়া বল।

৯। খর জল কাহাকে বলে ? উহা ব্যবহার করিবার অসুবিধা কি ? দুইটি বিভিন্ন স্থান হইতে গৃহীত খরজলের কোনটি বেশী খর কিরূপে পরীক্ষা করিবে ?

১০। (১) অস্থায়ী ও (২) স্থায়ী খরজল মৃদু করিবার প্রক্রিয়াগুলি যুক্তিসহ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী (II)

১। নিম্নে বাম পার্শ্বের স্তম্ভে ১০টি পদার্থের নাম ও ডানদিকের স্তম্ভে উহাদের বর্ণনা (বা পরিচয়) এলোমেলোভাবে সাজানো আছে। পদার্থ ও বর্ণনাগুলি পরস্পর শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

১। মুক্তা	১। মৌলিক পদার্থ
২। অ্যামোনিয়ম সালফেট	২। ধাতু
৩। টি. এন. টি	৩। খড়ির রূপান্তর
৪। জলে কার্বন ডাই-অক্সাইডের দ্রবণ	৪। অ্যাসিড
৫। কপার সালফেট	৫। ক্ষার
৬। জিয়োলাইট	৬। খাদ্য-লবণ
৭। পারদ	৭। সার
৮। গন্ধক	৮। বিস্ফোরক পদার্থ
৯। সোডিয়ম ক্লোরাইড	৯। জল-মৃদুকারক পদার্থ
১০। পান খাইবার চুন	১০। জীবাণু-নাশক পদার্থ

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলিতে শূন্যস্থান পূরণ কর :—

(ক) ধাতুর সহিত (১) ——— এর সংযোগ ঘটিলে যে পদার্থ উৎপন্ন হয় তাহাকে ধাতব অক্সাইড বলে। যেমন (২) ———। ধাতব অক্সাইডের সহিত জল মিশাইলে (৩) ——— উৎপন্ন হয়। (৩) এর মধ্যে (৪) ——— লিটমাস দিলে উহার বর্ণ (৫) ——— হইয়া যায়। ধাতব অক্সাইডের সহিত (৬) ——— অক্সাইডের বিক্রিয়া (reaction) ঘটিলে (৭) ——— প্রস্তুত হয়। (৭) প্রশমিত পদার্থ। অধাতুর অক্সাইডের সহিত জলের সংযোগ ঘটিলে (৮) ——— প্রস্তুত হয়। (৮) এর মধ্যে (৯) ——— লিটমাস দিলে উহার বর্ণ (১০) ———হইয়া যায়।

৩। নিম্নলিখিত পদার্থগুলির রাসায়নিক নাম বল :—

(১) কাপড় কাচিবার সোডা ———

(২) খাইবার সোডা ———

(৩) সোরা ———

(৪) চুনের জল ———

(৫) ফটকিরী ———

(৬) পাথুরে চুন ———

(৭) কলিচুন ———

(৮) তুঁতে ———

(৯) খাদ্য-লবণ ———

(১০) খড়ি ———

৪। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কয়েকটি সত্য, কয়েকটি সত্য নহে ; কোনগুলি সত্য বল :—

(১) ফটকিরী বস্ত্র রঞ্জন করিতে ব্যবহৃত হয়।

(২) খর জলে সোডিয়ম বাই-কার্বনেট মিশ্রিত থাকিলে ফুটাইয়া মৃদু করা যায় না।

(৩) ব্যাক্টিরিয়া না থাকিলে পচন ঘটিতে পারিত না।

(৪) মাটি ব্যতীত উদ্ভিদ বাঁচিতে পারে না।

(৫) খর জলে সাবান দিলে কিছুতেই ফেনা হয় না।

(৬) সাবান একপ্রকার লবণ-জাতীয় পদার্থ।

(৭) আকাশে বিদ্যুৎ-চমকের ফলে নাইট্রোজেনের বন্ধন হয়।

(৮) শিম্বি-গোত্রীয় উদ্ভিদ মাটিতে চাষ করিলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়।

(৯) চুনাপাথর, খড়ি ও মার্বেল—এই তিনটি পদার্থের রাসায়নিক গঠন এক।

(১০) অগ্নি-নির্বাপকের ভিতরে সালফিউরিক অ্যাসিড ও চুনের জল থাকে।

৫। A, B, C তিনটি পাত্রে বিভিন্ন স্থানের জল রহিয়াছে; নিম্নলিখিত বর্ণনাগুলির সাহায্যে তিনটি পাত্রের জলে কি কি পদার্থ দ্রবীভূত রহিয়াছে বল :—

(১) A পাত্রে চুনের জল দিলে ঘোলাটে হইয়া গেল।

(২) B পাত্রের জল ফোটাইবার পর সাদা তলানি পড়িল।

(৩) C পাত্রে সাবান-গোলা জল দিলে তলানি পড়ে, কিন্তু উহাকে শুধু ফোটাইলে তলানি পড়ে না।

—

পঞ্চম অধ্যায়

কয়েকটি প্রাণীর গঠন বিবরণ

টোড (Toad)

পূর্ব্বে শ্রেণীতে তোমরা জীব কি, প্রাণী ও উদ্ভিদের মধ্যে প্রভেদ কি, উহাদের দৈহিক গঠন ও জৈবিক প্রক্রিয়াগুলি কিরূপ ইত্যাদি জীববিদ্যার মুল বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিয়াছ। এখানে আমরা অতি পরিচিত দুইটি প্রাণীর সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত আলোচনা করিয়া জীববিদ্যা সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে চেষ্টা করিব। এই প্রাণী দুইটি হইল **বেঙ ও মাছ**।

কুনো বেঙ

পৃথিবীর যাবতীয় বেঙজাতীয় প্রাণীকে দুইটি বৃহৎ শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়া থাকে -(ক) **বেঙ** (frog), (খ) **টোড** (toad)। আমাদের দেশে যাহাকে সোনা বেঙ বলা হয় তাহা প্রকৃত 'বেঙ' শ্রেণীতে পড়ে। কুনো বেঙ জীববিদ্যায় বেঙ শ্রেণীতে পড়ে না, ইহা হইল 'টোড' শ্রেণীর জীব। সোনা বেং প্রধানতঃ জলে থাকে ; কুনো বেং ডাঙ্গার জীব। এই কারণে এবং অন্যান্য কারণে উভয়ের মধ্যে ভিতরের ও বাহিরের গঠনে এবং জীবনযাত্রা প্রণালীতে কিছু কিছু পার্থক্য থাকিলেও মোটামুটি বেশ সাদৃশ্য আছে। এখানে আমরা কুনো বেঙের কথাই বিশেষ করিয়া বলিব। বেঙ ও টোড জীববিদ্যায় **উভচর** পর্য্যায়ে পড়ে।

বাহিরের গঠন ও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

ইহাদের দেহের স্ফীত গঠন, উঁচু ভ্রূর কোলে বাহিরের দিকে 'ঠেলা' (bulging) বড় বড় চোখ, মুখের বিরাট ব্যাদান (চোখ ছাড়াইয়া আরও পিছন পর্যন্ত বিস্তৃত), গায়ের ঢিলা চামড়া ও তাহার উপর বিষাক্ত রস-নিঃসারী কাল কাল গুটি (warts) ইত্যাদি দেখিলে সহসা ঘৃণায়

শরীর কুঞ্চিত হইয়া উঠে। জীববিদ্যার ছাত্রছাত্রীদের অবশ্য এরূপ ঘৃণা থাকিলে চলিবে না। তাহা হইলে আমরা এই সব কদর্য, নগণ্য প্রাণী সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান লাভ করিতে পারিব না।
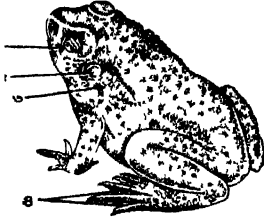
চিত্র নং ১৩৮ : কুনো বেঙ
১—চোখ, ২—কর্ণ পটহ, ৩—বিষাক্ত রস-নিঃসারী প্যারটিড গ্রন্থি, ৪—আঙুলের ফাঁকের পর্দা ; সর্বাঙ্গে গুটি লক্ষ্য কর

কুনো বেঙের দেহে ঘাড় বলিয়া কিছু নাই। তাই ঘাড় বাঁকাইয়া চারিদিক দেখার সে সুবিধা তাহার অভাব অনেক পরিমাণে ইহারা পূরণ করিয়া লয দেহের উপরিতল হইতে বেশ **উচ্চে স্থাপিত চক্ষু** দুইটির সাহায্যে। উহাদের দেহের ও পিঠের দিকের বর্ণ প্রায় মাটির মত, যাহার জন্য সহসা ইহাদের মাটির উপর লক্ষ্য করা কঠিন হয। ইহা ছাড়া বেঙ কিছু পরিমাণে আবেষ্টনীর সহিত দেহের বর্ণ পরিবর্তন করিতে পারে। বেঙ অসহায় প্রাণী—তাই এইরূপ **আত্ম-গোপনকারী বর্ণ** তাহাদের আত্মরক্ষা করিতে সাহায্য করে। জীববিদ্যায় এরূপ বর্ণকে **জীবনরক্ষী** (protective) বর্ণ বলে।

কান

আমরা সাধারণত যাহাকে কান বলি তাহা হইল প্রকৃতপক্ষে বাহিরের কান (ear trumpet)—অনেকটা চোঙার মত দেখিতে, **কর্ণপটহ** (ear drum) উহার ভিতরে শেষ প্রান্তে থাকে। বেঙের বাহিরের কান বলিয়া কিছু নাই, কর্ণপটহটি থাকে একেবারে দেহের উপরিভাগে—চক্ষুর পিছনে ; দুইটি ছোট, গোল, পাতলা টান-করিয়া-আঁটা চামড়া রূপে ইহারা চোখে পড়ে।

চক্ষু

বেঙের চোখে আমাদের চোখের ন্যায় দুই প্রকার পাতা (অবশ্য ইহাদের এই পাতা খুব কমই নডাচডা করিতে পারে) ছাডাও তৃতীয় এক জাতীয় অর্ধ-স্বচ্ছ পাতলা আবরণ আছে। ইহাকে ইচ্ছামত টানিয়া বেঙ চক্ষু মুছিতে বা উহাকে ধূলাবালি হইতে রক্ষা করিবার জন্য ঢাকা দিতে পারে। পাখীর চোখেও এই তৃতীয় পাতাটি

দেখা যায়। আমাদের চোখের কোণে ইহার সামান্য **আভাস** মাত্র পাওয়া যায়। আমরা যে বেঙ, পাখী প্রভৃতি জাতীয় জীবের বংশধর—এই অঙ্গটি তাহারই ইঙ্গিত দিতেছে। আমাদের দেহে এখন আর ইহার প্রয়োজন নাই, তাই অব্যবহারের ফলে অঙ্গটি ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছে।

বেঙের জিহ্বার গঠনেও বেশ নূতনত্ব আছে। মেরুদণ্ডী প্রাণীদের জিহ্বার ন্যায় ইহা মুখবিবরের তলদেশে, পিছন দিকে আঁটা নহে, **নীচের চোয়ালে সম্মুখের দিকে আবদ্ধ।** সুতরাং উহা মুখ হইতে বাহির করিতে হইলে **উল্টাইয়া** ছুড়িয়া দিতে হইবে—ইহাতে অনেক দূর পর্যন্ত উহাকে বিস্তৃত

জিহ্বা
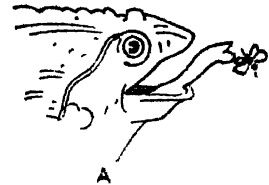
বাড়াইয়া দেওয়া যাইবে সহজেই অনুমান করা যায়। প্রয়োজন? বেঙের খাদ্যের কথা মনে কর—পোকামাকড় জাতীয় জীব। সুতরাং তাহাদের ধরিয়া মুখে পুরিতে এরূপ ব্যবস্থা সুবিধাজনক নহে কি?

চিত্র নং ১৩৯ : বেঙ জিহ্বার সাহায্যে শিকার ধরিতেছে—জিহ্বার গঠন ও উহা কি ভাবে নিম্নের চোয়ালের অগ্রভাবে সংলগ্ন আছে লক্ষ্য কর

বেঙ **অনুষ্ণশোণিত** (cold-blooded) প্রাণী। এখানে অনুষ্ণ অর্থ ঠাণ্ডা নহে।

অনুষ্ণশোণিত প্রাণী

অনুষ্ণ অর্থে ইহাই বোঝায় যে ইহাদের রক্তের **নির্দিষ্ট কোনও উষ্ণতা নাই,** যেমন আমাদের রক্তে আছে। কাজেই আবেষ্টনীর উষ্ণতার সহিত সমতা রাখিয়া চলে—ঠিক জড় পদার্থের ন্যায়। তাই ইহারা বেশী শীত বা গ্রীষ্মে কাতর হইয়া পড়ে, সেজন্য সারা শীতটাই প্রায় ইহারা মড়ার ন্যায় **শীতস্তম্ভে** (hibernation) কাটাইয়া দেয়।

শ্বসন-পদ্ধতি—বেঙের শ্বসন-পদ্ধতিতেও বেশ বিশেষত্ব আছে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে বেঙের মুখের তল ক্রমাগত ওঠানামা করিতেছে, অর্থাৎ পর্যায়ক্রমে ফুলিতেছে ও সংকুচিত হইতেছে। এইজন্যই আমরা বলি 'গলা-ফোলা কোলা বেঙ'। ইহাই বেঙের শ্বসন প্রণালী। তলদেশ নামিলে মুখগহ্বরের আয়তন বাড়ে, ফলে নাকের খোলা ছিদ্র পথে বাতাস মুখের ভিতরে প্রবেশ করে। মুখের তলদেশ উঠাইলে আবার বাতাস নাসিকাপথে বাহির হইয়া যায়। ইহার নাম **মুখবিবরের শ্বসন** (buccal respiration)। মুখবিবরের গাত্রের শ্লেষ্মঝিল্লীর (mucous membrane আবরণটি রক্তবাহ জালকে (capillaries) পূর্ণ। তাই মুখের বাতাসের অক্সিজেন শ্লেষ্মঝিল্লীর মধ্য দিয়া শোষিত হইয়া রক্তস্রোতে আসিয়া মেশে।
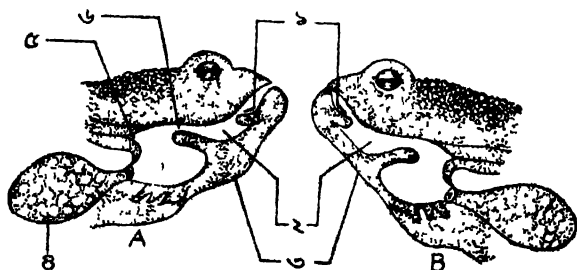
চিত্র নং ১৪০ : বেঙের ফুসফুসীয় শ্বসনের দুইটি অবস্থা

A—খোলা (১) নাসারন্ধ্র পথে বাতাস (২) মুখবিবরে প্রবেশ করিয়াছে—মুখবিবরের (৩) তল নামানো ;

B—(১) নাসারন্ধ্র বন্ধ অবস্থায় মুখবিবরের (৩) তল উঠাইলে উহার চাপে বাতাস (৪) ফুসফুসে যায়। ৫—অন্ননালী (মুখ বন্ধ) ; ৬—জিহ্বা ; উভয় অবস্থায় বেঙের মুখবন্ধ রহিয়াছে লক্ষ্য কর।

ফুসফুসের শ্বসন বেঙের বিশেষ কারণ ব্যতীত প্রয়োজন হয় না। এ ক্ষেত্রে বেঙ মুখবিবরে বাতাস টানিয়া লইবার পর **নাসিকার গর্ত বন্ধ করিয়া** মুখবিবরের তলদেশ উঠায়, ফলে শ্বাসনালীর মুখ খুলিয়া বাতাস ফুসফুসে প্রবেশ করে। পরের পর্যায়ে—বক্ষের পেশীগুলিতে চাপ দিয়া ফুসফুস সংকুচিত করে এবং অবিশুদ্ধ বাতাস মুখবিবরে আসিয়া খোলা নাসারন্ধ্র দিয়া

বাহির হইয়া যায়। উপরোক্ত কারণে জোর করিয়া মুখ খোলা রাখিলে বেঙ শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা পড়ে।

বেঙ উহার ত্বকের মধ্য দিয়াও আংশিক পরিমাণে শ্বাসকার্য চালায়। লাফাইয়া চলিতে হয় বলিয়া ইহাদের পিছনের পা দুইটি বেশ বড়। কিন্তু সাধারতঃ ডাঙ্গায় থাকে বলিয়া কুনো বেঙের আঙুলের ফাঁকের চামড়া সোনা বেঙের আঙুলের চামড়ার ন্যায় তেমন বিস্তৃত হয় না।

কেঁচো হইতে আরম্ভ করিয়া সকল উচ্চতর প্রাণীর দেহের গঠনে যে **একটি সাধারণ ভঙ্গী** রহিয়াছে তাহা হইল এই—দেহটিকে মাত্র একটি তল (plane) বরাবর **সমান দুই** ভাগে ভাগ করা যায়। এই গঠনভঙ্গীকে **দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য** (bilateral symmetry) বলে। সুষ্ঠুভাবে, শক্তিও উদ্যমের সহিত জীবনযাপন করিবার প্রয়োজনে এই গঠনভঙ্গীটি সমধিক কার্যকরী। কেঁচোর অপেক্ষা নিম্নতর শ্রেণীর জীবের মধ্যে এই গঠন-বৈশিষ্ট্য নাই—যেমন শামুক, জেলি-ফিস (Jelly-fish) ইত্যাদি।

চিত্র নং ১৪১. বেঙের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের যন্ত্রপাতি দেখানো হইয়াছে—
১—হৃৎপিণ্ড ; ২—যকৃৎ ; ৩—পিত্তথলী ; ৪—ফুসফুস ; ৫—মেদপুঞ্জ (fat body) ; ৬—অগ্ন্যাশয় ; ৭—অন্ত্র ; ৮—পাকস্থলী ; ৯—মলনালী (rectum) ; ১০—মূত্রস্থলী

আভ্যন্তরীণ গঠন—এইবার একটি বেঙের দেহ **ব্যবচ্ছেদ** (dissection) করিয়া উহার ভিতরের যন্ত্রপাতি দেখিতে হইবে। ইহার জন্য একটু বড় রকমের বেঙ লইয়া প্রথমে ক্লোরোফরমের সাহায্যে উহাকে অচৈতন্য করিয়া লইতে হইবে। এইবার উহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া গলা হইতে উদরের

তলদেশ পর্যন্ত ছুরি চালাইয়া ত্বকটিকে চিরিয়া দুই পার্শ্বে উল্টাইয়া পিন আঁটিয়া দিতে হইবে। এখন উহার ভিতরের যন্ত্রপাতি (viscera) বাহির হইয়া পড়িবে।

বেঙের দেহের আভ্যন্তরীণ গঠন সাধারণভাবে সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীর ন্যায়। ভিতরের সকল যন্ত্রগুলিই **একটি অবিচ্ছিন্ন গহ্বরের** মধ্যে অবস্থিত। মানুষের দেহে অবশ্য এরূপ দুইটি গহ্বর আছে—বক্ষের (thorax) এবং উদরের (abdomen), মধ্যে **মধ্যচ্ছদা** (diaphragm) বলিয়া একটি প্রাচীর। বেঙের দেহে মধ্যচ্ছদা নাই।
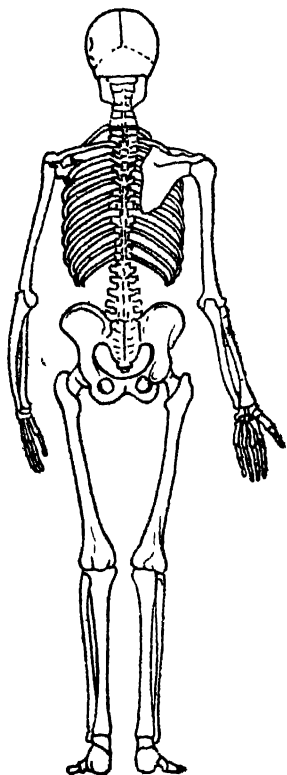
চিত্র নং ১৪২ : মনুষ্য কঙ্কাল —পশ্চাদ্ভাগ
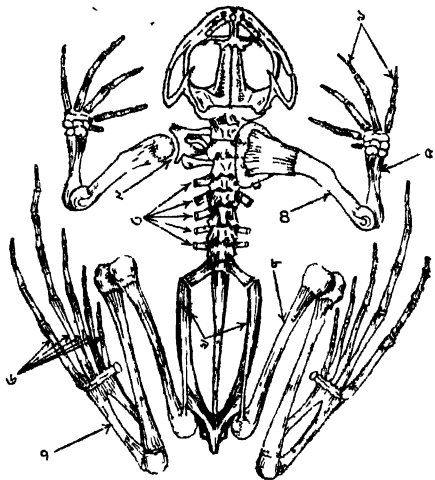
চিত্র নং ১৪৩ : বেঙের কঙ্কাল—পশ্চাদ্ভাগ : মনুষ্য-কঙ্কালের সহিত মোটামুটি সাদৃশ্য রহিয়াছে লক্ষ্য কর ; তবে পাঁজরার হাড় নাই

কঙ্কালটির গঠনভঙ্গী মোটামুটি মনুষ্য-কঙ্কালেরই ন্যায়, তবে মেরুদণ্ডে কশেরুকার (vertebra) সংখ্যা মাত্র নয়টি (মানুষের তেত্রিশটি), আর **পাঁজরার হাড়** (ribs) **নাই**।

পৌষ্টিক-নালী ও পাচনতন্ত্র সম্পর্কিত

যন্ত্রাদি এবং অন্যান্য যন্ত্রাদির গঠন ও সংস্থানভঙ্গী মূলতঃ মনুষ্যদেহের ন্যায়। মুখে পরিপাকের কোনও ব্যবস্থা নাই—প্রয়োজনও নাই, কারণ বেঙ আস্ত গিলিয়া খায় (কুনো বেঙের দাঁত নাই)। অন্যান্য যন্ত্রের মধ্যে যকৃৎটি উল্লেখযোগ্য। ইহা দুইটি পিণ্ডে (lobe) গঠিত একটি প্রকাণ্ড যন্ত্র। পিত্তাশয়টি একটি ক্ষুদ্র বর্তুলের ন্যায় (মানুষের ক্ষেত্রে লম্বা ধরণের)। ইহা হইতে পিত্ত-নলী নির্গত হইয়া অগ্ন্যাশয়ের (pancreas) ভিতর দিয়া ঘুরিয়া, উহার মধ্য হইতে নিঃসৃত পাচক রস গ্রহণ করিয়া গ্রহণীতে (duodenum) প্রবেশ করে।

বেঙের হৃৎপিণ্ড অন্যান্য উভচর প্রাণীর হৃৎপিণ্ডের ন্যায় তিন কুঠরি-বিশিষ্ট—অলিন্দ (auricle) দুইটি, **নিলয়** (ventricle) **একটি**। সুতরাং বিশুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ রক্ত পাশাপাশি নিলয়ে অবস্থান করে, কিন্তু ভিতরটি স্পঞ্জের মত কুঠরি-বিশিষ্ট বলিয়া উভয় প্রকার রক্তের মধ্যে বেশী মিশ্রণ ঘটে না। রক্তের গঠন ও সংবহন-প্রণালী মোটামুটি মনুষ্যদেহের ন্যায়, তবে শ্বেতকণিকা ও লোহিত কণিকার সংখ্যা অনেক কম।

রুই মাছ

মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মধ্যে উভচর যেমন একটি **শ্রেণী** (class), মাছও তেমনি একটি শ্রেণী। পরিষ্কার মিষ্ট জলে (অর্থাৎ লোণা নহে) যে সব মাছ বাস করে তাহাদের মধ্যে রুইমাছ বোধ হয় সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত এবং গঠন-সৌষ্ঠব ও স্বাদের দিক দিয়াও শ্রেষ্ঠ। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম—লেবিও রোহিটা (Labeo Rohita)।

বহিরাকৃতি ও কয়েকটি বৈশিষ্ট্য

সাধারণত ইহাদের ওজন ৭।৮ সের হয়; ১৫।১৬ সের রুই মাছও খুব দুর্লভ নহে। দেহের মধ্যভাগ চওড়া এবং মুখ ও লেজের দিক বেশ সুসমঞ্জসভাবে সরু হইয়া গিয়াছে। এইরূপ গঠনভঙ্গী জল কাটিয়া চলাফিরা করিবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী, কারণ জল দেহের উপরি-তলে **পিছলাইয়া** গা বাহিয়া
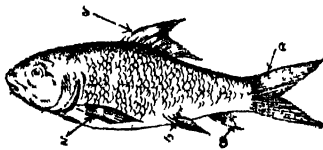
চিত্র নং ১৪৪ : রুই মাছের বাহিরের গঠন, ১—পৃষ্ঠ পাখনা, ২—বক্ষ-পাখনা, ৩—শ্রোণী (pelvic) পাখনা, ৪—পায়ু (anal) পাখনা ৫—পুচ্ছ পাখনা

পিছনে সরিয়া যায়, বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না। জলের জাহাজ, আকাশের পাখী, এরোপ্লেন প্রভৃতির গঠনও এইরূপ ভঙ্গীর। ইহাকে **ষ্ট্রীমলাইন-করা** (streamlined) গঠন বলে। মুখ হইতে কানকো পর্যন্ত দেহের
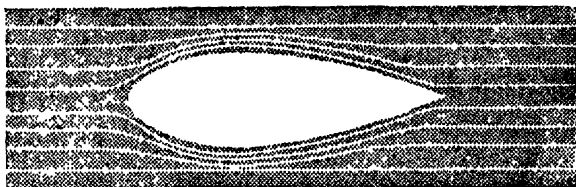
চিত্র নং ১৪৫ : ষ্ট্রীমলাইনিংএর নীতি—জল বা বাতাসের স্রোত বস্তুটির সম্মুখভাগে লাগিয়া কেমন অবাধে পিছনে সরিয়া যাইতেছে লক্ষ্য কর

অংশকে **মস্তক,** কানকো হইতে পায়ু পর্যন্ত অংশকে **ধড়** (trunk) এবং পিছনে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত অংশকে **লেজ** বলে। ইহাই মাছের দেহ-বিভাগের সাধারণ নিয়ম।

মাথা বাদে সমগ্র দেহ গোলাকার আঁইশের দ্বারা আবৃত। আঁইশগুলি ছাদের টাইলের ন্যায় একটির নীচে আর একটি আংশিক ভাবে প্রবিষ্ট হইয়া **মাথা হইতে লেজের দিকে** সাজানো। তাই উল্টাদিকে অর্থাৎ লেজ হইতে মাথার দিকে হাত বুলাইলে আঁইশের কিনারাগুলি উঁচু হইয়া হাতের গতিকে বাধা দিবে। মাথাটি ত্রিভুজাকৃতি এবং মুখটি মাথার ঠিক অগ্রভাগে না হইয়া কিছু নীচের দিকে অবস্থিত। মুখের দুই পার্শ্বে একটি করিয়া শুঁড় (barbel) থাকে, ইহারা একপ্রকার স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। মাথার অগ্রভাগে দুইটি **নাসারন্ধ্র**; ইহাদের সহিত কিন্তু মুখবিবরের বা **শ্বাস-কার্যের কোনও সংযোগ নাই**—ইহারা ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের কাজ করে মাত্র। বৃহৎ গোলাকার চক্ষুর সাধারণ ধরণের **কোনও পাতা নাই,** কিন্তু এক-প্রকার স্বচ্ছ আবরণ উহাদের সর্বদা ঢাকিয়া রাখে, সুতরাং চক্ষু খোলা দেখায়। দেহের উভয় পার্শ্বে, প্রায় মাঝামাঝি, একটি সুস্পষ্ট রেখা লম্বালম্বি মাথা হইতে লেজ পর্যন্ত চলিয়া গিয়াছে। ইহা কতকগুলি ছিদ্রের সমাবেশে গঠিত; ইহাদের সহিত ত্বকের নীচেই সংজ্ঞাবাহী কোষের (sensory cells) যোগ রহিয়াছে। জলের মধ্যে কোনও আন্দোলন বা চাপের তারতম্য

ইহাদের সাহায্যে মাছ অনুভব করিতে পারে। ইহাদের **পার্শ্ব-রেখা** (lateral line) বলে। সুতরাং ইহা মাছের স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।

মাছের চলাফেরা

রুই মাছের দেহে পাঁচ রকমের **পাখনা** (fins) আছে (১৪৪ নং চিত্র) —কতকগুলি একক, কতকগুলি জোড়া। এগুলি অনেকটা হাতপাখার মত ; কতকগুলি শক্ত সরু হাড়ের কাঠিকে পাশাপাশি সাজাইয়া, উহাদের পাতলা চামড়া দিয়া জুড়িয়া গঠিত।

আমাদের যেমন হাত-পা, পাখীর যেমন ডানা ও লেজ, নৌকার যেমন দাঁড় ও হাল, এই পাখনাগুলিও মাছের পক্ষে তেমনি। ইহারা মাছকে জলের মধ্যে ইচ্ছামত চলাফেরা করিতে সাহায্য করে। এই প্রয়োজনে লেজ ও **লেজের পাখনাটি** (caudal fin) বিশেষ কাজ দেয়।

সাঁতার দেওয়া

চলিবার সময় মাছটিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে উহা লেজটিকে এদিক ওদিক সঞ্চালিত করিয়া জলকে ঠেলা দিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে আগাইয়া যাইতেছে—নৌকা অনেক সময় শুধু হালটিকে যেভাবে ব্যবহার করিয়া অগ্রসর হয়। এই ঠেলার প্রবল শক্তিতে মাছ কখনও কখনও জল ছাড়িয়া শূন্যে লাফাইয়া উঠে।

চিত্র নং ১৪৬ : মাছের সাঁতার কাটিবার ভঙ্গী ; সোজা চলিবার জন্য লেজ ও মাথা বিপরীত দিকে ঘুরিয়া থাকে লক্ষ্য কর

চলিতে চলিতে দিক পরিবর্তন করা প্রয়োজন হয়। ইহার জন্য মাছেরা ব্যবহার করে বক্ষের দুই পার্শ্বের এক জোড়া পাখনা—বক্ষ-পাখনা (pectoral fins)—ঠিক দাঁড়ের ভঙ্গীতে অর্থাৎ যে দিকে ফিরিতে হইবে সেইদিকের পাখনাটিকে প্রায় স্থির রাখিয়া অপরদিকের পাখনাটিকে জোরে সঞ্চালিত করে। অপর পাখনাগুলি মাছকে জলে দেহ খাড়া (অর্থাৎ পিঠ উপরের দিকে) রাখিয়া চলিতে সাহায্য করে—অনেকটা সাইকেলে ভারসমতা রক্ষা করার ন্যায় (balancing)। একটি মরা মাছকে জলে ছাড়িয়া লক্ষ্য করিলে জীবন্ত মাছের দেহে এই পাখনাগুলির প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিবে।

দিক পরিবর্তন ও ভারসমতা রক্ষা

আভ্যন্তরীণ গঠন

পৌষ্টিক নালী—পৌষ্টিক নালীতে বৃহৎ মুখটির পরই **মুখবিবর** (buccal cavity), পরে ফ্যারিংক্স (pharynx) হইয়া অন্ননালী ও অন্ননালীর পর পাকস্থলী। পাকস্থলীটিকে স্বতন্ত্র অঙ্গ বিবেচনা না করিয়া অন্ত্রেরই প্রথম অংশ যেন কিছু স্ফীতাকার হইয়াছে এইরূপ মনে করিলে ঠিক হয়। পাকস্থলীর পর প্রায় ২৮ ফুট দীর্ঘ অন্ত্র—উদরের ভিতরের গাত্রে **ধারণঝিল্লী** (পাতলা পর্দা—mesentry) দিয়া আঁটা (মনুষ্যদেহেরই ন্যায়)। মুখে **লালাগ্রন্থি নাই**—অতএব এখানে পরিপাকও হয় না, তবে শ্লেষ্মা (mucous) নিঃসরণ হইয়া খাদ্যবস্তুকে পিচ্ছিল করিয়া গিলিতে সাহায্য করে। পরিপাক প্রকৃত শুরু হয় পাকস্থলীতে এবং অন্ত্রের মধ্যে যথারীতি তার
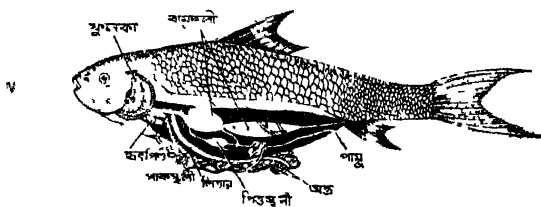
চিত্র নং ১৪৭ : কই মাছের দেহ ব্যবচ্ছেদ করিয়া ভিতরের যন্ত্রাদি দেখানো হইয়াছে

ক্রিয়া চলে। অন্ত্রের গাত্রের পাচক রস ব্যতীত যকৃৎ হইতে পিত্ত, ও অগ্ন্যাশয় (pancreas) হইতে অগ্ন্যাশয় রস একই পিত্ত-নলী (bile duct) দিয়া প্রবাহিত হইয়া অন্ত্রে আসিয়া পড়ে। অগ্ন্যাশয় বলিলে কিছু ভুল হয়, কারণ মাছের **স্বতন্ত্র অগ্ন্যাশয় নাই**, অগ্ন্যাশয়-কোষগুলি যকৃতের দেহবস্তুর মধ্যে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে এবং উহাদের মধ্য হইতে নিঃসৃত রস পিত্ত-নলীতে আসিয়া পড়ে।

বায়ুস্থলী (**swim bladder** বা **air bladder**)—রুই জাতীয় মাছের একটি বিশেষ অঙ্গের সহিত আমরা সকলেই সুপরিচিত। ইহার নাম **বায়ুস্থলী**, চলিত কথায় যাহাকে **পটকা** বলে। ইহা অন্ননালীর সহিত একটি নল দিয়া যুক্ত। ইহার দুইটি ভাগ—সামনেরটি ছোট, উভয়ের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পথে যোগ আছে। বাতাস হইতে প্রয়োজন মত কার্বন-ডাই-অক্সাইড,

নাইট্রোজেন ও অক্সিজেন ভর্তি হইয়া এই থলিটি কখনও প্রসারিত, কখনও সংকুচিত হয় এবং এইভাবে মাছ জলের মধ্যে উহার দেহের ঘনত্ব (density) বাড়াইয়া বা কমাইয়া ইচ্ছামত নীচে বা উপরে উঠিতে পারে। রুই মাছে ইহা আংশিক পরিমাণে শ্বাসযন্ত্রেরও কাজ করে।

মাছের শ্বসন (respiration)

মাছ জলচর প্রাণী, বেঙ উভচর। বেঙের দেহে ত্বক ব্যতীত **মুখ ও ফুসফুসের সাহায্যে** যে শ্বসনের ব্যবস্থা দেখিয়াছি তাহা উহার জলাবাসে কাজ দিলেও মূলতঃ উহা স্থলের জীবনেরই শ্বসন ব্যবস্থা—কারণ বেঙ জলের মধ্যেও প্রধানতঃ নাক জাগাইয়া ভাসিয়াই কাটায়। ত্বক অবশ্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন কাজে লাগাইতে পারে। কিন্তু মাছের জীবন সম্পূর্ণ জলের মধ্যে বলিয়া এই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের উপর উহাকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হয়।

জীবন্ত মাছকে জলের মধ্যে লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে (কাচের চৌবাচ্চা—aquarium—থাকিলে ইহা দেখা খুব সুবিধা) উহা উপর্যুপরি মুখ খুলিতেছে
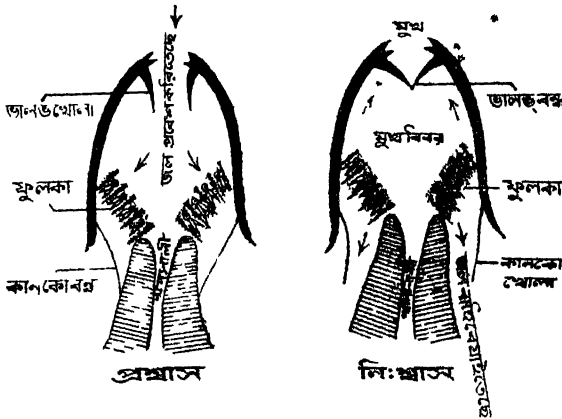
চিত্র নং ১৪। : রুই প্রভৃতি মাছের শ্বসন পদ্ধতি

ও বন্ধ করিতেছে, আর ঐ সঙ্গে পার্শ্বের কানকো (operculum) দুইটিও খুলিতেছে ও বন্ধ হইতেছে আরও ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে দেখিবে—

যখন মুখ খুলিতেছে তখন কানকো বন্ধ হইতেছে এবং মুখ বন্ধ হইলে কানকো খুলিতেছে। এই প্রক্রিয়া মাছের শ্বাসকার্য চালাইবার জন্য একান্ত আবশ্যক। কানকো দুইটির নীচে মাছের শ্বসনযন্ত্র—**ফুলকা** (gills) রহিয়াছে। ইহারা সংখ্যায় চার জোড়া—অনেকটা দুই পার্শ্বে দাড়া-বিশিষ্ট সরু চিরুণীর ন্যায় গঠন। মাছ হাঁ করিয়া কানকো দুইটি চাপিয়া বন্ধ করিয়া ইহাদের মধ্যদেশ **বাহিরের দিকে ফুলায়**; ফলে মুখবিবরের আয়তন বড় হয় এবং সে কারণে ভিতরের দিকে একটা **টানের সৃষ্টি হয়**। ঐ টানে খোলা মুখ দিয়া জল ভিতরে প্রবেশ করিয়া ফুলকাগুলি আবৃত করে। ঐ জলে আছে অক্সিজেন—দ্রবীভূত অবস্থায়, আর ফুলকাগুলির গায়ে রহিয়াছে অসংখ্য সূক্ষ্ম প্রাচীর-বিশিষ্ট রক্তবাহ জালক (capillaries)। ঠিক ফুসফুসে যেমন, এখানেও তেমনি (১) জলের অক্সিজেন ও (২) জালকের মধ্যস্থ রক্তস্রোতের কার্বন-ডাই-অক্সাইড—উভয়ের মধ্যে স্থান বিনিময় ঘটে।
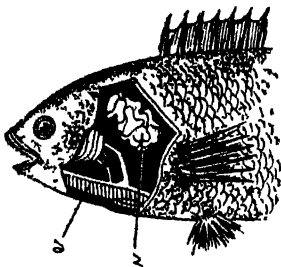
চিত্র নং ১৪৯ : (২) কই মাছের অতিরিক্ত শ্বাসযন্ত্র—ইহার সাহায্যে এই জাতীয় মাছ সরাসরি বাতাস হইতে অক্সিজেন লইয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে, (১) ফুলকা

দ্বিতীয় অবস্থায় মাছ (১) মুখ বন্ধ করে, (২) ফুলকার ফাঁক (gill cleft) খুলিয়া দেয় আর (৩) কানকো দুইটি পাশ হইতে মুখবিবর ও ফ্যারিংক্সের উপর চাপ দেয়—ফলে ভিতরের জলের উপর চাপ পড়িয়া উহা ফুলকার ফাঁকের মধ্য দিয়া বাহির হইয়া যায়। ১৪৮ নং ছবিতে ব্যাপারটি স্পষ্ট হইবে। মুখ বন্ধ করিবার প্রক্রিয়াটি সাধারণ ভালভের (valve) নীতিতে ঘটে অর্থাৎ জল মুখ দিয়া বাহির হইবার জন্য যত বেশী চাপ দিবে ততই ভালভটি ছড়াইয়া পড়িয়া মুখের ফাঁক জোরে বন্ধ করিয়া দিবে।

খাদ্যগ্রহণ

এখানে দুইটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে—

মুখ দিয়া মাছের আহার্য ও শ্বাসগ্রহণ দুই কাজই চলে।

সুতরাং পরস্পরের কাজে যাহাতে বাধা সৃষ্টি না হয় সেজন্য দেখিতে হইবে যেন—(১) শ্বাসকার্যের জন্য গৃহীত জল অন্ননালীতে না ঢুকিয়া যায়, আর (২) ঐ জলের সঙ্গে গৃহীত কঠিন খাদ্যবস্তু বা অন্য কোনও পদার্থ ফুলকার কোমল অঙ্গে আঘাত সৃষ্টি না করিতে পারে। প্রথম উদ্দেশ্যে শ্বাসগ্রহণের সময় অন্ননালীর মুখ একটি মাংসপেশীর আংটা দ্বারা (oesophagal sphincter) দৃঢ়ভাবে বন্ধ থাকে। দ্বিতীয় উদ্দেশ্যে—পূর্বেই বলা হইয়াছে ফুলকাগুলির ভিতরের দিকে (মুখবিবরের দিকে) চিরুণীর দাঁড়া বা আমাদের দাঁতের মত কতকগুলি বস্তু (gill rakers) থাকে—উহারা পরস্পর জুড়িয়া ছাঁকনির জালকের ন্যায় ছড়াইয়া পড়িয়া কোনও বৃহৎ, কঠিন বস্তুকে ফুলকার গাত্রের সংস্পর্শে আসিতে বাধা দেয়।

মাছের খাদ্যগ্রহণ ব্যাপারে প্রশ্বাসের (inspiration) জলের সহিত খাদ্যবস্তু মুখবিবরে প্রবেশ করে এবং নিঃশ্বাসের (expiration) সহিত অন্ননালীর আংটা খুলিয়া গিয়া খাদ্যবস্তুসহ জল পাকস্থলীতে প্রবেশ করে।

রক্তসংবহন

মাছের রক্তসংবহন ব্যবস্থা মনুষ্যদেহের অপেক্ষা সরল। এখানে ক্ষুদ্রতর সংবহন চক্রটি নাই অর্থাৎ ফুলকার মধ্যে রক্ত বিশোধিত হইয়া আর হৃৎপিণ্ডে ফিরিয়া আসে না। ঐ স্থান হইতেই **পৃষ্ঠ-এওর্টা** (dorsal aorta) দিয়া শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়াইয়া পড়ে। হৃৎপিণ্ডে মাত্র একটি অলিন্দ ও একটি নিলয়। নিলয় হইতে একটি **অঙ্ক-এওর্টা** (ventral aorta) উদ্ভূত হইয়া অন্তর্বাহী (afferent) ধমনীর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া ফুলকার মধ্যে প্রবেশ করে এবং বিশোধিত রক্ত পৃষ্ঠ-এওর্টা ও পরে বহির্বাহী (efferent) রক্তবাহ-তন্ত্রের মধ্য দিয়া শরীরের কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ করিয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ড হইয়া ফুলকার মধ্যে ফিরিয়া আসে। সুতরাং মাছের ক্ষেত্রে হৃৎপিণ্ড সব সময়েই **অবিশুদ্ধ** রক্তে পূর্ণ থাকে। সাধারণ ভাবে, মনুষ্যদেহে যেমন সামনের দিক (anterior side) ও পিছনের দিক (posterior side), প্রাণিদেহে তেমনি পিঠের দিক (**পৃষ্ঠ-** বা dorsal) ও পেটের দিক (**অঙ্ক-** বা

ventral)—এইভাবেই দেহের যন্ত্রগুলির অবস্থান বিবেচনা করা হয়; কারণ মানুষ দেহ খাড়া রাখিয়া হাঁটে, জীবজন্তু দেহ ভূমির সহিত সমান্তরাল রাখিয়া চলে। আর এখানে অন্তর্বাহী অর্থে যে ফুলকার অভিমুখী, ও বহির্বাহী অর্থে—ফুলকার বিপরীত-মুখী, তাহাও বোধ হয় স্পষ্ট হইয়াছে।

অনুশীলনী (I)

১। বেঙের বাহিরের গঠনের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ও উহার জীবনধারণের প্রয়োজনে এই বৈশিষ্ট্যগুলির বিশেষ উপযোগিতা বুঝাইয়া দাও।

২। বেঙের আহারগ্রহণ প্রণালী এবং এই সম্পর্কে বিশেষ করিয়া উহার জিহ্বার গঠন ও কাজ বর্ণনা কর।

৩। বেঙ কি কি বিভিন্ন উপায়ে শ্বাসগ্রহণ করিতে পারে বর্ণনা কর। মানুষের শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতির সহিত বেঙের শ্বাসগ্রহণ পদ্ধতির মূল প্রভেদ কি দেখিতে পাও?

৪। মানুষের দেহের ভিতরের গঠন বৈশিষ্ট্যের সহিত তোমার যে মোটামুটি পরিচয় আছে তাহা স্মরণ করিয়া বেঙের আভ্যন্তরীণ গঠনের সহিত উহার তুলনা কর।

৫। কই মাছের একটি চিত্র আঁকিয়া উহার দেহের যে যে অঙ্গ ও গঠন-বৈশিষ্ট্য উহাকে জলের মধ্যে চলাফিরা করিতে সাহায্য করে সেইগুলি বর্ণনা কর। এই সম্পর্কে বায়ুস্থলী ও উহার কাজ বুঝাইয়া বল।

৬। মাছ ও বেঙের মুখ জোর করিয়া খুলিয়া রাখিলে উহারা মারা পড়ে—এই উক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও।

৭। মাছের শ্বসন-পদ্ধতি বর্ণনা কর এবং উহার সহিত বেঙের শ্বসন-পদ্ধতির তুলনা কর। উভয়ের শ্বসন-পদ্ধতিতে যে মূল পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করিয়াছ তাহার কারণ কি? এই সম্পর্কে ফুসফুস ও ফুলকার গঠন ও কার্যের তুলনা কর।

৮। মাছের দেহের অন্তর্বাহী ও বহির্বাহী ধমনীগুলির কাজ কি? মাছের হৃৎপিণ্ড সব সময় অবিশুদ্ধ রক্তে পূর্ণ থাকে—ইহার কারণ কি?

৯। মাছ জলচর ও বেঙ উভচর প্রাণী—এই কারণে উহাদের দেহের গঠনে যে যে মূল পার্থক্য নজরে পড়ে তাহাদের বর্ণনা কর।

১০। ১৪০ নং ও ১৪৭ নং চিত্রের নীচের বর্ণনাগুলি না দেখিয়া চিহ্নিত অংশগুলির কয়টিকে চিনিতে পার দেখ।

অনুশীলনী (II)

১। নিম্নের বর্ণনায় অযুক্ত স্থানগুলি পূর্ণ করিয়া বল :—

(i) বেঙ — প্রাণী। ইহার অর্থ বেঙের রক্তের কোনও — উত্তাপ নাই, — পদার্থের ন্যায় ইহার দেহের — আবেষ্টনীর — সহিত — রাখিয়া চলে। এ জন্য বেঙ বেশী — কাতর হইয়া পড়ে এবং প্রায় সারা — মড়ার ন্যায় — কাটাইয়া দেয়।

(ii) বুনো বেঙের দেহে — ও — কান বলিয়া কিছু নাই। তাই — বাবাইয়া চারিদিক দেখার যে সুবিধা তাহার অভাব বেঙ পূরণ করিয়া লয় দেহ হইতে বেশ — স্থাপিত — দুইটির সাহায্যে। — কান না থাকিলেও বেঙের — আছে এবং — পিছনে দুইটি — পাতলা — রূপে ইহারা আমাদের চোখে পড়ে।

২। (i) — খাগাইয়া যাইবার প্রয়োজনে মাছ প্রধানত: উহার — ও — পাখনাটি ব্যবহার করে। ডানদিকে ফিরিতে হইলে — দিকের পাখনাটিকে প্রায় — রাখিয়া — দিকের পাখনাটিকে জোরে নাড়ে। যাহাতে সোজা চলিতে পারে সে কারণে উহার — ও মাথা পরস্পর — দিকে থাকিয়া থাকে।

(ii) মাছের — ও — স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে। মাছের নাসার — কোনও সাহায্য করে না, — কাজ করে মাত্র, কারণ মাছ মুখের সাহায্যে — টানিয়া লইয়া উহাতে—অক্সিজেন — সাহায্যে — গ্রহণ করে।

৩। নিম্নলিখিত উক্তিগুলির কোনগুলি সত্য বল :—

(১) বেঙ কিছু পরিমাণে আবেষ্টনীর সহিত বর্ণ পরিবর্তন করিতে পারে।

(২) বেঙের চোখে তিনটি পাতা আছে।

(৩) সোনা বেঙ চোট শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

(৪) বেঙের দেহের ভিতরে বক্ষ ও উদর—এই দুই গহ্বর আছে।

(৫) বেঙের দেহকঙ্কালে পাঁজরার হাড় নাই।

(৬) মাছের চোখে কোনও পাতা নাই, এজন্য উহা সব সময় খোলা থাকে।

(৭) শ্বাসকালে মাছের মুখ খুলিবার সহিত উহার কানকো খুলিয়া যায়।

(৮) বায়ুস্থলী প্রসারিত হইলে মাছের দেহের ঘনত্বও বাড়িয়া যায়।

(৯) কই মাছের দেহে ফুলকা নাই, একপ্রকার বিশেষ শ্বাসযন্ত্র আছে।

(১০) মাছের হৃৎপিণ্ডে দুইটি আলিন্দ ও একটি নিলয়।

৪। নিম্নে বামদিকের সারির বাক্যাংশগুলি ডানদিকের সারির বাক্যাংশগুলির সহিত শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

১। প্রাণীর দেহের দ্বিপার্শ্ব প্রতিসাম্য — ১। দেহকে খাড়া রাখিয়া চলিতে সাহায্য করে।

২। মাছের দেহের পার্শ্বরেখা	২। উহাকে জল কাটিয়া চলিতে সাহায্য করে।
৩। মাছের দেহের ষ্ট্রীমলাইনিং	৩। উহার সুষ্ঠু, উদ্যমশীল জীবনযাত্রায় সাহায্য করে।
৪। বেঙের পায়ের পাতা	৪। জলের বাধা কাটাইয়া অগ্রসর হইতে সাহায্য করে।
৫। বেঙের মুখবিবরের শ্বসন	৫। উহার শ্বাসকার্যের জন্য একান্ত আবশ্যক।
৬। মাছের কান্‌কো	৬। উহার স্থলের জীবনে প্রয়োজন।
৭। রুইমাছের বায়ুস্থলী	৭। উহার স্পর্শেন্দ্রিয়ের কাজ করে।
৮। মাছের কতকগুলি পাখনা	৮। উহার শ্বাসকার্যে আংশিক সাহায্য করে।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মানব দেহ

রক্ত ও রক্ত সংবহন

(Blood and its circulation)

জীবন বলিতে সহসা যে চিত্র আমাদের মনে উদয় হয়—তাহা বোধ হয় হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন। কবির কথায় "রাত্রিদিন ধুকধুক, তরঙ্গিত দুঃখ সুখ,⋯" এই স্পন্দনের প্রতিই সঙ্কেত করিতেছে। শ্বাস না লইয়া অনেকক্ষণ এবং খাদ্য না গ্রহণ করিয়া অনেকদিন বাঁচা যায়। কিন্তু হৃৎপিণ্ডের কাজ ছাড়া মানুষ একমুহূর্তও বাঁচিতে পারে না। হৃৎপিণ্ডের কি কাজ, কেন তাহার এত প্রয়োজন এখন বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

পরবর্তী চিত্রে মনুষ্যদেহের রক্ত সংবহনের একটি ধারণা পাওয়া যাইবে—

হৃৎপিণ্ডের গঠন ও কার্য

রক্তসংবহনের মূলকেন্দ্র হইল হৃৎপিণ্ড। হৃৎপিণ্ড শক্তিশালী মাংসপেশীর দ্বারা গঠিত একটি কুঠরি বিশেষ। ইহা পর্যায়ক্রমে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে এবং এইভাবে রক্তকে পাম্প করিয়া রক্তনালগুলি (blood vessels) দ্বারা শরীরের কোণে কোণে পৌছাইয়া দিতেছে। চুল, নখ, দাঁতের উপরিভাগ প্রভৃতি কয়েকটি অংশ ব্যতীত দেহের এমন স্থান নাই যেখানে রক্তবাহী শিরা, উপশিরা পৌঁছে নাই, এমন সময় নাই যখন এই রক্ত সংবহনের কার্য স্থগিত থাকে। মাতৃজঠরে ভ্রূণের বয়স যখন ৫ মাস তখন হইতে হৃৎপিণ্ডের কাজ শুরু হইয়াছে, বিশ্রাম সেইদিন যেদিন দেহযন্ত্রের সকল কার্যের অবসান।

মানুষের হৃৎপিণ্ড লম্বালম্বি একটি প্রাচীরের দ্বারা বাম ও দক্ষিণ দুইটি প্রকোষ্ঠে বিভক্ত। প্রত্যেক প্রকোষ্ঠে আবার উপরে ও নীচে, যথাক্রমে **অলিন্দ** (auricle) ও **নিলয়** (ventricle)—দুইটি বিভাগ। এই দুইটি বিভাগ সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়, উহাদের মধ্যে একটি করিয়া বিশেষ আকৃতির

চিত্র নং ১৫০ : মনুষ্যদেহের রক্তসংবহন ব্যবস্থা, কাল বর্ণে চিত্রিত রক্তবাহগুলি শিরা ও সাদাগুলি ধমনী (কোথায় ইহার ব্যতিক্রম আছে বল); প্রতিটি যন্ত্রে বা অঙ্গে উভয় জাতীয় রক্তবাহ লক্ষ্য কর
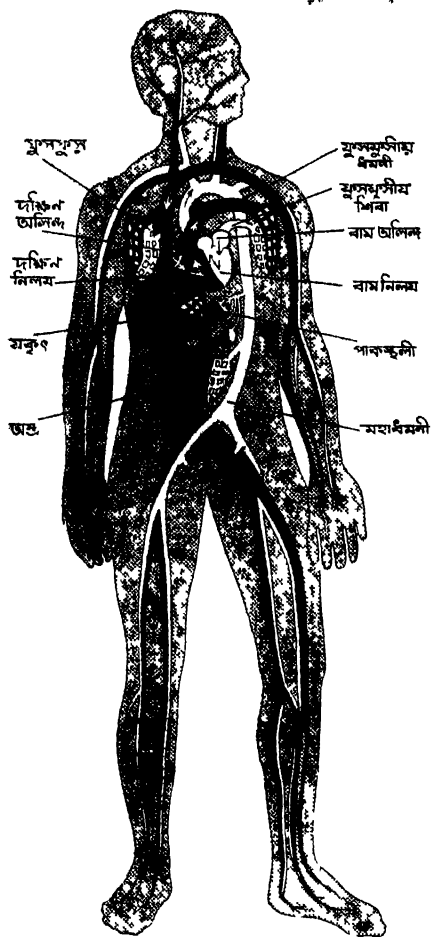
কপাটক (valve) আছে। দরজা যেমন একদিকে খোলে, এই কপাটকও তেমনি একদিকে খোলে এবং উহার মধ্য দিয়া রক্ত শুধু **অলিন্দ হইতে নিলয়ে** যাইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ ও বাম প্রকোষ্ঠের মধ্যে কোন যোগাযোগ নাই। সমগ্র রক্তসংবহন ব্যবস্থা এইরূপ—

রক্তসংবহন প্রণালী

দেহের সমস্ত কার্য সম্পন্ন করিয়া রক্ত দূষিত হইয়া দেহের উর্ধ্বভাগ ও নিম্নভাগ হইতে দুইটি বৃহৎ রক্তবাহ (blood vessel) দিয়া একটি মিলিত পথে হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে আসিয়া পড়ে। রক্তপূর্ণ হইলে ইহা আপনা হইতে সংকুচিত হয় ও উপরোক্ত কপাটক দিয়া রক্ত দক্ষিণ নিলয়ে প্রবেশ করে। এইবার দক্ষিণ নিলয় সংকুচিত হয়, ফলে রক্তে চাপ পড়ে, এই চাপের জোরে কপাটিকা সম্পূর্ণ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং রক্ত পুনরায় দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিবার

পথ না পাইয়া দক্ষিণ নিলয়ের সহিত সংযুক্ত একটি রক্তবাহ দিয়া বাহির হইয়া বক্ষগহ্বরের দুই পার্শ্বে অবস্থিত দুইটি **ফুসফুসে** (lungs) প্রবেশ করে। ফুসফুসের মধ্যে রক্ত বিশোধিত হয় এবং পরে উহাদের ভিতর হইতে দুইটি রক্তবাহ দিয়া বাহির হইয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রবেশ করে—কিন্তু এবার বামপার্শ্বের অলিন্দে। পূর্বের ন্যায় রক্তপূর্ণ হইলে এই অলিন্দ যখন সংকুচিত হয় তখন মধ্যের খোলা কপাটিকা দিয়া রক্ত বাম নিলয়ে আসে এবং বাম নিলয় সংকুচিত হইলে রক্ত পূর্বের ন্যায় বাম অলিন্দে ফিরিতে না পারিয়া (কারণ মধ্যের কপাটিকা বন্ধ হইয়া যায়) বাম নিলয়ের সহিত সংযুক্ত **এওর্টা** (aorta) নামে একটি বৃহৎ রক্তবাহ দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাহিরে আসে এবং অসংখ্য শাখাপ্রশাখায় বিভক্ত হইয়া দেহের সবত্র পরিচালিত হয়। দেহ-যন্ত্রের কার্যাবলী হইতে উদ্ভূত সমুদয় দূষিত পদার্থ বহন করিয়া পূর্বোক্ত দুইটি রক্তবাহ দিয়া দূষিত রক্ত আবার হৃৎপিণ্ডের দক্ষিণ অলিন্দে ফিরিয়া আসে এবং উপরে বর্ণিত ক্রিয়াগুলির পুনরাবৃত্তি চলিতে থাকে। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে যে বুঝিবার সুবিধার জন্য হৃৎপিণ্ডের কার্যগুলি যেন একটির পর একটি ঘটিতেছে —এভাবে বর্ণনা করিলেও প্রকৃতপক্ষে **দুই পার্শ্বের অলিন্দ এবং নিলয় একই সঙ্গে সংকুচিত ও প্রসারিত হইতেছে** অর্থাৎ উহাদের দুইপার্শ্বের ক্রিয়াগুলি যে একই সঙ্গে ঘটিয়া যাইতেছে মনে রাখিতে হইবে।
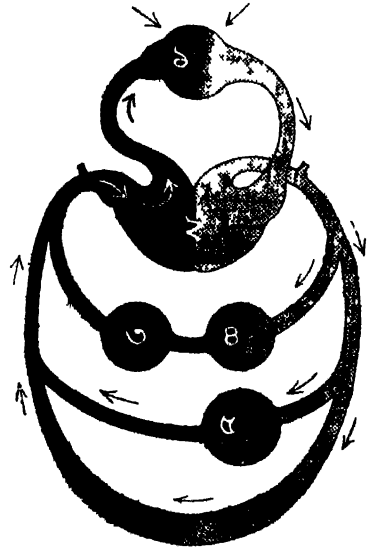
চিত্র নং ১৫১ : মনুষ্যদেহের রক্ত সংবহন প্রণালীর চার্ট ১,২—ক্ষুদ্রতর সংবহন-চক্র ; ৪,৩ ও ৫—বিভিন্ন অঙ্গে রক্তের সংবহন পথ

মনুষ্যদেহে **বৃত্তপথে** রক্তের সংবহনের যে বর্ণনা দেওয়া হইল তাহা হইতে বুঝা যাইবে যে উহার মধ্যে দুইটি স্বতন্ত্র বৃত্ত বা চক্র রহিয়াছে—

ক। হৃৎপিণ্ড হইতে ফুসফুস ও ফুসফুস হইতে পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাগমন। এই পথ কম দীর্ঘ বলিয়া ইহাকে **ক্ষুদ্রতর সংবহন** (lesser circulation) বলে ;

খ। হৃৎপিণ্ড হইতে সমগ্র দেহে পরিচালিত হইয়া পুনরায় হৃৎপিণ্ডে প্রত্যাবর্তন—এই পথ দীর্ঘতর বলিয়া ইহাকে **বৃহত্তর সংবহন** (greater circulation) বলে।

শিরা (veins) ও ধমনী (artery)

হৃৎপিণ্ডের সহিত যে কয়েকটি রক্তবাহের যোগ রহিয়াছে উহাদের এইভাবে দুইটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায়—

ক। যে গুলির মধ্য দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ডের ভিতরে প্রবেশ করিতেছে ;

খ। যাহাদের মধ্য দিয়া রক্ত হৃৎপিণ্ড হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

প্রথম প্রকার রক্তবাহগুলিকে **শিরা** ও দ্বিতীয় প্রকার রক্তবাহগুলিকে **ধমনী** বলে। সারা দেহের রক্তবাহগুলিকেও এই নিয়মে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা যাইতে পারে। এখানে প্রশ্ন উঠিবে—উহারা একই রক্তসংবহন তন্ত্রের বিভিন্ন অংশ মাত্র—উভয়ের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন যোগ রহিয়াছে। সুতরাং কোথায় উহাদের মধ্যে সীমারেখা টানিব? পার্শ্বের চিত্রটি দেখ—
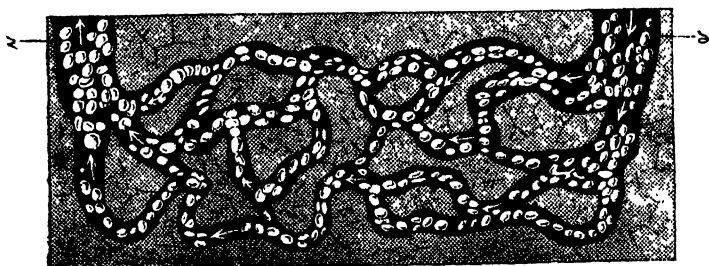
চিত্র নং ১৫২ : (১) একটি ধমনী কোনও অঙ্গে কিরূপে জালকে বিভক্ত হইয়া পুনরায় (২) শিরা রূপে উহা হইতে বাহির হইয়া যায় লক্ষ্য কর

রক্ত সরবরাহের জন্য একটি ধমনী যখন দেহের কোনও যন্ত্রে বা

অঙ্গে প্রবেশ করে তখন উহা **অতি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম রক্তবাহে বিভক্ত হয়,** যাহাতে যন্ত্র বা অঙ্গটির গভীরতর প্রদেশে রক্ত পৌঁছাইয়া দিবার
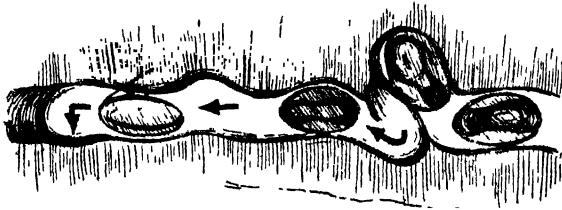
চিত্র নং ১৫৩ : ব্যাঙাচির লেজের সূক্ষ্ম এক রক্তজালকে লোহিত কণিকাগুলি কেমন এক সারিতে বাহিয়া চলিয়াছে লক্ষ্য কর

ব্যবস্থা হইতে পারে। পুনরায় ঐ রক্তবাহগুলিই একত্র হইয়া আর একটি বড় রক্তবাহে (শিরা) পরিণত হয় এবং রক্ত এই পথে ঐ যন্ত্র বা অঙ্গ হইতে বাহিরে আসে। এই সূক্ষ্ম রক্তবাহগুলি হইল—শিরা এবং ধমনীর সংযোগ-স্থল—ইহাদের **জালক** (capillaries) বলে। সুতরাং ইহাদের প্রথম অর্ধেক ধমনীর প্রবাহ এবং পরের অর্ধ শিরার প্রবাহ ধরিয়া লওয়া যায়।

চিত্র নং ১৫৪ : শিবার ভিতরে মধ্যে মধ্যে এই প্রকার ভাল্‌ভ (valve) দেওয়া আছে যাহাতে রক্ত গড়াইয়া পিছনের দিকে আসিতে না পারে ; একেবারে উপরের ভাল্‌ভটি সংকুচিত হইয়া রক্তপ্রবাহের পথ করিয়া দিয়াছে
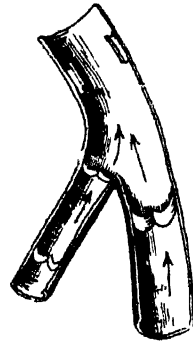
নাড়ি (pulse) দেখা

ধমনীগুলি **সাধারণতঃ** বিশুদ্ধ রক্ত এবং শিরাগুলি অবিশুদ্ধ রক্ত বহন করে। কয়েকটি বিশেষ স্থান ব্যতীত ধমনীগুলি প্রায়ই দেহের গভীর অংশে সন্নিবিষ্ট। দেহের এই কয়েকটি স্থানে—যেমন মণিবন্ধে (wrist), গলার দুই পার্শ্বে, গোড়ালির পার্শ্বে ইত্যাদি স্থানে—ধমনীর মধ্যস্থ রক্তস্রোতের স্পন্দন অঙ্গুলি দিয়া অনুভব করা যায়। এই স্থানগুলিকে **প্রেসার পয়েন্ট** (pressure points) বলে। **'নাড়ি দেখার'**

অর্থ এই রক্তস্রোতের স্পন্দন অঙ্গুলি দিয়া বাহির হইতে অনুভব করা। এই স্পন্দন হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন-জাত বলিয়া অভিজ্ঞ চিকিৎসক উহা দ্বারা হৃৎপিণ্ডের অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কিছুই বুঝিতে পারেন। সুবিধার জন্য সাধারণতঃ মণিবন্ধের ধমনীর স্পন্দনই অনুভব করা হইয়া থাকে কিন্তু উপরোক্ত যে কোনও স্থানেই এই নাড়ি দেখা চলিতে পারে।
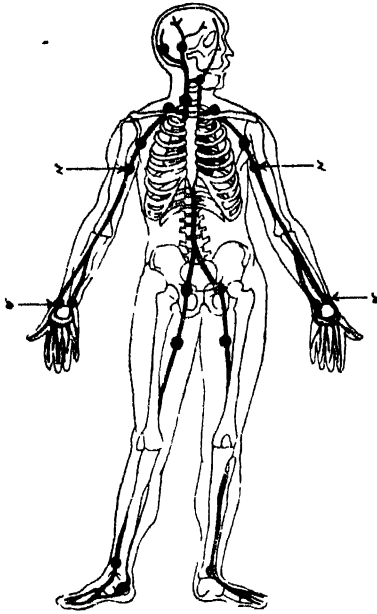
চিত্র নং ১৫৫ : শরীরের বিভিন্ন স্থানের প্রেসার পয়েন্টগুলি কাল বিন্দু আকারে দেখানো হইয়াছে ; ১—মণিবন্ধের ও ২—বগলের নীচের প্রেসার পয়েন্ট

ট্যুরনিকেট (tourniquet)

দেহের কোনও স্থান হইতে রক্তপাত হইতে থাকিলে প্রাথমিক চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করিতে হইবে? অবশ্য, প্রথমেই রক্ত বন্ধ করার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন। ইহার জন্য আহত স্থানে পুরু করিয়া পরিষ্কার রুমাল বা ন্যাকড়া পাট করিয়া কিংবা শুধু আঙ্গুল দিয়া খুব জোরে চাপিয়া ধরিতে হইবে। আঘাত অল্প হইলে ইহাতেই অল্পক্ষণের মধ্যে আহত স্থানে রক্ত জমিয়া রক্তক্ষরণ বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু আঘাত গুরুতর হইলে, বিশেষতঃ যদি কোনও ধমনী ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে **ট্যুরনিকেট** করিতে হইবে। ট্যুরনিকেটের নীতি হইল আহত স্থানের কাছাকাছি উপরের, অর্থাৎ হৃৎপিণ্ডের দিকে একটি প্রেসার পয়েন্টএ রুমাল বা কোনও কাপড় দিয়া খুব শক্ত বাঁধন দেওয়া। বাঁধন শক্ত করার জন্য একটি নুড়ি ঐ বাঁধনের মধ্যে রাখিয়া অপর পার্শ্বে একটি পেন্সিল বা বন্ধ-করা ছুরি ঢুকাইয়া প্রয়োজন মত পাক দিয়া উহাকে আটকাইয়া দিতে

হয়। শক্ত বাঁধনের প্রবল চাপে ধমনীতে রক্তপ্রবাহ বন্ধ হইয়া যায়, সুতরাং আহত স্থানে আর নূতন রক্ত আসিতে পারে না। কিন্তু ট্যুরনিকেট প্রয়োজনের অতিরিক্ত সময় কখনই ব্যবহার করা উচিত নয়—ইহাতে সংশ্লিষ্ট অঙ্গে রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া অন্য বিপদ ঘটিতে পারে।
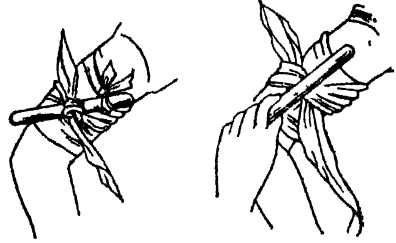
চিত্র নং ১৫৬ : রক্তপাত বন্ধ করিতে ট্যুরনিকেট বন্ধন যেভাবে প্রয়োগ করিতে হয়

রক্তের উপাদান ও কাজ

দেহে রক্তস্রোত হইল একভাবে—জীবন-স্রোত। জীবনের মূলভিত্তি এই রক্ত। জিনিসটি কি এইবার বুঝিতে চেষ্টা করা যাক—

রক্তকে খালিচোখে একটি অবিমিশ্র পদার্থ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ ইহা সেরূপ নহে। অণুবীক্ষণে দেখা যাইবে জিনিসটি একটি পীতাভ তরল পদার্থে অসংখ্য ভাসমান কণিকার সমষ্টি। তরল পদার্থটির নাম **রক্তমস্তু** (plasma) এবং কণিকাগুলির নাম **রুধির-কণিকা** (blood corpuscles)। এই কণিকাগুলির অধিকাংশ হইল এক শ্রেণীর,—ইহাদের বর্ণ লোহিত। ইহাদের লোহিত রুধির-কণিকা (red blood corpuscles বা সংক্ষেপে R. B. C.) বলে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে উহাদের মধ্যে কিছু কিছু আবার ভিন্ন জাতীয় কণিকা রহিয়াছে। ইহারা দেখিতে অন্য রকম, কিছু বড় এবং সাদা বর্ণের; ইহাদের সেজন্য শ্বেত রুধির-কণিকা (white blood corpuscles বা সংক্ষেপে W. B. C.) বলে।

এক ঘন মিলিমিটারে (ধর একটি মাঝারি আকারের আলপিনের মাথায় যতটুকু ধরে) সাধারণত ৫০ লক্ষ লোহিত রুধির-কণিকা ও ১০ হাজার শ্বেত রুধির-কণিকা দেখা যায়। সুতরাং কল্পনা কর—ইহারা আয়তনে কত ছোট। এই লোহিত কণিকাগুলির আকৃতি ডিসের মত চেপ্টা—কিনারা পুরু, মধ্যস্থল পাতলা, দুইটি প্লেন-অবতল লেন্স পিঠে পিঠে রাখিলে যেমন হয় সেই রকম। ইহাদের মধ্যে রহিয়াছে **হিমোগ্লোবিন** (haemoglobin) বলিয়া

বেগনী রংএর এক জাতীয় পদার্থ। ইহাই রক্তের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় উপাদান। **হিম** (heme) হইল লৌহযুক্ত একটি রঞ্জক পদার্থ ও **গ্লোবিন** (globin) হইল এক প্রকার প্রোটীন—যাহা ডিমের মধ্যেও রহিয়াছে। এই লৌহ হিমোগ্লোবিনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান এবং উহার সাহায্যেই হিমোগ্লোবিন বাতাসের অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হইতে পারে। রাসায়নিক সংযোগ হইলেও এই বন্ধন কিন্তু খুবই দুর্বল এবং অক্সিজেন-যুক্ত হিমোগ্লোবিন অতি সহজেই এই অক্সিজেনের পসরা শরীরের কোষে কোষে বিতরণ করিতে পারে। অক্সিজেন-যুক্ত হিমোগ্লোবিনের বর্ণ ঘোর লাল, অক্সিজেন-বিমুক্ত হিমোগ্লোবিন দেখিতে নীলাভ। দেহের কোষে কোষে অক্সিজেন সরবরাহ ছাড়াও শরীরে রক্তের অনেকগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ আছে, নীচের চার্টে উহা বুঝা যাইবে—
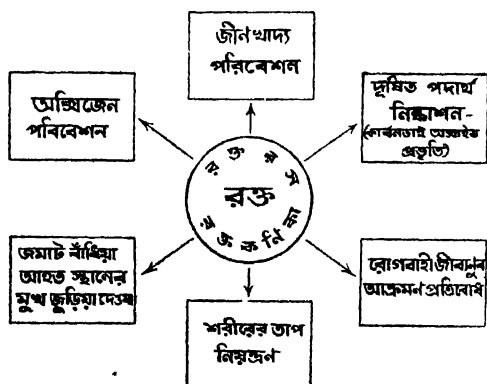
চিত্র নং ১৫৭ : রক্তের উপর শরীরের যে সব কাজের ভার দেওয়া আছে

কার্বন-ডাই-অক্সাইড ব্যতীত ঘর্ম ও মূত্র—এই দুইএর মাধ্যমে শরীরের **দূষিত পদার্থ নির্গম** হয়। উভয় ক্ষেত্রেই রক্তের জলীয় ভাগ হইতে দূষিত পদার্থগুলি ছাঁকন প্রক্রিয়ায় সংশ্লিষ্ট রেচন যন্ত্রগুলি দিয়া—অর্থাৎ ঘর্মের ক্ষেত্রে **ত্বক** (skin) ও মূত্রের ক্ষেত্রে **বৃক্ক** (kidney) দিয়া বাহির হইয়া যায়।

রক্ত নানাভাবে শরীরের **তাপ নিয়ন্ত্রণেও** সাহায্য করে—

(১) পরিশ্রম প্রভৃতি কারণে শরীরের তাপ অধিক হইলে রক্ত দেহের উপরিভাগে চলিয়া আসে (ফলে শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে)। তখন তাপ-সঞ্চলনের সাধারণ নিয়মে—**পরিচলন প্রক্রিয়ায়** (৯৬ পৃষ্ঠা)—রক্তের উত্তাপ বাতাসে ছড়াইয়া পড়ে, শরীর শীতল হয় ;

(২) চর্মে বেশী রক্ত আসার ফলে আবার ঘর্মগ্রন্থিগুলি হইতে প্রচুর **ঘর্ম নির্গত হয়**—ইহার ফলেও বাষ্পীভবন প্রক্রিয়ায় (৯৪ পৃষ্ঠা) শরীর শীতল হয় ;

(৩) রক্তের সাহায্যে দেহের উত্তাপ সর্বত্র সঞ্চালিত হইয়া দেহে **তাপ সমতা** রক্ষিত হয়।

লোহিত কণিকাগুলি (R.B.C) যেমন অক্সিজেনের বাহক, রক্তরস (plasma) তেমনি জীর্ণ খাদ্যের কণিকাগুলি বহন করিয়া কোষে কোষে পৌঁছাইয়া দেয়। সুতরাং দেখা যাইতেছে—আমরা যে খাদ্য ও অক্সিজেন গ্রহণ করি তাহা শেষ পর্যন্ত দেহসৌধের ইষ্টক এই কোষগুলিকে খাদ্য ও অক্সিজেন যোগাইবার জন্য, যাহাতে তাহারা শ্বাস গ্রহণ ও পুষ্টি লাভ করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে পারে। **তাহাদের জীবনই মিলিত ভাবে আমাদের জীবন**। ইহা ছাড়া দেখিয়াছি কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি দূষিত পদার্থগুলি এই রক্তরসের মাধ্যমেই বাহিত হইয়া বিভিন্ন পথে বাহির হইয়া যায়।

শ্বেত কণিকার কার্য

শ্বেত কণিকাগুলিকে আমরা এতক্ষণ বিবেচনাই করি নাই—কিন্তু তাই বলিয়া উহাদের কাজও অবহেলা করিবার নহে। উহারা হইল শরীরের রক্ষি-বাহিনী। বাহির হইতে কোনও জীবাণু আসিয়া দেহকে আক্রমণ করিলে উহারা আক্রান্ত স্থানে সমবেত হইয়া ঐ জীবাণুগুলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয় এবং উহাদের গ্রাস করিয়া ফেলে। শরীরের মধ্যে আমাদের অলক্ষ্যে অহর্নিশি এই যুদ্ধ চলিতেছে—শ্বেত কণিকাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে জয়ী হয় বলিয়া আমরা চারিদিকে জীবাণু-পরিবেষ্টিত হইয়াও নিশ্চিন্তে বাস করিতেছি। কিন্তু যখন এই রক্ষি-বাহিনী যুদ্ধে পরাজিত হয় তখনই শরীরে

ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করে। ক্ষতস্থানে যে **পূঁজ** নির্গত হয় তাহা যুদ্ধে নিহত এই শ্বেত কণিকাগুলির মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই নহে।
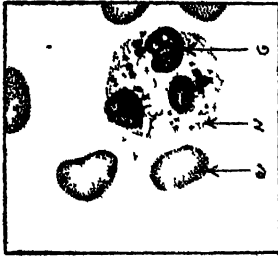
চিত্র নং ১৫৮ : একটি শ্বেত কণিকা (২) তিনটি জীবাণুকে গ্রাস করিয়াছে, অন্যান্য জীবাণুগুলি উহার চারিপাশে যুদ্ধের জন্য অপেক্ষা করিতেছে (১২০০ গুণ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে)

শ্বেত কণিকাগুলি ৬।৭ রকমের আছে। বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন প্রকারের শ্বেত কণিকা দেহরক্ষীর কাজ করে বলিয়া রোগ নির্ণয়ে (diagnosis) রক্তে বিভিন্ন জাতীয় শ্বেত কণিকার সংখ্যা নির্ণয় একটি নির্ভর যোগ্য পরীক্ষা। তোমরা একটু খোঁজ করিলে জানিতে পারিবে রক্ত পরীক্ষার রিপোর্টের ফর্মে (form) **ডিফারেনসিয়াল কাউণ্ট** (differential count) অর্থাৎ পৃথক ভাবে গণনা) বলিয়া একটি দফা (item) থাকে। ইহাতে বিভিন্ন রকমের শ্বেত কণিকাগুলির নাম দেওয়া আছে ও উহাদের সংখ্যা জ্ঞাপনের
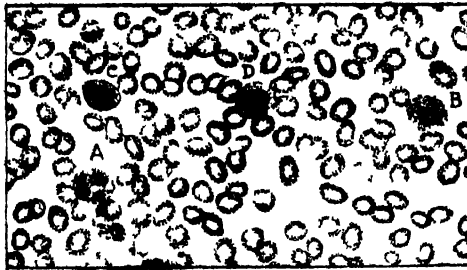
চিত্র নং ১৫৯ : রক্তে লোহিত কণিকা বেষ্টিত চারিটি শ্বেত কণিকা , A, B—জীবাণু ভক্ষক ও C, D—অন্য দুই শ্রেণী শ্বেত কণিকা

জন্য পাশে স্থান আছে। রোগীর রক্তে কোনও **বিশেষ জাতীয় শ্বেত কণিকার** সংখ্যা বাড়িয়া গেলে বুঝিতে হইবে উহার সহিত সম্পর্ক আছে এমন কোনও ব্যাধি হইয়াছে, কারণ ঐ ব্যাধির জীবাণুগুলিকে প্রতিরোধ করিবার জন্যই দেহে ঐ বিশেষ জাতীয় শ্বেতকণিকাগুলি বৃদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পরিপাক তন্ত্র

উদ্ভিদ ও প্রাণীর খাদ্যের তুলনা

উদ্ভিদের খাদ্যগ্রহণের কথা বলা হইয়াছে। আমরা দেখিয়াছি তাহাদের খাদ্য রাসায়নিক ভাবে অতি সরল পদার্থ—কার্বন-ডাই অক্সাইড, নাইট্রেট, ফসফেট, চুন প্রভৃতি লবণ, এমন কি মৌল (element) নাইট্রোজেন পর্যন্ত। কিন্তু মানুষের ক্ষেত্রে এরূপ আহার কল্পনাই করা যায় না। এই সব সরল পদার্থ উদ্ভিদ দেহে গ্রহণ করিয়া সংশ্লেষণ (synthesis) প্রক্রিয়ায় তাহাদের শ্বেতসার, চিনি, প্রোটীন, তৈল প্রভৃতি জটিল জৈব পদার্থে পরিণত করিয়া শরীরে সঞ্চিত রাখে—বিশেষ করিয়া প্রাণীদের আহারের জন্য।

মানুষের পরিপাকের ব্যবস্থাটি অন্যরূপ। ঠিক ইহার অনুরূপ ব্যবস্থা উদ্ভিদে নাই। কারণ মানুষ আহার করে উপরোক্ত জটিল উদ্ভিজ্জ পদার্থগুলি। তা ছাড়া, প্রাণিজ প্রোটীনও মানুষের খাদ্য। এই সকল খাদ্য আবার অধিকাংশই কঠিন আকারের। সুতরাং মানুষের ক্ষেত্রে একটি জটিল পরিপাক-তন্ত্রের প্রয়োজন হইয়াছে—যাহার কাজ হইল এই সব জটিল, কঠিন পদার্থকে নরম করিয়া ভাঙ্গিয়া সরলতর পদার্থে পরিণত করা এবং এই ভাবে উহাদিগকে দেহের গ্রহণোপযোগী করা।

মানুষের পরিপাক প্রণালী

মানুষের পরিপাক ক্রিয়া মুখবিবর হইতে পায়ু পর্যন্ত বিস্তৃত প্রায় ৩০ ফুট দীর্ঘ একটি নলের মধ্যে চলে। ইহাকেই **পৌষ্টিক নালী** (alimentary canal) বলে। ইহার বিভিন্ন অংশ ও উহাদের সহিত অন্যান্য পাচন-যন্ত্রগুলির (digestive organs) যোগাযোগ পরবর্তী ছবিতে স্পষ্ট হইবে।

জৈব প্রক্রিয়ায় এনজাইম (enzyme)-**এর গুরুত্ব**—মুখে খাদ্য গ্রহণের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পরিপাক ক্রিয়া শুরু হয়। প্রথমেই জিহ্বা ও দাঁতের সহযোগিতায় খাদ্যবস্তু চূর্ণীকৃত হয় এবং বিভিন্ন লালাগ্রন্থি হইতে **পাচক রস** (digestive juice) আসিয়া উহাকে জীর্ণ করিতে থাকে। এই লালারসে **টায়ালিন** (ptyalin) নামে এক প্রকার দ্রাবক পদার্থ থাকে—

জীববিদ্যায় এই শ্রেণীর পদার্থকে **এনজাইম** বলে। ইহারা প্রকৃতই অতি বিচিত্র পদার্থ। জীবদেহের অনেক কিছু রহস্যময়, দুর্বোধ্য প্রক্রিয়ার মূলেই ইহারা রহিয়াছে। জীবদেহে এ পর্যন্ত বহু সংখ্যক এনজাইমের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। পরিপাক ক্রিয়ায় ইহাদের সাহায্যেই খাদ্যের বিভিন্ন উপাদান নানা পরিবর্তনের মধ্য দিয়া শরীরের গ্রহণোপযোগী হয়। জীবদেহে যে সব রাসায়নিক পরিবর্তন দেহের সাধারণ উত্তাপে, অতি মৃদু অম্ল বা ক্ষারের সহযোগে সম্পন্ন হয়, পরীক্ষাগারে (laboratory) সেই সব পরিবর্তন সাধিত করিতে রাসায়নিককে হাজার রকমের সরঞ্জাম, কত রকমের প্রক্রিয়া, প্রচণ্ড উত্তাপ ইত্যাদির সাহায্য লইয়া গলদঘর্ম হইতে হয়। জীবদেহের
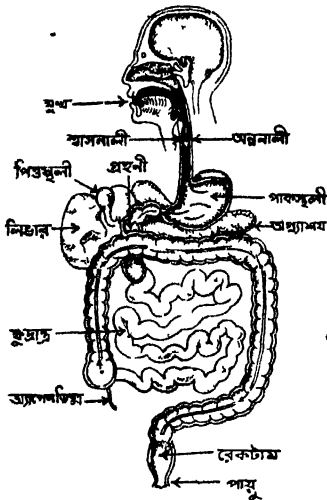
চিত্র নং ১৬০ : মানুষের পৌষ্টিক নালী ও উহার বিভিন্ন অংশ

পরীক্ষাগারের এই অসাধ্য সাধন যে **মহান বৈজ্ঞানিকের** কৃতিত্ব—তাহা হইল জীবদেহের এই এনজাইম। ইহারা প্রায়ই অতি সামান্য পরিমাণে জৈব ক্রিয়ায় অংশ গ্রহণ করে, কিন্তু ইহাদের সোনার কাঠির স্পর্শে যে সকল বিচিত্র পরিবর্তন সাধিত হয় তাহা মানুষের পরীক্ষাগারে শুধু যে কষ্টসাধ্য তাহা নহে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসাধ্য। পরীক্ষাগারে অম্লজান প্রস্তুতকরণে ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড বলিয়া একপ্রকার পদার্থের পরিচয় পাইয়াছ। ইহার **সংস্পর্শে** ঐ বিশেষ রাসায়নিক ক্রিয়াটি কিরূপ ত্বরান্বিত হয় তাহাও জানিয়াছ। 'সংস্পর্শ' বলিতেছি—কারণ এই পদার্থটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কোন প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করে না। প্রথমে যেরূপ ছিল পরেও সেই পরিমাণে এবং সেই আকারেই অপরিবর্তিত থাকে অথচ এক রহস্যময় কৌশলে তাহারা প্রক্রিয়াটির সুষ্ঠু এবং দ্রুত সম্পাদনে সাহায্য করে। জীবদেহে এনজাইম গুলির ক্রিয়াও এইরূপ, তবে ইহার অপেক্ষা বহুগুণে

বিচিত্র ও শক্তিশালী। এই প্রসঙ্গে জানিয়া রাখ—বৈজ্ঞানিকগণ অদূর ভবিষ্যতে **মানুষের দেহের জরা, ব্যাধি, মৃত্যু জয় করিবার সন্ধান** এই এনজাইম জাতীয় পদার্থের মধ্যেই খুঁজিয়া পাইবেন বলিয়া ভরসা করেন।

যাহা হউক, লালারসের এই এনজাইমের ক্রিয়ার ফলে খাদ্যের শ্বেতসার আংশিক পরিমাণে **গ্লুকোজে** (glucose) পরিণত হয়। গ্লুকোজ রাসায়নিক ভাবে এক প্রকার সরল চিনি—আঙ্গুর, বেদানা, আপেল প্রভৃতি ফলে পাওয়া যায় (আখের চিনি ইহার অপেক্ষা দুইগুণ জটিল পদার্থ)। ক্ষারের মাধ্যম ব্যতীত টাযালিন কাজ করিতে পারে না, এইজন্য লালারস ক্ষারধর্মী।

মুখবিবর হইতে এই আংশিক জীর্ণ খাদ্য অন্ননালীর (gullet) ভিতর দিয়া পাকস্থলীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। চিত্রে লক্ষ্য কর অন্ননালীটি গলার মধ্যে পিছন বরাবর নামিয়া গিয়াছে। **উহার সম্মুখ** দিয়া যে নলটি বুকের গহ্বরের মধ্যে নামিয়া গিয়াছে উহা হইল **শ্বাসনালী** (trachea)—উপরের দিকে দুইটিরই খোলা মুখ মুখগহ্বরের পিছন দিকে একই স্থানে। সুতরাং শ্বাসনালীর মুখে একটি ঢাকনা (epiglottis) আছে, উহা গিলিবার সময় আপনা হইতে বন্ধ হইয়া যায়। (তোমরা গিলিবার প্রক্রিয়াটি বিনা খাদ্যেই অনুকরণ করিয়া ব্যাপারটি অনুভব করিবার চেষ্টা করিতে পার)। তাহা সত্ত্বেও অনেক সময় তাড়াতাড়ি খাওয়ার ফলে এই ঢাকনাটি বন্ধ বা সম্পূর্ণ বন্ধ হয় না এবং খাদ্য এই ভুল পথে চলিয়া গিয়া আমাদের **'বিষম লাগে'**। তখন শ্বাসরোধ হইবার উপক্রম হয় এবং প্রবল কাসি হইয়া বিপথগামী খাদ্য শ্বাসনালী
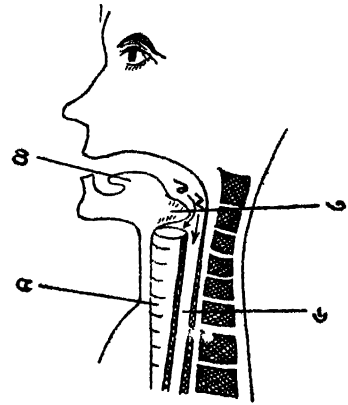
চিত্র নং ১৬১ : মুখবিবর হইতে খাদ্য যে পথে পাকস্থলীতে যায় ; ৪—জিহ্বা ; ২—অন্ননালী ও মুখবিবরের সংযোগস্থল ; ১—শ্বাসনালী ও মুখবিবরের সংযোগস্থল ; ৩—শ্বাসনালীর মুখের ঢাকনা (epiglottis) ; ৫— শ্বাসনালী ; ৬—অন্ননালী ; epiglottis অর্ধখোলা থাকিলে ১ চিহ্নিত পথে খাদ্য শ্বাসনালীতে ঢুকিয়া 'বিষম' লাগে

হইতে উৎক্ষিপ্ত হইয়া পুনরায় মুখের ভিতরে ফিরিয়া আসে। বিষম লাগা গুরুতর হইলে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে।

পাকস্থলীতে পরিপাক—পাকস্থলী মাংসপেশীর একটি ব্যাগ বিশেষ—অনেকটা ফিডিং বটলের (feeding bottle) ন্যায় গড়ন। খাদ্য পাকস্থলীতে পৌঁছিলে উহার ভিতরের গাত্রের পরিপাক গ্রন্থিগুলি (digestive glands) হইতে পাচক রস নির্গত হয়। উহাতে **পেপসিন** (pepsin) ও **রেনিন** (rennin) নামক দুইটি এনজাইম ও হাইড্রোক্লোরিক এসিড থাকে। ইতিমধ্যে পাকস্থলীতে এসিডের সংস্পর্শে টায়ালিনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া গিয়াছে এবং পেপসিন ও রেনিনের ক্রিয়া শুরু হইয়াছে। পেপসিনের কাজ হইল খাদ্যের প্রোটীনকে আংশিক রূপান্তরিত করিয়া **পেপটোন** (peptone) বলিয়া এক প্রকার সরল প্রোটীনে পরিণত করা। রেনিন দুধকে ছানায় পরিণত করে, কারণ এই অবস্থায় জারক রসগুলি উহার সহিত ভাল ভাবে মিশিয়া উহাকে জীর্ণ করিবার সুবিধা পায়। (শিশুরা দুধ খাইবার পর বমি করিলে ছানা উদ্গীর্ণ হয়—আমরা জানি)। অজীর্ণ রোগে অনেক সময় এই সহজপাচ্য **পেপটোনে পরিবর্তিত আমিষ খাদ্য** (peptonised food) খাইতে দেওয়া হয়।

পাকস্থলীর দাঁত নাই বটে, কিন্তু উহার গাত্র ক্রমাগত ঢেউয়ের ন্যায় আন্দোলিত হইয়া ভিতরের খাদ্যবস্তুকে মন্থন করিতে থাকে। পাকস্থলীর পাচক রস ও এই মন্থনের সমবেত ক্রিয়ায় খাদ্য কাদার ন্যায় নরম অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং এই অবস্থায় খাদ্যকে **পাকমণ্ড** (chyme) বলে।

পাকস্থলীর দাঁত নাই —ক্রমসংকোচ peristalsis

পাকস্থলীর গায়ের এই আন্দোলন পৌষ্টিকনালী বাহিয়া নীচের দিকে বৃহদন্ত্র পর্যন্ত চলিতে থাকে এবং ইহার ফলেই খাদ্য ধীরে ধীরে নীচের দিকে নামিতে থাকে। এই আন্দোলনকে **ক্রমসংকোচ** (peristalsis) বলে। বদ হজমে এই আন্দোলনই প্রবল হইয়া **'পেট কামড়ায়'**।

পাকস্থলীতে খাদ্য জীর্ণ হইতে থাকিলে যখন পাকমণ্ডে অম্লের মাত্রা একটা সীমা ছাড়াইয়া যায় তখন পাকস্থলীর নিম্নপ্রান্তের মুখটি (যাহা

সাধারণ অবস্থায় একটি মাংসপেশীর আংটা দ্বারা বন্ধ থাকে) খুলিয়া যায় এবং কিছু খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথমাংশে প্রবেশ করে। এই অংশের নাম **গ্রহণী** (duodenum)। এই অংশে খাদ্য পরিপাকের মাধ্যম হইল ক্ষার—যেমন মুখের মধ্যে ছিল। পাকস্থলী ও গ্রহণীর এই সংযোগ পথ কিছুক্ষণ খোলা থাকিবার পর যেমন পাকস্থলীর দিকে জীর্ণ খাদ্যের অম্লত্ব গ্রহণীর ক্ষারের সহিত মিশিয়া কমিয়া যায়, অমনি মাংসপেশীর আংটা সংকুচিত হইয়া সংযোগ-পথের মুখ বন্ধ হইয়া যায়। এইভাবে সংযোগ-পথের মুখ পর্যায়ক্রমে খুলিয়া ও বন্ধ হইয়া অল্প অল্প করিয়া জীর্ণ খাদ্য পাকস্থলী হইতে অন্ত্রে প্রবেশ করিতে থাকে। সাধারণ আহারের প্রায় ৪ ঘণ্টার মধ্যে পাকস্থলী শূন্য হয়।
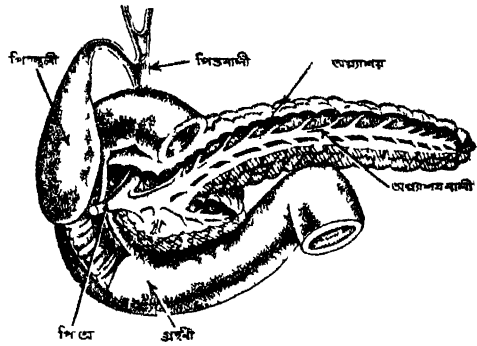
আংশিক জীর্ণ খাদ্যের গ্রহণীতে প্রবেশ

চিত্র নং ১৬৮। গ্রহণীতে খাদ্য পরিপাকের অবস্থা, পি-অ—পিত্ত নলী ও অগ্ন্যাশয়-নলী মিলিত পথে গ্রহণীতে প্রবেশ করিতেছে

ক্ষুদ্রান্ত্রে পরিপাক

এইবার জীর্ণ খাদ্য ক্ষুদ্রান্ত্রে প্রবেশ করিয়াছে। ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ—গ্রহণী, দৈর্ঘ্যে ১ ফুটের কিছু কম, বাকী অংশ প্রায় ২০ ফুট লম্বা। গ্রহণী অংশে উহার গাত্রে অনেকগুলি পরিপাক-গ্রন্থি আছে, যাহা অন্য অংশে নাই এবং এইগুলি দিয়া প্রচুর আন্ত্রিক রস নির্গত হইয়া পাকমণ্ডের উপর ক্রিয়া করিতে থাকে। তা ছাড়া, **লিভার** ও **অগ্ন্যাশয়** (pancreas) হইতে উহাদের পাচক রস আন্ত্রিক রসের সহিত মিলিত হইয়া খাদ্যবস্তুর আংশিক জীর্ণ উপাদানগুলিকে পরিপাকের শেষ স্তরে লইয়া যায়—যে অবস্থায় উহারা শরীরে শোষিত হইতে পারে।

লিভার হইতে আগত রস হইল আমাদের সুপরিচিত **পিত্তরস** (bile)। ইহা লিভারে প্রস্তুত হইয়া উহার নিম্নদেশে একটি **পিত্তস্থলী**তে (gall bladder) সঞ্চিত থাকে এবং একটি পিত্ত-নলী (bile duct) দিয়া গ্রহণীতে আসিযা পড়ে। হলুদ বর্ণের তিক্ত, ক্ষারধর্মী এই রসে কোনও এনজাইম নাই। কিন্তু ইহার এক বিশেষ ধর্মের বলে ইহা স্নেহপদার্থকে দ্রবীভূত করিতে পারে। (আমরা দেখিয়াছি যে ঘৃত, তৈল জাতীয় পদার্থ জলে বা অন্যভাবে সহজে দ্রবীভূত হইতে চায় না)। দ্রবীভূত অবস্থায় এনজাইমগুলির স্নেহপদার্থের উপর ক্রিয়া করা সহজ হয়। তা ছাড়া, পিত্তরসের জীবাণুনাশক গুণ থাকায় উহা খাদ্যের সহিত আগত অনিষ্টকারী জীবাণুগুলিকে নষ্ট করিযা এক মহা হিতকর কার্য সম্পন্ন করে।

- লিভার

গ্রহণীতে পড়িবার ঠিক পূর্বে পিত্ত-নলীর সহিত অগ্ন্যাশয়-নলী আসিয়া যুক্ত হয় এবং উভয়ে একটি মিলিত পথে উহাদের রস গ্রহণীতে ঢালিয়া দেয়। অগ্ন্যাশয় রসে থাকে অনেকগুলি এনজাইম। প্রকৃতপক্ষে, অগ্ন্যাশয়ই হইল পরিপাকতন্ত্রের সর্বপ্রধান গ্রন্থি (gland)—

(১) **অ্যামাইলেজ** (amylase) ইহা **সিদ্ধ-না-করা** (uncooked) শ্বেতসারকে মল্ট শর্করায় (maltose) পরিণত করে। (লালারসের টায়ালিন **সিদ্ধ-করা** শ্বেতসারকে এইভাবে পরিবর্তিত করিযাছিল)।

(২) **ট্রিপসিন** (trypsin)—ইহা প্রোটীনকে ও পেপটোনকে শেষ পর্যায়ে **অ্যামাইনো অ্যাসিডে** (amino-acids) পরিবর্তিত করিয়া পাকস্থলীর পেপসিনের কাজ সম্পূর্ণ করে। প্রোটীন অ্যামাইনো অ্যাসিড অবস্থায়ই শরীরে গৃহীত হয়।

(৩) **লাইপেজ** (lipase)—ইহা স্নেহদ্রব্যের উপর ক্রিয়া করিয়া উহাদের ভাঙ্গিয়া **গ্লিসারিণ** ও **স্নেহদ্রব্যজাত অ্যাসিডে** (fatty acids) পরিণত করে। (সাবান হইল এই সব অ্যাসিডের সোডিয়ম-বা পটাশিয়ম-যুক্ত লবণ—১৩০ পৃষ্ঠা)।

আন্ত্রিক রসেও অনেকগুলি এনজাইম থাকে—তাহারা প্রোটীন ও শ্বেত সারকে আংশিক জীর্ণ অবস্থা হইতে সম্পূর্ণ জীর্ণ করে অর্থাৎ যথাক্রমে

অ্যামাইনো অ্যাসিড ও গ্লুকোজে পরিণত করিয়া অগ্ন্যাশয়ের কাজে সহায়তা করে। গ্রহণী ও ক্ষুদ্রান্ত্রের প্রথম অংশ পরিপাকতন্ত্রের শেষ অংশ বলিয়া এখানে এতগুলি বিভিন্ন পাচক রসের সমাবেশের ব্যবস্থা আছে।

সুতরাং পরিপাকের ফলে খাদ্যের উপাদানগুলির শেষ পরিণাম-ফল দাঁড়াইল এইরূপ—

ক। শ্বেতসার, ইক্ষুশর্করা, দুগ্ধশর্করা—>গ্লুকোজ

খ। স্নেহদ্রব্য—>গ্লিসারিণ (glycerin) ও স্নেহ-দ্রব্যজাত অ্যাসিড (fatty acids)

গ। প্রোটীন—>অ্যামাইনো অ্যাসিড

চিত্র নং ১৬৩: ক্ষুদ্রান্ত্রের ভিতরের গাত্র কেমন ঢেউ-খেলানো লক্ষ্য কর (কেন?)

জীর্ণখাদ্য দেহমধ্যে শোষণ (absorption)—পৌষ্টিক নালীতে খাদ্যবস্তুর পরিপাক সম্পূর্ণ হইয়াছে। কিন্তু এখানেই পরিপাক তন্ত্রের কার্য সম্পূর্ণ হইল না। এইবার জীর্ণ খাদ্যকে শরীরে শোষণ করিতে হইবে। এই কার্য বিশেষ করিয়া ক্ষুদ্রান্ত্রের এবং এইজন্য ইহা দৈর্ঘ্যে এত বড় —প্রায় ২১ ফুট। শুধু তাহাই নহে। লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে উহার ভিতরের গাত্র সমতল নহে —অসংখ্য সূক্ষ্ম, উল্টানো পরীক্ষানলের বা আঙুলের ন্যায় বস্তুতে সমাকীর্ণ (অনেকটা মখমল, গালিচা বা স্নানের তোয়ালের উপরিভাগের ন্যায়)।

১ ২ ৩ ৪

চিত্র নং ১৬৪: ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্রের বিবর্ধিত চিত্র (প্রস্থচ্ছেদ); ১—ভিলাস; ২, ৩, ৪—গাত্রের বিভিন্ন শোষক স্তর

এইগুলিই হইল—শোষক-যন্ত্র, **ভিলাস** (villus, বহুবচনে villi)। এইগুলির মধ্যে অসংখ্য রক্তবাহ জালক রহিয়াছে, জীর্ণ খাদ্য ভিলাইএর গাত্র

দিয়া শোষিত হইয়া এই সব জালকের মধ্যে প্রবেশ করে ও এই ভাবে রক্তস্রোতে আসিয়া মেশে।

বৃহদন্ত্রে সাধারণত খাদ্যের জলীয় অংশ এবং কিছু পরিমাণে লবণ ও গ্লুকোজ শোষিত হয়। অনেক সময় রোগী মুখ দিয়া খাদ্য গ্রহণে অসমর্থ হইলে পায়ুর মধ্য দিয়া বৃহদন্ত্রের শেষ অংশে অর্থাৎ মলনালীতে (rectum) গ্লুকোজ ও লবণ-জল (normal saline) প্রবেশ করাইবার ব্যবস্থা করা হয়। ইহাকে **রেকটাল ফিডিং** (rectal feeding) বলে।

আত্তীকরণ (assimilation)—স্নেহদ্রব্যের জীর্ণাংশ ব্যতীত অন্যান্য জীর্ণ পদার্থগুলি অর্থাৎ অ্যামাইনো অ্যাসিড ও গ্লুকোজ শরীরের রক্তস্রোতে মিশিবার পূর্বে প্রথমে লিভারে আসে। লিভার এইগুলিকে শরীরের প্রয়োজন মত অল্প অল্প করিয়া রক্তে ছাড়িয়া দেয়। এইভাবে যদিও আমরা **মধ্যে মধ্যে বিরতি দিয়া খাদ্য গ্রহণ করি** তথাপি লিভারের সাহায্যে খাদ্যের জীর্ণাংশগুলি **একাদিক্রমে দেহে সরবরাহ হইতে থাকে**। এইগুলি কোষে কোষে পৌঁছিয়া এক অপূর্ব জৈব প্রক্রিয়ায় ঐ সব কোষের দেহবস্তুতে পরিণত হয় অর্থাৎ পেশী, স্নায়ু, অস্থি প্রভৃতিতে পরিণত হয়। স্নেহজাতীয় পদার্থের জীর্ণাংশগুলি ভিলাইএর মধ্যে **পয়স্বিনী** (lacteal) বলিয়া স্বতন্ত্র কতকগুলি নালীর (এইগুলির মধ্য দিয়া লসিকা বা lymph নামক এক প্রকার বর্ণহীন তরল পদার্থের স্রোত বর্তমান) মধ্য দিয়া শোষিত হইয়া কিছু পরে রক্তস্রোতে আসিয়া মেশে এবং শেষে মেদজাতীয় কোষে পরিণত হইয়া দেহের নানাস্থানে সঞ্চিত থাকে (মনে রাখিতে হইবে মেদ শরীরের উত্তাপে তরল অবস্থায় থাকে)।

খাদ্য

খাদ্য কাহাকে বলে

দাহ্যগুণ—জীবের দেহটিকে একটি ইঞ্জিনের সহিত তুলনা করা মামুলী ব্যাপার হইলেও তুলনাটি প্রকৃতই অতি সুন্দর। যন্ত্রের যেমন মুখ্য উদ্দেশ্য কাজ, দেহযন্ত্রেরও ঠিক তেমনিই। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত শুধু কাজ.

কাজ—নিদ্রার মধ্যেও শ্বাস-প্রশ্বাসের, হৃৎপিণ্ডের কাজের বিরাম নাই। কিন্তু কাজ করিবার জন্য শক্তি চাই, উদ্যম চাই। তাহা কোথা হইতে আসিবে? ইঞ্জিনে এজন্য কয়লা, পেট্রল বা ঐ জাতীয় ইন্ধনের ব্যবস্থা করিতে হয়। ইহারাই ইঞ্জিনের কার্যশক্তির উৎস। ইহারা বায়ু সংযোগে পুড়িয়া উত্তাপ সৃষ্টি করে এবং সেই শক্তি ইঞ্জিন চালায়। **দেহযন্ত্রের ইন্ধন খাদ্য**কেও তাই দাহ্য পদার্থ হইতে হইবে—যাহাতে উত্তাপ সৃষ্টি হইয়া দেহকে কর্মশক্তি যোগাইতে পারে।

পাচ্যগুণ (digestibility)—কিন্তু দাহ্য পদার্থ হইলেই তাহা খাদ্য হইবে না—দেখিতে হইবে উহা জীবের শরীরে জীর্ণ হয় কি না। যেমন কাগজ, মোমবাতি, চর্বি, রেড়ীর তেল ইহারা দগ্ধ হইয়া শক্তি উৎপাদন করিতে পারে বটে, মানুষের খাদ্য নহে—কারণ মানুষের পরিপাক যন্ত্রে উহারা জীর্ণ হয় না। আবার গরু, ঘোড়া, ছাগল কাঁচা ঘাসপাতা খাইয়া তাহাদের দেহের পুষ্টি সংগ্রহ করিতে পারে—তাই উহা তাহাদের খাদ্য, কিন্তু মানুষের নহে, কারণ মানুষের পাকস্থলীতে উহারা জীর্ণ হয় না। সুতরাং খাদ্য এমন বস্তু হইবে যাহা মানুষের শরীরে জীর্ণ হইয়া গৃহীত হইতে পারে। তাহার পর খাদ্যের যে যে গুণ থাকা দরকার তাহা একে একে আলোচনা করা যাক:—

খাদ্যের প্রয়োজন—বিভিন্ন উপাদান

প্রথমেই বলা হইয়াছে, শক্তি উৎপাদনের জন্য খাদ্যের দাহ্যগুণ থাকা প্রয়োজন। খাদ্যের যে সকল উপাদান দগ্ধ হইয়া দেহে উত্তাপ ও শক্তি দানে সাহায্য করে তাহারা হইল—

ক। **স্নেহদ্রব্য (fats)**—যেমন ঘৃত, তৈল, মাখন ইত্যাদি।

খ। **শ্বেতসার ও শর্করাজাতীয় পদার্থ** (carbohydrates)—যেমন চাল, আটা, আলু, গুড়, চিনি প্রভৃতি।

১০০০ গ্রাম জলের উষ্ণতা ১° সেন্টিগ্রেড বাড়াইতে যে পরিমাণ তাপের প্রয়োজন হয় তাহাকে ১ (বড়) **ক্যালরি** (Calorie বা Kilocalorie) বলে। ১ গ্রাম স্নেহদ্রব্য পুড়িয়া ৯ ক্যালরি উত্তাপ সৃষ্টি হয়, কিন্তু ১ গ্রাম

শ্বেতসার ও শর্করা জাতীয় পদার্থ পুড়িয়া মাত্র ৪ ক্যালরি উত্তাপ উৎপন্ন হয়।

গ। **প্রোটীন (proteins)**—দেহযন্ত্র অবশ্য ইঞ্জিনের অপেক্ষা অনেক জটিল বস্তু, সুতরাং তাহার প্রয়োজনও নানাবিধ। দেহযন্ত্র সর্বভাবে স্বয়ং-সম্পূর্ণ। এখানে শুধু শক্তি উৎপন্ন হইলেই চলে না। দেহের ক্ষয়পূরণ ও বৃদ্ধি—তাহাও খাদ্য হইতেই সংগ্রহ করিতে হইবে। সুতরাং সেজন্য প্রয়োজন—দেহ মূলতঃ যে উপাদানে প্রস্তুত সেই জাতীয় খাদ্য। ইহাদের প্রোটীন বলে। মাছ, মাংস, ডিম, ছানা প্রভৃতি এই প্রোটীনের পর্যায়ে পড়ে। আমাদের দেহের তন্তুগুলি—পেশী, স্নায়ু, রক্ত প্রভৃতি প্রধানতঃ এই উপাদানে গঠিত। যে এনজাইমগুলি খাদ্যের পরিপাকে এরূপ বিচিত্র ভূমিকা গ্রহণ করে, যে ভাইটামিন বিনা জীবনরক্ষা হয় না—তাহারা সকলেই প্রোটীনের শ্রেণীতে পড়ে। প্রোটীন জাতীয় খাদ্যের তাপ উৎপাদন শক্তি শ্বেতসারের সমান। **কিন্তু দেহে প্রোটীনের প্রয়োজন মূলতঃ শরীর গঠনের জন্য।**

পূর্বে বলা হইয়াছে **শ্বেতসার ও স্নেহদ্রব্যের কাজ—মূলতঃ উত্তাপ ও শক্তি সৃষ্টি।** সুতরাং ইহারা দেহে সঞ্চিত থাকে, ইহাদিগকে প্রোটীনের ন্যায় ঠিক দেহের উপাদান বলা যায় না। চর্বি থাকে সাধারণতঃ ত্বকের নীচে—দেহের উত্তাপে তরল অবস্থায়। ইহাতে শরীর বেশ নিটোল দেখায় এবং দেহের উপরিভাগে একটি অপরিবাহী (non-conducting) স্তর সৃষ্টি হইয়া শরীরকে শীতগ্রীষ্ম হইতে রক্ষা করে। শ্বেতসার ও শর্করা জীর্ণ হইয়া সঞ্চিত থাকে যকৃতের মধ্যে (প্রাণিজ শ্বেতসার—**গ্লাইকোজেন** (glycogen) আকারে) এবং আবশ্যক মত গ্লুকোজে পরিবর্তিত হইয়া রক্তস্রোতে প্রবাহিত হয়।

গ। **লবণ (salts)**—আমরা খাদ্যে লবণ জাতীয় আর এক শ্রেণীর উপাদান গ্রহণ করি। ইহারা অল্প পরিমাণে দেহের নানা তন্তুতে, বিশেষ করিয়া অস্থিতন্তুতে বর্তমান এবং শরীরের নানা গুরুত্বপূর্ণ জৈবিক প্রক্রিয়ায় নানাভাবে সাহায্য করে—ইহাদের অভাবে দেহযন্ত্রে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। যেমন অস্থিতে ক্যালসিয়ম ও ফসফরাস-ঘটিত লবণ, রক্তে লৌহ-ঘটিত লবণ ইত্যাদি। লৌহের অভাবে রক্ত উহার অক্সিজেন সরবরাহের কাজ করিতে

পারে না, আয়োডিনের অভাবে **গলগণ্ড** (goitre) বলিয়া একপ্রকার গলা-ফোলা রোগ হয়, ক্যালসিয়মের অভাবে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটে, কোথাও কাটিয়া গেলে রক্ত জমিতে বিলম্ব হয় ইত্যাদি। ফলমূল, তরিতরকারী, শাকসব্জী হইতে আমরা খাদ্যের এই লবণজাতীয় উপাদান পাইয়া থাকি। স্বাস্থ্যরক্ষার্থ ফলের সর্বজনস্বীকৃত গুণাবলী অনেক পরিমাণে নির্ভর করিতেছে—ইহার বিভিন্ন লবণজাতীয় উপাদানের উপর। বিভিন্ন-স্থানের জল যে স্বাস্থ্যবর্ধক হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে তাহারও মূলে উহাদের মধ্যস্থ বিভিন্ন লবণ। ইহা হইতেই খাদ্যে লবণজাতীয় উপাদানের গুরুত্ব বোঝা যাইবে।

ঘ। **জল**—তারপর জল। জলকে অবশ্য ঠিক সাধারণ অর্থে খাদ্য বলা চলে না, কিন্তু ইহা খাদ্যের অপরিহার্য অঙ্গ। খাদ্যদ্রব্য ইহারই সাহায্যে তরলীকৃত হইয়া শরীরের গ্রহণোপযোগী হয়। শরীরের সমস্ত রাসায়নিক ক্রিয়া জলীয় মাধ্যমে সম্পন্ন হয়, শরীরের প্রত্যেক কোষের উপাদানের একটা বড় অংশ জল। (আমাদের শরীরের ওজনের প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ হইল জল)। তা ছাড়া, দেহের যা কিছু দূষিত পদার্থ ইহার সাহায্যে ধৌত হইয়া শরীরের নানা নির্গমপথের দ্বারা বাহির হইয়া যায়। আমাদের শরীরে প্রতিদিন সাধারণতঃ প্রায় ২½ সের জলের প্রয়োজন—কিন্তু ফল, তরি-তরকারী, মাছ, মাংস, দুধ—সকল প্রকার খাদ্যে কিছু পরিমাণ জল থাকায় আবশ্যক পরিমাণ জলের সবটাই পানীয় আকারে গ্রহণ করিবার প্রয়োজন হয় না। জল তাড়াতাড়ি শীতল বা উত্তপ্ত হয় না পূর্বে দেখিয়াছি, সুতরাং শরীরের মধ্যে জল দেহের তাপ সমতা রক্ষায় সাহায্য করে।

ঙ। **রাফেজ** (roughage)—এই সকল প্রয়োজনীয় পদার্থ ছাড়াও অপ্রয়োজনীয় কিছু কিছু পদার্থ খাদ্যে বর্তমান থাকা প্রয়োজন—কথাটি শুনিতে অদ্ভুত লাগিলেও সত্য। তাই আমাদের খাদ্যে শাকপাতা, খোসাশুদ্ধ আলু কুমড়া প্রভৃতি, ভুসিশুদ্ধ আটার রুটি, ঢেঁকিছাঁটা চাল (যাহাতে উপরের পাতলা বাদামী আবরণটি নষ্ট হয় নাই) ইত্যাদি কিছু কিছু দরকার। খাদ্যের এই অপাচ্য উপাদানগুলি (১) গৃহীত খাদ্যের সমগ্র পরিমাণ (bulk) বাড়াইয়া দিয়া উদরপূর্তি ঘটাইয়া আহার তৃপ্তিপ্রদ করে

এবং (২) খস্‌খসে, ছিবড়া জাতীয় বস্তু বলিয়া স্বভাবতই পৌষ্টিক নালী হইতে জীর্ণাবশেষ রূপে বাহির হইয়া যাইবার চেষ্টা করে, ফলে কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়। কোষ্ঠ-পরিষ্কারক হিসাবে বেলের নাম সুবিদিত। রাফেজ শ্বেতসার জাতীয় পদার্থ, কিন্তু শ্বেতসার অপেক্ষা অনেক ঘনীভূত, জটিল বস্তু। ইহাদের **সেলুলোজ** (cellulose) বলে। ইহাদের বেশী পরিমাণে খাইলে অবশ্য পেট কামড়ানি ও উদরাময় রোগ হইতে পারে।

চ। **ভাইটামিন** (vitamins)—কিন্তু খাদ্যের ইতিবৃত্ত এখানেই শেষ হইল না ; ইহার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান বাদ পড়িয়া গেল। ইহাই হইল ভাইটামিন। আজকাল ভাইটামিনের নাম জানে না এরূপ লোক বিরল। A, B, C, D, E, F, K প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভাইটামিন আজ প্রকৃতি হইতে আবিষ্কার ও ল্যাবরেটরীতে প্রস্তুত করিয়া মানুষ খাদ্য ও ঔষধের সহিত ব্যবহার করিতেছে—স্বাস্থ্যলাভের জন্য। খাদ্যতত্ত্ববিদগণের মতে শুধু **বিশুদ্ধ প্রোটীন, কার্বোহাইড্রেট, স্নেহ ও লবণজাতীয় পদার্থে জীবনধারণ সম্ভব নহে**—হাজার পুষ্টিকর খাদ্য সত্ত্বেও ভাইটামিন অভাবে দেহ অনাহারেই বহিয়া যায়। তবে সাধারণতঃ খাদ্যে স্বাভাবিক অবস্থায় অন্য সব উপাদানগুলির সহিত ভাইটামিনও ওতপ্রোতভাবে মিশিয়া থাকে বলিয়া ইহাদের স্বতন্ত্রভাবে চিনিবার বা খাদ্যে ইহাদের আলাদাভাবে মিশাইবার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু কতকগুলি অবস্থায় এবং **কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বা রক্ষিত খাদ্যে** (preserved foods) ইহাদের অভাব পড়িয়া যায় এবং তখনই গণ্ডগোল বাধে। এইভাবেই খাদ্যে ভাইটামিনের অস্তিত্ব ধরা পড়ে। জীবদেহে ভাইটামিনের প্রয়োজনীয়তা এখন আর কল্পনামাত্র নহে, নানা ভাবে পরীক্ষা করিয়া ইহার অপরিহার্যতা প্রমাণিত হইয়া গিয়াছে। কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত **বিশুদ্ধ** প্রোটীন প্রভৃতি প্রয়োজনীয় খাদ্য-উপাদানগুলি কতকগুলি ইঁদুরকে খাওয়ানো হইতে লাগিল। কিছুদিনের মধ্যেই উহাদের শরীর শীর্ণ হইতে লাগিল, রোগ দেখা দিল এবং পরিণামে সকলেই মারা পড়িল। অথচ আর একটি পরীক্ষায় সামান্য ২।৪ ফোঁটা টাটকা দুধ ঐ একই খাদ্যের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ইঁদুরগুলি বেশ সুস্থভাবেই বাড়িয়া যাইতে থাকে। ২।৪ ফোঁটা দুধে পুষ্টি এমন কি বাড়িল ? নিশ্চয়ই

টাটকা দুধে এমন কিছু আছে যাহা শরীর রক্ষায় একান্ত আবশ্যক। ইহারা অ্যামাইনো এসিড (amino acid) জাতীয় পদার্থ—তাই ‘অ্যামিন’ কথাটি অন্তে বসিয়াছে, আর vita মানে জীবন, অতএব ভাইটামিন অর্থ—**জীবনরূপী অ্যামিন**।

পূর্বেই বলা হইয়াছে বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে নানা রকমের ভাইটামিন (কতকগুলির মধ্যে প্রভেদ অতি সামান্য) আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং এইগুলিকে A, B, C ..., B_1, B_2, B_3, B_{12} ইত্যাদি নানা ভাগে ভাগ করা হইয়াছে। ভাইটামিনগুলি খাদ্যে একান্ত আবশ্যক হইলেও ইহাদের ঠিক **খাদ্য বলা চলে না,** কারণ **খাদ্যের তাপ উৎপাদন বা পুষ্টিসাধন গুণ ইহাদের নাই**, ইহাদের প্রয়োজনও অতি অল্প মাত্রায়, কিন্তু এক অপূর্ব উপায়ে ইহারা অন্যান্য খাদ্য উপাদানগুলিকে শরীরের গ্রহণোপযোগী করিয়া তোলে। তাছাড়া ইহাদের নানাপ্রকার ব্যাধি ও অসুস্থতা প্রতিরোধে আশ্চর্যজনক ক্ষমতা আছে। নানাপ্রকার চক্ষুরোগ, **বেরিবেরি**, **স্কার্ভি**, (মুখের ঘা), **রিকেট** (অপুষ্ট অস্থি), রক্তাল্পতা, হৃৎপিণ্ডের দুর্বলতা, পেটের নানাপ্রকার পীড়া বিভিন্নজাতীয় ভাইটামিনের অভাবে হয় এবং ইহাদের প্রয়োগে নিবারণ হয়। (ভাইটামিনের অভাবজনিত ব্যাধিকে ইংরাজীতে **deficiency disease** বলা হয়। deficiency অর্থ অল্পতা)। এখানে মনে রাখিতে হইবে অধিকাংশ ব্যাধি জীবাণুঘটিত, কিন্তু এইগুলি নহে। দেহযন্ত্রকে ইঞ্জিনের সহিত তুলনার কথায় আমরা যদি ফিরিয়া আসি তাহা হইলে একভাবে বলা যায় ভাইটামিনগুলি হইল—**দেহ-ইঞ্জিনের ল্যুব্রিকেটিং তৈল** (lubricating oil)। যে রকম দামী ইঞ্জিনও ল্যুব্রিকেটিং তৈলের অভাবে অংশগুলির মধ্যে প্রচণ্ড ঘর্ষণে ও উত্তাপে নষ্ট হইয়া যায়। ভাইটামিনের অভাবেও তেমনি সক্ষম দেহ অল্পদিনেই বিকল হইয়া পড়ে।

সুষম খাদ্য (balanced diet) বলিতে স্বাস্থ্যানুযায়ী উপযোগী খাদ্য নির্বাচন বোঝায়—যাহাতে স্বাস্থ্যরক্ষার সব প্রয়োজনগুলি মিটিতে পারে। এরূপ খাদ্যে উপরোক্ত সব উপাদানগুলি নিশ্চয় থাকিবে এবং **উপযুক্ত অনুপাতে ও পরিমাণে** থাকিবে। সকল মানুষের খাদ্যের প্রয়োজন ঠিক সমান নহে—বয়স, জলবায়ু, বৃত্তি ইত্যাদি ভেদে খাদ্যেরও তারতম্য হইবে।

যাঁহারা বেশী কায়িক পরিশ্রম করেন তাঁহাদের শক্তি উৎপাদনের জন্য শ্বেতসার ও তৈলজাতীয় পদার্থের চাহিদা বেশী হইবে, সেইরূপ বৃদ্ধিশীল শিশু—যাহাদের দেহের ক্ষয়পূরণের প্রয়োজন মিটাইয়া আবার বৃদ্ধি সাধনও করিতে হইবে, তাহাদের প্রোটীন-জাতীয় খাদ্যের প্রয়োজন অধিক। সাধারণতঃ কমপক্ষে দেহের প্রতি কিলোগ্রাম ওজনে ১ গ্রাম প্রোটীন (অর্থাৎ দেহের ওজনের

চিত্র নং ১৬৫ : সুষম খাদ্য—একজন প্রাপ্ত বয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও ক্যালরির (তাপশক্তি) প্রয়োজন হয়

১০০০ ভাগ) প্রতিদিন খাওয়া প্রয়োজন। সুতরাং একজন সাধারণ মানুষের প্রত্যহ প্রায় ৭৫ গ্রাম প্রোটীন খাওয়া উচিত। খাদ্যের প্রকার ও প্রয়োজনীয় পরিমাণ সাধারণতঃ ক্যালরির মাপে স্থির করা হয়। দেখা গিয়াছে একজন মিতশ্রমী, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তির প্রত্যহ প্রায় ৩০০০ ক্যালরি তাপ-শক্তি আবশ্যক। সুতরাং উপরোক্ত পরিমাণ প্রোটীনের ক্যালরি হিসাব করিয়া বাকী পরিমাণ ক্যালরি স্নেহ ও শ্বেতসার জাতীয় খাদ্য হইতে সংগ্রহ করিতে হইবে। আমিষ

বা উদ্ভিজ্জ কোন জাতীয় খাদ্যের উপাদান সহজে শরীরে জীর্ণ হইবে সে সম্বন্ধে একটি সাধারণ নিয়ম এই যে—খাদ্যের উপাদানটি যদি আমাদের দেহের ঐ জাতীয় উপাদানের অনেকটা সদৃশ হয় তাহা হইলে উহা শীঘ্র শরীরে জীর্ণ হইবে, নচেৎ পরিপাকে বিলম্ব ঘটিবে। অর্থাৎ প্রাণিজ প্রোটীন এবং প্রাণিজ স্নেহপদার্থ, উদ্ভিজ্জ প্রোটীন ও উদ্ভিজ্জ স্নেহ পদার্থ অপেক্ষা অধিকতর সুপাচ্য। তাই মাছমাংসের প্রোটীন ডালের প্রোটীন অপেক্ষা সহজে জীর্ণ হয়, দুগ্ধজাত ঘৃত বনস্পতি ঘৃত অপেক্ষা সহজে শরীরে গৃহীত হয়। এমন কোনও একটি খাদ্য নাই যাহা খাইলে শরীরের সব প্রকার প্রয়োজন হিসাবমত মেটে। তবে **দুধ** এবং **ডিম**কে অনেকটা সুষম খাদ্যের কাছাকাছি ধরা যায়—এজন্য ইহাদের **আদর্শ খাদ্য** বলা যাইতে পারে।
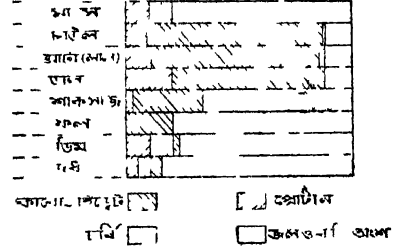
চিত্র নং ১৬৩ : বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য ও উহাদের উপাদান

উপরের চিত্রে কয়েকটি পরিচিত খাদ্যে বিভিন্ন উপাদানের অনুপাত দেখানো হইল।

গ্রামাঞ্চলে সাধারণ শ্রেণীর একজন বয়স্ক লোকের দৈনন্দিন আহারে নিম্নলিখিত পরিমাণের বিভিন্ন জাতীয় খাদ্য থাকিলে উহা মোটামুটি সুষম খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে—

প্রয়োজনীয় তাপের পরিমাণ		—	৩০০০ ক্যালরি
প্রোটীন—	মাছ, মাংস, ডিম (প্রায় ২ ছটাক)	—	১৭০
	ডাল (প্রায় ১ ছটাক)	—	১৭০
স্নেহদ্রব্য—	মাখন (প্রায় ½ ছটাক)	—	২১০
শ্বেতসার—	ঢেঁকিছাঁটা চাল (প্রায় ১০ ছটাক)	—	২০০০
	তরিতরকারী (প্রায় ৩ পোয়া)	—	৩৫০
	ফল (প্রায় ১ পোয়া)	—	১০০

উপরোক্ত খাদ্য-তালিকায় যে তরিতরকারী ও ফলের ব্যবস্থা করা হইয়াছে উহাদের মধ্য হইতে প্রয়োজনীয় লবণ ও ভাইটামিনও পাওয়া যাইবে।

অনুশীলনী (I)

১। মানুষের শরীরে যে রক্ত সঞ্চালন হয় তাহার কি কি প্রমাণ দিতে পার? অনেকক্ষণ একস্থানে দাঁড়াইয়া থাকিলে (ক) পা ভারি বোধ হয়, (খ) অনেকে মূর্চ্ছা যায়—ইহার কারণ কি ভাবিয়া বল।

২। শিরার বর্ণ নীল কেন? শিরাগুলি অবিশুদ্ধ ও ধমনীগুলি বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে—বলা হইয়া থাকে; কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দেখা যায়? ধমনীর স্রোতে স্পন্দন আছে, শিরার স্রোতে নাই, আবার শিরায় ভালভ্ (valve) আছে, ধমনীতে নাই—ইহার কারণ কি?

৩। (ক) শিরা, (খ) ধমনী কাটিয়া গেলে কোথায়, কি ভাবে বন্ধন দিয়া রক্ত বন্ধ করিতে চেষ্টা করিবে বুঝাইয়া বল। 'প্রেসার পয়েণ্ট' (pressure points) কাহাকে বলে?

৪। ক্ষুদ্রতর ও বৃহত্তর রক্তসংবহন কাহাকে বলে—বর্ণনা কর।

৫। রক্তের কাজগুলি বর্ণনা কর। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও:—

(ক) গ্রীষ্মকালে (i) দেহের উপরিভাগের শিরাগুলি ফুলিয়া উঠে।

(ii) প্রচুর ঘাম বাহির হয়।

(খ) দুর্বল রোগীর অনেক সময় হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায়।

ডিফারেনসিয়াল কাউণ্ট (differential count) কাহাকে বলে?

৬। পরিপাক ক্রিয়ায় এনজাইমগুলির গুরুত্ব বুঝাইয়া বল। কয়েকটি এনজাইমের নাম ও উহাদের কাজ বল।

৭। খাদ্যের বিভিন্ন উপাদানগুলি পরিণামে যে আকারে ও যে ভাবে শরীরে গৃহীত হয়—বর্ণনা কর। অন্ত্রের ভিতরের গাত্র ঢেউ-খেলানো হইবার কারণ কি? পেরিস্টালসিস্ (peristalsis) কাহাকে বলে?

৮। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কারণ ব্যাখ্যা কর:—

(ক) মুড়ি মুখে অনেকক্ষণ চিবাইলে মিষ্ট বোধ হয়।

(খ) লিভার খারাপ হইলে তৈলজাতীয় খাদ্য খাওয়া উচিত নহে।

(গ) খাইতে বসিয়া বেশী জল খাওয়া উচিত নহে।

(ঘ) শিশুরা দুধ খাইলে ছানা বমি করে।

৯। স্বাস্থ্যরক্ষায় লবণ ও ভাইটামিনের গুরুত্ব বুঝাইয়া বল। Deficiency disease কাহাকে বলে? ইহাদের সহিত সাধারণ ব্যাধির প্রভেদ কি?

১০। সুষম খাদ্য কাহাকে বলে? এই সম্পর্কে জল ও রাফেজের (roughage) প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া বল। বাঙ্গালীর সাধারণ খাদ্যকে সুষম খাদ্য বলা চলে কি না—আলোচনা কর।

অনুশীলনী (II)

১। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কোনগুলি সত্য বল :—

(১) হৃৎপিণ্ডের বাম ও দক্ষিণ ভাগ পর পর সংকুচিত হয়।

(২) অ্যাওর্টা বিশুদ্ধ রক্ত বহন করে।

(৩) ফুসফুসীয় শিরা অবিশুদ্ধ রক্ত বহন করে।

(৪) রক্তে বিভিন্ন প্রকার লোহিত কণিকা আছে।

(৫) শ্বেত কণিকাগুলি আকারে লোহিত কণিকাগুলি হইতে অনেক বড় এবং সংখ্যায় কম।

(৬) খাদ্য গিলিবার সময় শ্বাসনালীর মুখ একটি ঢাকনা দ্বারা বন্ধ হইয়া যায়।

(৭) পিত্তরসে কোনও এনজাইম নাই।

(৮) প্রোটিন শরীরে দগ্ধ হইয়া তাপ উৎপাদন করিতে পারে না।

(৯) ভাইটামিনগুলি অতিশয় পুষ্টিকর ও তাপ-উৎপাদক পদার্থ।

(১০) ক্ষুদ্রান্ত্রের গাত্র দিয়া জীর্ণ খাদ্য শোষিত হয় বলিয়া উহা এত দীর্ঘ।

২। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলিতে অনুক্ত স্থান পূর্ণ কর :—

(১) রক্ত সমস্ত শরীরে সঞ্চালিত হইয়া শরীরের — ও — হইতে — বৃহৎ রক্তবাহ দিয়া হৃৎপিণ্ডের — আসিয়া পড়ে।

(২) একটি — কোনও অঙ্গে প্রবেশ করিয়া সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম — বিভক্ত হয় যাহাতে উহার — প্রদেশেও খাদ্য ও — পৌঁছাইয়া দিতে পারে। এইগুলিকে — বলে। এইগুলিই — ও — মধ্যে সেতুবিশেষ।

(৩) পাকস্থলীর পাচকরসে Δ ও Δ নামে দুইটি Δ ও Δ আছে। — সংস্পর্শে টায়ালিনের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া যায়। Δ প্রোটিনকে আংশিক রূপান্তরিত করিয়া — পরিণত করে। Δ দুগ্ধকে Δ পরিণত করে।

(৪) Δ ও Δ কাজ শরীরে মূলতঃ Δ সৃষ্টি। Δ প্রয়োজন মূলতঃ Δ গঠনের জন্য। সাধারণতঃ Δ প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ Δ প্রোটীন ও স্নেহপদার্থ অপেক্ষা Δ জীর্ণ হয়। শ্বেতসার শরীরে জীর্ণ হইয়া Δ আকারে Δ সঞ্চিত থাকে।

(৫) — শরীরের নানা তন্তুতে বর্তমান। যেমন অস্থিতে — ও — ঘটিত —, রক্তে — ঘটিত —। — অভাবে অস্থি পুষ্ট হইতে পারে না, — অভাবে রক্ত জমিতে বিলম্ব হয়।

৩। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির স্থানে স্থানে তিনটি করিয়া বিকল্প (alternative) শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া আছে; উহাদের মধ্যে একটিকে বাছিয়া লইয়া বিবৃতিগুলি শুদ্ধভাবে পূরণ কর :—

(১) হৃৎপিণ্ড হইতে রক্ত — অ্যাওর্টার/ফুসফুসীয় শিরার/ফুসফুসীয় ধমনীর — মধ্য দিয়া ফুসফুসে প্রবেশ করে এবং সেখান হইতে — বহির্বাহী ধমনীর/রক্তজালকের/ফুসফুসীয় শিরার — ভিতর দিয়া হৃৎপিণ্ডের — বাম অলিন্দে/বাম নিলয়ে/দক্ষিণ অলিন্দে — ফিরিয়া আসে।

(২) রক্ত একটি — পীতাভ/নীলাভ/রক্তিম — তরল পদার্থে অসংখ্য ভাসমান কণিকার সমষ্টি। তরল পদার্থটির নাম — হিমোগ্লোবিন/প্লাজমা/পেপসিন। লোহিত কণিকাগুলি দেহে— অক্সিজেন সরবরাহের/পুষ্টিসাধনের/দেহরক্ষীর — কাজ করে। শ্বেতকণিকাগুলি দেহে — শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের/রোগজীবাণু প্রতিরোধের/দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের — কাজ করে।

(৩) লালারসে — টায়ালিন/ট্রিপসিন/গ্লাইকোজেন — বলিয়া একপ্রকার এনজাইম আছে। ইহা — প্রোটীনকে/শ্বেতসারকে/স্নেহপদার্থকে — গ্লুকোজে পরিণত করে। প্রোটীন গ্রহণীতে — লাইপেজের/ট্রিপসিনের/পেপটোনের — সাহায্যে অ্যামাইনো-অ্যাসিডে/মলটোজে/ছানায় — পরিণত হয়। স্নেহপদার্থের পরিপাকের শেষ পরিণাম ফল — রেনিন/গ্লিসারিণ/ল্যাকটীল — ও স্নেহজাত অ্যাসিড।

সহজ বিজ্ঞান

দ্বিতীয় ভাগ

প্রথম অধ্যায়

শব্দ

শব্দের উৎপত্তি

বাড়ীতে অনেক সময় খালি কাঁসার বাটিতে চামচ লাগিয়া বা দুইটি বাটিতে ঠোকাঠুকি হইয়া বাটিটি বাজিতে থাকে লক্ষ্য করিয়া থাকিবে।
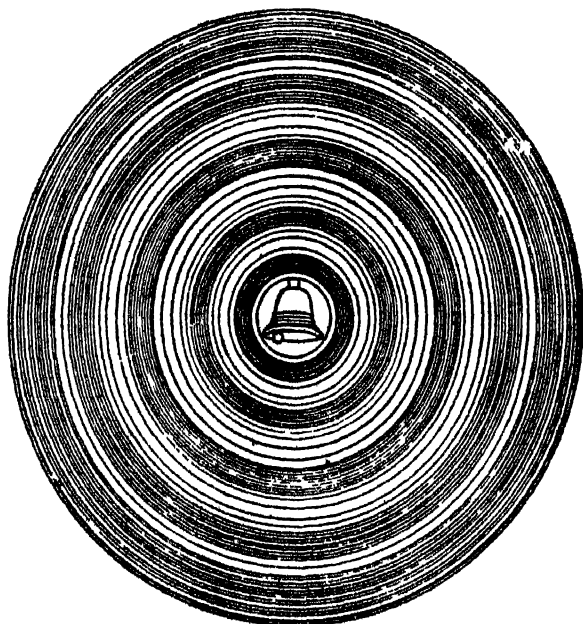
চিত্র নং ১৬৭ : একটি ঘণ্টা বাজিলে তাহার চারিধারে বায়ুমণ্ডলে একটি সংকোচন ও প্রসারণের ঢেউ ক্রমশঃ বিস্তৃত হইয়া যায়

এরূপ অবস্থায় হাত দিয়া ধরিয়া বাটিটির আওয়াজ বন্ধ করিয়া দেওয়া যায় তাহাও বোধ হয় লক্ষ্য করিয়াছ। আরও একটু লক্ষ্য করিয়া থাকিলে বোধ হয় অনুভব করিয়াছ যে বাটিটি ধরিবার সময় কম্পমান ছিল এবং ধরিবার সঙ্গে সঙ্গে যেমন কম্পন বন্ধ হইল অমনি আওয়াজও বন্ধ হইয়া গেল। স্কুলের একটি পেটা ঘণ্টা বাজাইয়াও এই ব্যাপারগুলি লক্ষ্য করা যায়।

বেহালা, সেতার, তানপুরা প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রে সুরবাঁধা তারটি ধরিয়া এক পাশে একটু টানিয়া ছাড়িয়া দিলে উহা কাঁপিতে থাকে এবং যন্ত্রটির বিশেষ সুর ঐ তারে বাজিতে থাকে। এমনি সকল শব্দ সৃষ্টির ব্যাপারে দেখা যায় যে, কোনও না কোনও বস্তু দ্রুতগতিতে কম্পিত হইতেছে। হারমোনিয়ম, পিয়ানো, গ্রামোফোন, টেলিফোন প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রেই ইহাদের মধ্যে নির্দিষ্ট কোনও অংশে এই কম্পন ঘটিয়া শব্দ সৃষ্টি হয়।
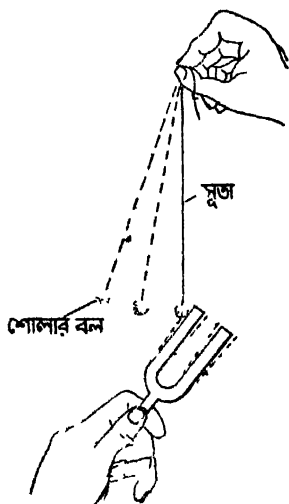
চিত্র নং ১৬৮ : টিউনিং ফর্ককে বাজাইয়া শোলার বলের গায়ে ঠেকাইলে উহা ছিটকাইয়া দূরে সরিয়া যায়

টিউনিং ফর্ক (tuning fork) বলিয়া অনেকটা খাইবার কাঁটার (fork) ন্যায় দেখিতে ইস্পাতের একপ্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়—ইহাতে পরিষ্কার ও নির্ভুল সুর বাহির হয় বলিয়া বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় ইহার ব্যবহার হয়। চিত্রে দেখ একটি টিউনিং ফর্ককে আঘাত করিয়া বাজাইয়া ঝুলন্ত একটি ছোট শোলার বলের গায়ে ঠেকাইয়া ধরায় বলটি কম্পনের ধাক্কায় ছিটকাইয়া দূরে চলিয়া যাইতেছে এবং আবার ফর্কের গায়ে ঠেকিলে বারবার ঐরূপ ঘটিতে থাকিবে।

শব্দের বিস্তারে স্থূল মাধ্যমের প্রয়োজন—একটি বস্তু স্পন্দিত হইলে শব্দ শুনি কেন ?

নিম্নের পরীক্ষাটি দেখ—

পরীক্ষা ঃ একটি বেলজারের মধ্যে একটি ইলেকট্রিক ঘণ্টা ফিট করিয়া বেলজারটিকে একটি বায়ুনিষ্কাশন যন্ত্রের প্লেটের উপর ভেসলিন দিয়া আঁটিয়া বসাও এবং পাম্প চালাইয়া বায়ু বাহির করিতে থাক। ইলেকট্রিক ঘণ্টাটিও ঐ সঙ্গে চালাইয়া দাও। দেখিবে পাম্প চালাইবার সহিত ঘণ্টার আওয়াজ ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া শেষে আর শোনা যাইবে না—অথচ লক্ষ্য করিলে দেখিবে তখনও ইলেকট্রিক ঘণ্টার হাতুড়ি ধাতুর বাটির উপর পূর্বের ন্যায় আঘাত করিয়াই চলিয়াছে। ইহা হইতে কি বুঝা গেল?
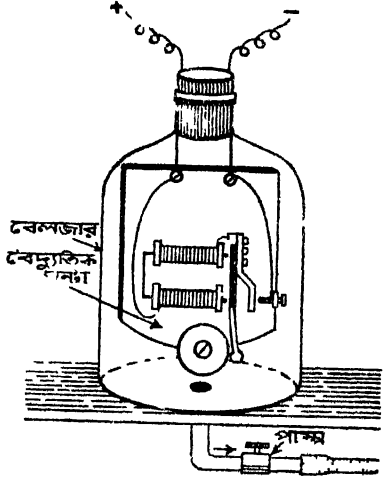
চিত্র নং ১৬৯ ঃ বেলজার হইতে বায়ু বাহির করিয়া লইলে ঘণ্টার শব্দ আর শোনা যায় না—যদিও হাতুড়ি তখনও ঠুকিয়া চলিয়াছে

বায়ু ব্যতীত শব্দ সৃষ্টি হয় না— উপরের পরীক্ষা হইতে বোঝা যাইতেছে যে কোন বস্তুর কম্পন ঘটিলেই শব্দ সৃষ্টি হয় না। উহা উপলক্ষ মাত্র। ঐ কম্পন যখন বায়ুর মধ্যে সঞ্চারিত হইবে তখনই শব্দ সৃষ্টি হইবে। অতএব বায়ুর তরঙ্গই হইল শব্দ। ১৭০ নং চিত্রে দেখ টিউনিং ফর্কের একটি দণ্ড স্পন্দিত হইয়া বাতাসের মধ্যে কেমন তরঙ্গ সৃষ্টি করিতেছে। দণ্ডটি আন্দোলিত হইয়া আগে-পিছে বা

শব্দবিস্তারের প্রকৃতি।

আসা-যাওয়া করিতেছে এবং ফলে বাতাসে পর্যায়ক্রমে সংকোচন (compression) ও প্রসারণের (rarefaction) ঢেউ সৃষ্টি হইতেছে, অনেকটা যেমন জলে ঢিল ফেলিলে উহাতে ঢেউ সৃষ্টি হয়। তফাৎ—জলের ঢেউএ জলের কণিকাগুলি নিজ নিজ স্থানে **উঠা নামা** করে এবং এই ঢেউ এক স্তর হইতে পাশের স্তরে সঞ্চারিত

হইয়া ক্রমশঃ দূরে ছড়াইয়া পড়ে। শব্দের ক্ষেত্রে বায়ুর কণিকাগুলি একই স্থানে **সামনে-পিছনে** আন্দোলিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী বায়ুকণিকা-গুলিকে ধাক্কা মারিয়া উহাদের মধ্যে ঐ আন্দোলন সঞ্চারিত করে. এইভাবে
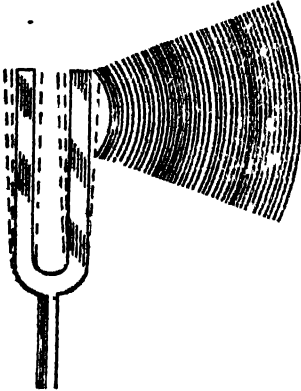
চিত্র নং ১৭০ : টিউনিং ফর্কটি বাজিতেছে বলিয়া উহার কম্পনে বায়ুমণ্ডলে ঢেউ সৃষ্টি হইতেছে
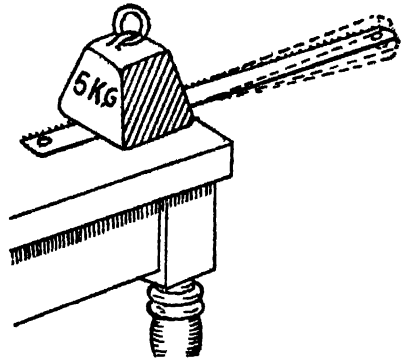
চিত্র নং ১৭১ : একটি পাতলা লোহার পাতকে এইভাবে বাধাইয়া শব্দ সৃষ্টি করা যায়

ঢেউটি বিস্তৃত হইয়া যায়। আর একটি চিত্রে দেখ—একটি পাতলা লোহার পাত স্পন্দিত হইয়া কিরূপ শব্দ সৃষ্টি করিতেছে ; তোমরা বোধ হয় কেহ কেহ এরূপ পরীক্ষা করিয়া থাকিবে।

বায়ুর স্পন্দন মাত্রেই শব্দ নহে—কিন্তু বায়ুর স্পন্দন মাত্রেই কি শব্দ সৃষ্টি করিবে? তাহা হইলে দ্রুতগতিতে আমার হাতটিকে বায়ুর মধ্যে আন্দোলিত করিয়াও তো শব্দ উৎপন্ন করিতে পারিতাম। কিন্তু তাহা হয় না। কারণ বায়ুর আন্দোলনের কম্পাঙ্কের (frequency) একটা নির্দিষ্ট সীমা আছে যাহার কম হইলে আমরা কম্পনকে আর শব্দরূপে শুনিতে পাই না। দেখা গিয়াছে যে সাধারণতঃ **সেকেণ্ডে ২০ বারের কম** কম্পন মানুষের কাণ শুনিতে পায় না। তেমনি উপরের দিকে **সেকেণ্ডে ২৫ হাজারের বেশী** দ্রুত কম্পনও আমাদের শ্রবণের সীমার বাহিরে। এক প্রকার বাঁশি (whistle) আছে যাহার আওয়াজ তুমি আমি শুনিতে

না পাইলেও কুকুর শুনিতে পাইবে, সুতরাং পুলিশের লোক উহা অনেক সময় কুকুরকে ইশারায় ডাকিতে ব্যবহার করে। বাদুড় উঁচু পর্দার দিকে এমন তীক্ষ্ণ আওয়াজ (১৮৯ পৃষ্ঠা) শুনিতে পায় যাহা মানুষের কাণের ক্ষমতার সম্পূর্ণ বাহিরে। সুতরাং বৈজ্ঞানিক ভাবে দেখিতে গেলে—**কোনও ক্ষেত্রে 'শব্দ নাই' না বলিয়া 'শব্দটি শ্রুতিগোচর নহে'—বলাই শুদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গত।** এই সকল **অতীন্দ্রিয় শব্দ** আধুনিক বিজ্ঞানে মানুষের নানা বড় বড় প্রয়োজনে—যেমন অস্ত্র-চিকিৎসার (surgery) নানা প্রকার রোগ বিনা অস্ত্র প্রয়োগে আরাম করিতে, আকাশপথে যান চলাচলের নানা অসুবিধা নিবারণ করিতে—এইরূপ সব প্রয়োজনে কৌশলে ব্যবহার করা হইতেছে।
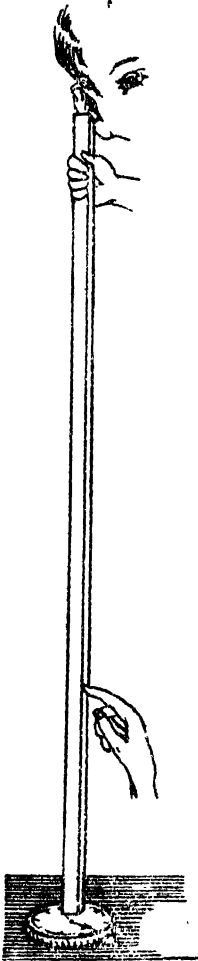
চিত্র নং ১৭২ : কাঠের রুলের মধ্য দিয়া শব্দ বায়ুর মাধ্যম অপেক্ষা অনেক দ্রুতগতিতে ও সহজে সঞ্চালিত হয়

পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বোঝা যায় শুধু বায়ু নয়, সকল প্রকার কঠিন ও তরল পদার্থের মাধ্যমেই শব্দ বাহিত হইতে পারে। নিম্নের পরীক্ষাটি লক্ষ্য কর—

পরীক্ষা : চিত্রের ন্যায় কানের উপর একটি কাঠের লম্বা রুল ঠেকাইয়া ধর। এখন অপর প্রান্তে তোমার বন্ধুকে খুব মৃদুভাবে নখ দিয়া আঁচড় কাটিতে বা টোকা মারিতে বল যাহাতে পার্শ্ববর্তী অপর কেহ শব্দটি শুনিতে না পায়। দেখিবে—অতি সুন্দর, স্পষ্ট-ভাবে তুমি আওয়াজটি শুনিতে

কাঠ ও জলের মধ্য দিয়া শব্দের বিস্তার

পাইবে, এমন কি উহা কি জাতীয় আওয়াজ বুঝিতেও কিছুই অসুবিধা হইবে না। উপরোক্ত পরীক্ষায় কাঠের অপর প্রান্তে একটি হাতঘড়ি (যাহার আওয়াজ ঐ দূরত্বে শোনা যায় না) ঠেকাইয়া ধরিলেও উহার মৃদু আওয়াজ পরিষ্কার কানে আসিয়া পৌঁছিবে। এখানে শব্দটি কাঠের মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া আসিয়াছে, বায়ুর মধ্য দিয়া নহে, কারণ তাহা হইলে তুমি কাঠ হইতে কান সরাইয়া লইয়াও উহা শুনিতে পাইতে। এইরূপ পুকুরের মধ্যে ডোবানো সিঁড়িতে যদি লাঠি দিয়া আঘাত কর তাহা হইলে পুকুরের অপর প্রান্তে তোমার বন্ধু জলের মধ্যে ডুব দিয়া বা একটি কান জলে ডুবাইয়া ঐ শব্দ পরিষ্কার শুনিতে পাইবে। তোমরা অনেকে হয়তো দুইটি খালি টিনের কৌটার তলায় পেরেক দিয়া ফুটা করিয়া উহাদের মধ্যে একটি লম্বা সুতার দুই প্রান্ত দিয়াশলাই কাঠি বাঁধিয়া
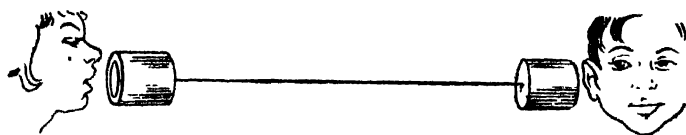
চিত্র নং ১৭৩ : ঘরোয়া টেলিফোন—সুতার মধ্য দিয়া এইভাবে অতি মৃদু শব্দ সঞ্চালিত হইতে পারে

আটকাইয়া দিয়া দুই বন্ধুতে ঘরোয়া টেলিফোনে কথাবার্তা কহিয়াছ।

দেখা গিয়াছে যে জলের ভিতর দিয়া শব্দ বায়ুর চারগুণ বেগে এবং সাধারণভাবে কঠিন মাধ্যমের ভিতর দিয়া শব্দ তরল মাধ্যমের দুইগুণ বেগে সঞ্চালিত হয়।

সাধারণ শব্দ যে বায়ুর তরঙ্গ তাহার আরও প্রমাণের প্রয়োজন হইলে আমরা যে কোনও প্রচণ্ড শব্দের কথা ভাবিতে পারি—যেমন বোমা-ফাটার শব্দ। বোমা ফাটিবার পর বাতাসের প্রচণ্ড তরঙ্গে ঘরে কাঁসার বাসনগুলি অনেক সময় ঝনঝন করিয়া বাজিয়া উঠে। মেঘের গর্জনে বাড়ীর দরজা জানালা পর্যন্ত কাঁপিতে থাকে তাহা আমরা অনেক সময় লক্ষ্য করিয়াছি।

শব্দের বৈশিষ্ট্য

গুণ (quality)—আওয়াজ আবার কত রকমের আছে এবং উহাদের বিশেষ বিশেষ ধ্বনির সহিত সাদৃশ্য অনুযায়ী আমরা উহাদের বর্ণনামূলক বিভিন্ন পরিভাষা ব্যবহার করিয়া থাকি। যেমন মডমড, শনশন, দুমদাম ইত্যাদি। একটি টিনের কৌটায় বালি, লোহার টুকরা, মটরদানা ইত্যাদি নানা জাতীয় জিনিস রাখিয়া মাত্র ঝাঁকানির শব্দ শুনিয়া অনেকটা অনুমান করিতে পারি উহাদের মধ্যে কি, অন্ততঃ কি জাতীয়, জিনিস আছে। বিভিন্ন আওয়াজের এই প্রভেদকে **গুণ** বলে।

তীব্রতা (intensity)—তারপর শব্দের তীব্রতা। একই আওয়াজ কখনও মৃদু, কখনও শক্তিশালী। যেমন পটকা ও বোমা, গলার স্বাভাবিক আওয়াজ ও মাইকের (mike) মধ্য দিয়া পরিবর্ধিত আওয়াজ।

এ ছাড়াও বিভিন্ন জাতীয় আওয়াজের মধ্যে একটা মূল পার্থক্য রহিয়াছে। সেই কথা পরে বলা হইতেছে।

শব্দের মধ্যে এইসব বৈচিত্র্য আসে কোথা হইতে? এ সবই হইল —বাতাসে (বা অন্য মাধ্যমে) শব্দ তরঙ্গগুলির আকারের বিভিন্নতা। কম্পমান বস্তুটি আয়তনে বড় হইলে বা এপাশে ওপাশে দোলনের পরিমাণ অর্থাৎ **কম্পন-বিস্তার** (amplitude) বাড়িলে অনেকখানি বায়ু আন্দোলিত হইতে থাকিবে—শব্দের তীব্রতাও (intensity) বাড়িবে। আবার দোলনের বিস্তার ঠিক থাকিয়া যদি ঢেউগুলির ওঠানামা বা আসা-যাওয়ার **ভঙ্গীতে** বৈচিত্র্য সৃষ্টি হয় তাহা হইলে শব্দের গুণ (quality) বদলাইয়া যাইবে, যেমন টিনের মধ্যে বিভিন্ন বস্তু রাখিয়া ঝাঁকানি দিলে হয়—উপরে বলা হইয়াছে।

সুর (musical sound) ও আওয়াজ (noise)

ছন্দ—যাহার সামান্যমাত্র সুরের অনুভূতি আছে তাহাকে একটি হারমনিয়মের সুর ও হাতুড়ী দিয়া তবলা ঠোকার শব্দের মধ্যে যে মূল প্রভেদ আছে তাহা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। নানা রকম **আওয়াজ** অর্থাৎ সুরবিবর্জিত ধ্বনির কথা বলা হইয়াছে। তেমনি নানা রকমের **সুর**

হইল—বেহালা, বাঁশি, পিয়ানো, দোয়েল পাখীর শিস, এমন কি কারখানার সাইরেন। এই সব শব্দকে সাধারণত আমরা মধুর বলি কারণ ইহারা আমাদের মনে একটা আনন্দের অনুভূতি জাগায়। এই প্রভেদ কি করিয়া হয়? ইহার মূল হইল—**ছন্দ**। যেখানেই ছন্দ সেখানেই আনন্দ। যেমন নৃত্যের ছন্দ। ছন্দকে বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়—**উহার মধ্যে কোনও গতি বা ভঙ্গীর সমান সময়ের ব্যবধানে পুনরাবৃত্তি** ঘটিতেছে। তেমনি বায়ুর আন্দোলন যদি একই সময় পরে পরে অর্থাৎ সমান তালে ঘটিতে থাকে তাহা হইলে উহা সুর সৃষ্টি করিবে। আর ঐ আন্দোলন যদি বিষম তালে অর্থাৎ এলোমেলোভাবে হয় তাহা হইলে উহাতে আওয়াজ সৃষ্টি হইবে। মনে কর তুমি পেন্সিল দিয়া টেবিলের উপর টোকা মারিতেছ
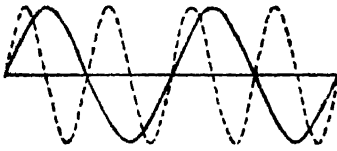
চিত্র নং ১৭৪ : শব্দের বৈশিষ্ট্য ,...নির্দেশিত শব্দ তরঙ্গের তীক্ষ্ণতা অধিক (দ্বিগুণ) কিন্তু তীব্রতা অপরটির সহিত সমান
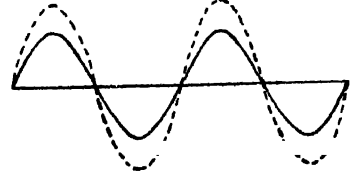
চিত্র নং ১৭৫ : শব্দের বৈশিষ্ট্য ;...নির্দেশিত শব্দ-তরঙ্গের তীব্রতা অধিক কিন্তু তীক্ষ্ণতা অপরটির সহিত সমান
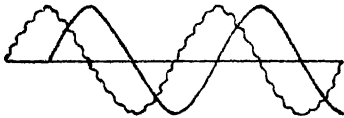
চিত্র নং ১৭৬ : শব্দের বৈশিষ্ট্য ; উভয় শব্দ তরঙ্গের তীক্ষ্ণতা ও তীব্রতা এক, কিন্তু গুণ বিভিন্ন
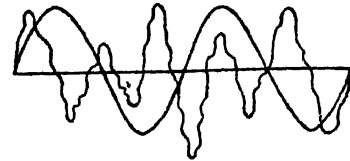
চিত্র নং ১৭৭ : শব্দের বৈশিষ্ট্য , সুর ও অ-সুর (আওয়াজ)—আওয়াজের শব্দ-তরঙ্গ কেমন এলোমেলো লক্ষ্য কর

সমান তালে—দ্রুতগতিতে। যদি তোমার পক্ষে এই গতি বাড়াইয়া এক সেকেণ্ডে অন্ততঃ ২০ বার টোকা মারা সম্ভব হইত তাহা হইলে দেখিতে **ঠকঠক আওয়াজ একটি ধীর, গম্ভীর সুরে পরিণত হইয়াছে। কিন্তু মনে রাখিও সমান সময় অন্তরে টোকাগুলি**

না পড়িলে স্বুর সৃষ্টি হইবে না। ইহা হইতে স্বুরের উৎপত্তির রহস্য সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ থাকে না।

তীক্ষ্ণতা (pitch)—আওয়াজের মধ্যে যেমন, সুরের মধ্যেও তেমনি উহার **গুণ** ও **তীব্রতার প্রভেদে** একই কারণে বৈচিত্র্য সৃষ্টি হইতে পারে। এইজন্যে কানে শুনিয়া আমরা বলিতে পারি একটি সুর হারমনিয়মের না বাঁশির, এস্রাজ না বেহালার ইত্যাদি। তেমনি সুরের মৃদুতা ও তীব্রতার তারতম্যও সহজে বোঝা যায়। কিন্তু সুরের ক্ষেত্রে আর একটি বৈশিষ্ট্য খুবই সুপরিচিত তাহা হইল উহার **তীক্ষ্ণতা**; যেমন সা, রে, গা, মা, পা ইত্যাদি—নিম্ন হইতে উচ্চতর পর্দায় সুরের আরোহণ। ইহার সৃষ্টির পিছনে আছে একটি অতি সাধারণ ব্যাপার—বায়ু তরঙ্গের **কম্পাঙ্ক** (frequency of vibration)। **মুদারার** (অর্থাৎ হারমনিয়মের মধ্যের **সপ্তক**) সা হইল সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কম্পন, আর **তারার** সা হইল—ইহার দ্বিগুণ অর্থাৎ সেকেণ্ডে ৫১২ বার কম্পন। তোমরা জানো বেহালার কানে মোচড় দিয়া কোনও তারকে যদি বেশী টান করা যায় তাহা হইলে উহার সুর 'চড়ে' অর্থাৎ উচ্চতর পর্দায় যায়, তেমনি আলগা করিলে, সুর 'নামে'। আবার টান ঠিক রাখিয়া যদি আঙুলে টিপ দিয়া তারটির **কম্পমান অংশের দৈর্ঘ্য ছোট বড় করা যায় তাহা হইলেও সুর চড়িবে বা নামিবে। স্বরমাপক যন্ত্রে** (sonometer) এইগুলি সুন্দরভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাইতে পারে—
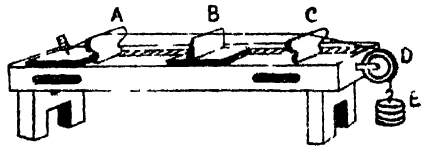
চিত্র নং ১০৮ : স্বরমাপক যন্ত্র—নীচের ব্রীজগুলির সাহায্যে ABC তারের দৈর্ঘ্য ছোটবড় করা বা উহার E প্রান্তে ওজন কমবেশী করিয়া তারের টান কমানো বাড়ানো যায়

পরীক্ষা ঃ একটি ফাঁপা কাঠের বাক্সের (অনেকটা এসরাজ বা স্বরোদের ন্যায়, তবে বরাবর সমান মাপের) উপরে এক বা একাধিক তার লাগাইবার ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেকটি তার এক প্রান্তে একটি কাঠের খুঁটার উপর বাঁধা থাকে এবং অপর প্রান্তটিকে ৪নং চিত্রের ন্যায় একটি

কপিকলের উপর দিয়া ঝুলাইয়া, উহাতে ওজন চাপাইয়া তারটিকে প্রয়োজনমত টান করা যায়। তারের নীচে বাক্সের উপর শক্ত কাঠের দুইটি কিংবা তিনটি ব্রীজ (bridge) থাকে, উহাদের তার বরাবর এদিক ওদিক সরাইয়া তারের কম্পমান অংশের দৈর্ঘ্য ছোট বড করা যায়। এখন যন্ত্রটিতে (১) তারের টান বাড়াইয়া-কমাইয়া এবং (২) কম্পমান অংশের দৈর্ঘ্য কমবেশী করিয়া সুরের তীক্ষ্ণতা কেমন ওঠানামা করে সহজেই পরীক্ষা করা যায়।

শব্দ রেকর্ড (record) ও পুনরুৎপাদন

গ্রামোফোন ঃ—একটি গ্রামোফোন রেকর্ড চালাইয়া দিয়া সাবধানে উহার লাইনগুলির খাঁজে নখ বা একটি গ্রামোফোনের পিন দিয়া যদি আলগাভাবে চাপিয়া ধর তাহা হইলে নখে একটি কম্পন অনুভব করিবে এবং রেকর্ডের গানটিকে খুব মৃদুভাবে বাজিতে শুনিবে। আরও ভাল হয় যদি (ক) একটি খালি দিয়াশলাইএর বাক্সের কোণে একটি গ্রামোফোনের পিন গুঁজিয়া কিংবা (খ) মোটা কাগজের একটি চোঙা করিয়া (চিত্র দেখ) উহার সরুপ্রান্তে পিনটি আটকাইয়া একটি ঘরোয়া **'সাউণ্ড-বক্স'** (sound box) তৈয়ারী করিয়া লও। এইবার উহার পিনটি রেকর্ডের লাইনে চাপিয়া ধরিলে রেকর্ডের গান হয়তো ঘরের সকলেই শুনিতে পাইবে। ব্যাপারটি একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক—
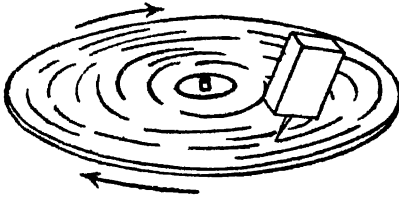
চিত্র নং ১৭৯ ঃ ঘরোয়া সাউণ্ড-বক্স—দিয়াশলাইএর বাক্সে পিন গুঁজিয়া এইভাবে রেকর্ড বাজানো যাইতে পারে
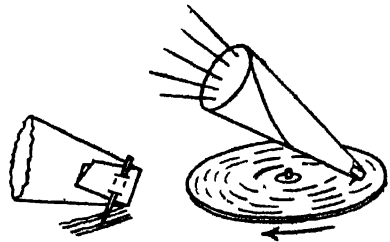
চিত্র নং ১৮০ ঃ কাগজের চোঙার সাহায্যেও এইভাবে ঘরোয়া সাউণ্ড-বক্স করা যায়

একটি কার্ড মুখের সম্মুখে

ধরিয়া যদি কথা বলা যায় তাহা হইলে হাত দিয়া স্পর্শ করিলে কার্ডটির উপর একটি কম্পন অনুভব করা যায়। তেমনি যদি উপরোক্ত কাগজের 'সাউণ্ড-বক্স'টির খোলা মুখে কথা বলা হয় তাহা হইলে শব্দের কম্পন অপর প্রান্তের পিনটিকেও অনুরূপভাবে কাঁপাইবে—অর্থাৎ **ঐ শব্দের 'ছাপ' পিনের কম্পনে পড়িবে**। গ্রামোফোনের রেকর্ডের লাইনগুলির খাঁজে (রেকর্ডটি নরম পদার্থে তৈয়ারী বলিয়া) এইরূপ একটি পিনের কম্পন একটানা উঁচুনীচু ঢেউয়ের আকারে শব্দটির একটি 'ছাপ' তুলিয়া রাখিয়াছে। এখন বিপরীতক্রমে, যদি সাউণ্ডবক্সটির পিনটিকে ঐ উঁচুনীচু পথের উপর দিয়া টানিয়া লইয়া যাওয়া হয় তাহা হইলে স্বভাবতই তাহার মধ্যে পূর্বের কম্পন সৃষ্টি হইবে এবং এই কম্পন [illegible] সঞ্চারিত হইয়া উহাকে আরও [illegible]ভাবে কিন্তু **একই ভঙ্গীতে** কাঁপাইতে থাকিবে অর্থাৎ শব্দটি বর্ধিত আকারে পুনরুৎপাদিত হইবে। সংক্ষেপে ইহাই হইল গ্রামোফোনে রেকর্ড করা ও শব্দ পুনরুৎপাদন করার কৌশল।
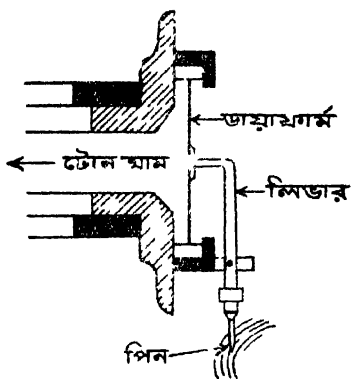
চিত্র নং ১৮১। গ্রামোফোনের সাউণ্ড বক্স রেকর্ডের লাইনে শব্দের ছাপ পিনের মাধ্যমে ডায়াফ্রামকে অনুরূপভাবে কম্পিত করে এবং শব্দটি পুনরুৎপাদিত হয়। নীচে— রেকর্ডের [illegible] শব্দের ছাপ বড় করিয়া দেখানো হইয়াছে

শব্দের প্রতিফলন

আলোর তরঙ্গ মসৃণ তল হইতে প্রতিফলিত হয় দেখিয়াছি। শব্দও একপ্রকার তরঙ্গ সুতরাং আলোর মত প্রতিফলিত হওয়া স্বাভাবিক। তাহা হইলে পরীক্ষা করিয়া দেখা যাক—

পরীক্ষা ঃ চিত্রের ন্যায় একটি পিচবোর্ডের সিলিণ্ডার (cylinder) আকৃতি চোঙা বা খাপের ভিতরে (যেমন ব্যাডমিণ্টনের সাট্‌লকক—shuttle cock—রাখার বাক্স) ভাল করিয়া চারিধারে তুলা বিছাইয়া উহা টেবিলের উপর শোয়াইয়া উহার মধ্যে একটি ঘড়ি রাখ। এইবার
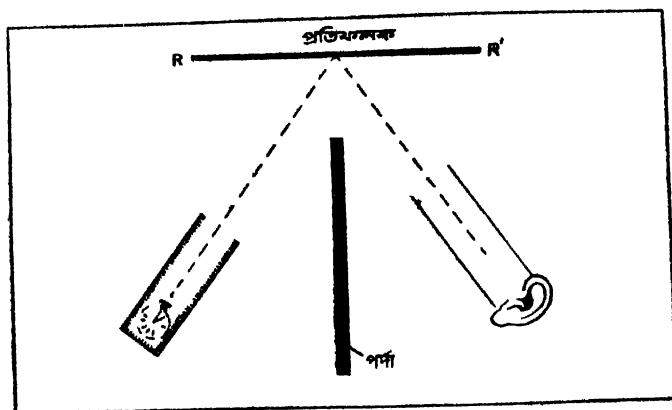
চিত্র নং ১৮২ ঃ শব্দের প্রতিফলন—ঘড়ির মৃদু শব্দও এইভাবে শ্রুতিগোচর হয়

একটি প্রতিফলক RR' (যে কোন শক্ত মসৃণ বস্তু হইলেই চলে) খাপটির খোলা মুখের সামনে রাখিয়া উভয় মুখ খোলা ঐ প্রকার আর একটি খাপ মোটামুটি হিসাব করিয়া এমনভাবে রাখ যেন শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হইলে এই দ্বিতীয় খাপের মধ্য দিয়া যাইতে পারে। প্রথম ও দ্বিতীয় খাপের মধ্যস্থলে একটি উঁচু পর্দা (partition) রাখ, যাহাতে সোজাসুজি শব্দ এক খাপ হইতে অপর খাপে আসিতে না পারে। এখন দ্বিতীয় খাপের পিছনের খোলা প্রান্তে কান রাখিয়া খাপটিকে অল্প ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখ কোন অবস্থানে ঘড়ির মৃদু অস্পষ্ট শব্দ বেশ জোরালো হইয়া শোনা যাইতেছে। এই অবস্থায় লক্ষ্য কর খাপ দুইটি যে লাইন বরাবর আছে—উহাদের বর্ধিত করিলে প্রতিফলকের তলে সমান কোণ উৎপন্ন করিবে। অর্থাৎ শব্দতরঙ্গ প্রতিফলকের উপর বাধা পাইয়া ঠিক আলোর নিয়মে প্রতিফলিত হইয়া তোমার কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে—তাই এত মৃদু শব্দও

তুমি শুনিতে পাইতেছ। (এই পরীক্ষায় এই প্রকার দীর্ঘ, সিলিণ্ডার আকৃতির খাপ দুইটি ব্যবহার করা হইল কেন বল দেখি ?)

উপরের দৃষ্টান্তে শব্দের প্রতিফলন আমাকে খাপের ভিতরে আড়াল করা ঘড়িটির শব্দ শুনিতে সাহায্য করিতেছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যখন এইভাবে শব্দতরঙ্গ বিভিন্ন দেওয়ালে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসে তখন কিন্তু শুনিতে সুবিধা হওয়া দূরের কথা, বিঘ্ন সৃষ্টি হয়—মনে হয় আসল শব্দটি যেন অল্প সময় পরে পরে পুনরাবৃত্ত হইতেছে।

প্রতিধ্বনি

মনে কর A′ B′ পথে যে শব্দটি শুনিতেছ তাহাই যখন প্রতিফলিত হইয়া ABCD পথে তোমার কানে আসিতেছে, তখন উহা সামান্য কিছু পরে তুমি পুনরায় শুনিতেছ—ইহাকেই **প্রতিধ্বনি** বলে। কিন্তু মনে কর হয়তো প্রথম, অর্থাৎ সোজা পথে আগত, শব্দটি শোনা সম্পূর্ণ
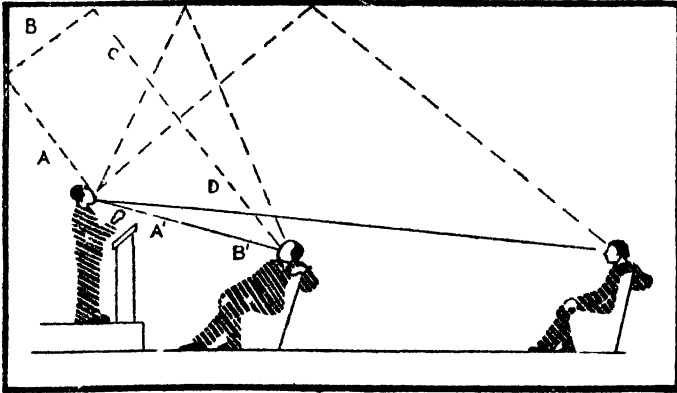
চিত্র নং ১৮৩। শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হইয়া প্রেক্ষাগৃহে যেভাবে প্রতিধ্বনি সৃষ্টি করে

হয় নাই এমন সময় দ্বিতীয় পথে শব্দটি পুনরায় কানে আসিয়া পৌঁছিল। তখন একটা শব্দের উপর আর একটা শব্দ চাপা পড়িয়া বিশেষ গণ্ডগোলের সৃষ্টি করে। উপরের চিত্রটি দেখিলে বুঝিতে পারিবে একটি ঘরে শব্দ কতভাবে প্রতিফলিত হইয়া শ্রোতাদের কানে আসিয়া পৌঁছে। পিছনের আসনে উপবিষ্ট শ্রোতাটির ক্ষেত্রে বোধ হয় শব্দের উৎস হইতে যে তরঙ্গটি

সোজাভাবে তাহার কানে আসিতেছে তাহার অপেক্ষা ছাদে প্রতিফলিত হইয়া যে তরঙ্গটি আসিতেছে উহা বেশী শ্রুতিগোচর হইবে কারণ সম্মুখের আসনে যাহারা বসিয়া আছে তাহাদের দেহ সোজা পথে তরঙ্গের সঞ্চারে কিছু কিছু বাধা সৃষ্টি করিতেছে। **প্রেক্ষাগৃহে** (auditorium) শব্দ যাহাতে এইভাবে প্রতিধ্বনিত হইয়া শোনার বিঘ্ন না ঘটায় সেজন্য আধুনিক স্থপতিবিদ্যায় নানাপ্রকার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে, ইহাদের **শব্দনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা** (accoustics) বলে। এই ব্যবস্থায় ঘরের মধ্যে **নরম কার্পেট**, নরম আসবাবপত্র, পর্দা, দেওয়ালে শব্দশোষক আস্তরণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়, কিন্তু ছাদ (ceiling) হইতে যাহাতে শব্দ সুষ্ঠুভাবে প্রতিফলিত হইতে পারে তাহার প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়।

এইভাবে মসৃণ অবতল (concave) ক্ষেত্র হইতেও ঠিক আলোকের নিয়মে শব্দতরঙ্গ প্রতিফলিত হইতে পারে। অনেক প্রেক্ষাগৃহে এজন্য ষ্টেজের উপর **বক্তার পিছনে একটি বৃহৎ অবতল বোর্ড রাখা হয়**—শব্দের প্রতিফলন ও উহার সাহায্যে পরিবর্ধনের উদ্দেশ্যে, মোটরগাড়ার আলোকের রশ্মি (৪৯ পৃষ্ঠা) যেভাবে পিছনের দর্পণে প্রতিফলিত হইয়া সমান্তরাল গুচ্ছের আকারে কেন্দ্রীভূত হইয়া বাহির হইয়া আসে। গির্জার অবতল ছাদও একইভাবে প্রতিফলকের কাজ করিয়া উহার অভ্যন্তরের সমস্ত শব্দকে প্রতিধ্বনিত করে।

শব্দের এই প্রতিফলন **সমুদ্রের গভীরতা মাপিবার জন্য** ব্যবহার করা হইয়া থাকে। জলের মধ্যে শব্দের গতি আমাদের জানা আছে। সুতরাং যদি জলের উপরিতলে কোনও বিস্ফোরণ ঘটাইয়া উহার শব্দ সমুদ্রের তলদেশ হইতে প্রতিফলিত হইয়া ফিরিয়া আসিতে কত সময় লাগে তাহা লক্ষ্য করা যায় তাহা হইলে শব্দের যাত্রাপথের মোট দূরত্ব বাহির করা খুবই সহজ অঙ্কের ব্যাপার এবং এই দূরত্বের অর্ধেকই হইবে সমুদ্রের গভীরতা।

কান

শব্দের অনুভূতি (sensation of sound)—এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা শব্দসৃষ্টির ব্যাপার যেটুকু আলোচনা করিয়াছি তাহা হইল—বস্তুর কম্পন ও

সেই কম্পনের কোনও স্থূল মাধ্যমের মধ্য দিয়া বিস্তার। কিন্তু শব্দ সৃষ্টির রহস্য এখানেই সম্পূর্ণ হইল না ; যাহা বাকী রহিল তাহা হইল শব্দের অনুভূতি। শব্দের অনুভূতি ব্যতীত শব্দের বৈজ্ঞানিক অস্তিত্ব থাকিলেও তোমার আমার নিকট তাহা শব্দ নহে—হাজার বোমা ফাটিলেও নহে, একথা পূর্বে বলা হইয়াছে। এই অনুভূতি যে ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে ঘটে তাহা হইল কান। নিম্নে মাহুষের কানের গঠনের একটি চিত্র ও বর্ণনা দেওয়া হইল।

বহিঃকর্ণ (**outer ear**)—প্রথমেই লক্ষ্য কর—গ্রামোফোনের চোঙার মত একটি অঙ্গ, **পিনা** (pinna)—নরম হাড় দিয়া গঠিত। ইহার উদ্দেশ্য
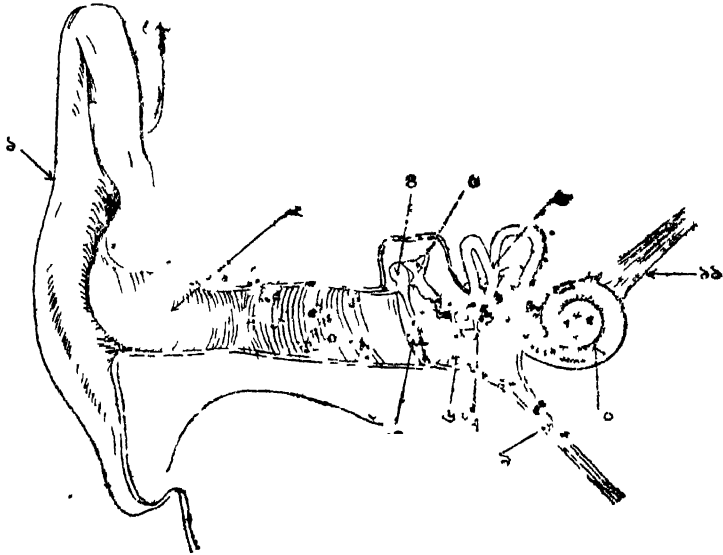
চিত্র নং ১৮৪ : শ্রবণ ইন্দ্রিয় , ১—পিনা (pinna), ২—কানের নালি (ear canal), ৩—কর্ণ-পটহ (ear drum), ৪—হাতুড়ী, ৫—নেহাই, ৬—পাদান, ৭—মধ্যকর্ণ, ৮—অর্ধবৃত্তাকার নালি ত্রয় (এইগুলি শরীরের ভারসমতা রক্ষা করিতে সাহায্য করে), ৯—যে পথে মধ্যকর্ণের সহিত গলার ভিতরের যোগ সাধিত হয়, ১০—ককলিয়া, ১১—শ্রবণ-স্নায়ু

সুস্পষ্ট—বেশী পরিমাণ শব্দতরঙ্গকে একস্থানে একত্র করিয়া উহাকে তীব্রতর করা। এই চোঙাটি সরু হইয়া ভিতরের দিকে একটি নালিতে (**ear canal**)

পরিণত হইয়াছে এবং ইহার শেষ প্রান্তে একটি পাতলা পর্দা (ear drum) রহিয়াছে। এই পর্যন্ত হইল প্রকৃতপক্ষে বহিঃকর্ণ। বায়ুতরঙ্গ বহিঃকর্ণের এই পর্দায় আঘাত করিয়া উহাতে অনুরূপ কম্পন সৃষ্টি করে।

মানুষের দুইটি কান থাকায় কি সুবিধা হইয়াছে? প্রথম সুবিধা অবশ্য এই যে শব্দটিকে আর একটু ভাল করিয়া শোনা যায়। দ্বিতীয় বড় সুবিধা হইল—শব্দটি কোন দিক ও কত দূর হইতে আসিতেছে তাহা বুঝিবার সুবিধা হয়। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি—দুইটি চোখ আছে বলিয়াই আমরা দৃষ্টবস্তুর দূরত্ব বুঝিতে পারি। নচেৎ পারিতাম না। ইহার সুন্দর প্রমাণ এই : মনে কর কোনও একটি অজানা স্থানে, খোলা মাঠের এক জায়গায় একটি হাঁড়ি রাখিয়া এক চোখ বাঁধিয়া তোমাকে সেখানে লইয়া যাওয়া হইল এবং হাতে একটি লাঠি দিয়া হাঁড়ির গায়ে এক বারে আঘাত করিতে বলা হইল। তখন বুঝিতে পারিবে—**একটি চোখে দেখিয়া এই কাজ করা প্রায় অসাধ্য ব্যাপার,** কারণ হাঁড়িটির প্রকৃত অবস্থান অর্থাৎ দূরত্ব সম্বন্ধে ঐ অবস্থায় তোমার পক্ষে কোনও ধারণা করাই সম্ভব হইবে না।

দুইটি কানের সুবিধা

দুইটি চোখ আছে কেন

মধ্যকর্ণ (middle ear)—এইবার দ্বিতীয় অংশ বা **মধ্যকর্ণ**। এখানে তিনটি ছোট ছোট পরস্পর-সংবদ্ধ হাড় রহিয়াছে—ইহাদের যথাক্রমে **হাতুড়ী** (hammer), **নেহাই** (anvil) ও **পাদান** (stirrup) বলে। (কারণ ইহাদের আকৃতি অনেকটা ঐ সব নামের জিনিসের মত)। হাতুড়ীটি বহিঃকর্ণের পর্দার (ear drum) সহিত লাগানো এবং অপর প্রান্তে পাদানটি একটি পাতলা পর্দার (oval window) সহিত আঁটা আছে। মধ্যকর্ণের এইপ্রকার গঠনের উদ্দেশ্য হইল—বহিঃকর্ণের পর্দার কম্পন এই তিনটি হাড়ের সাহায্যে **লিভারের প্রক্রিয়ায়** আরও জোরালো করিয়া মধ্যকর্ণের শেষ প্রান্তের এই পর্দায় পৌঁছাইয়া দেওয়া।

অন্তঃকর্ণ (inner ear)—সর্বশেষে কানের তৃতীয় অংশ বা অন্তঃকর্ণ। এইটি তরল পদার্থে পূর্ণ এবং উহার মধ্যে শামুকের ন্যায় পাকানো আকৃতির নরম হাড়ের একটি যন্ত্র আছে—উহার নাম **ককলিয়া** (cochlia)।

ইহার প্রাচীরের ভিতরের গায়ে সরু-মোটা তারের আকৃতির মাংসরজ্জু আছে। উহাদের উদ্দেশ্য—সরু-মোটা বিভিন্ন রকমের আওয়াজ যাহাতে নির্ভুলভাবে এইসব মাংসের তারে স্পন্দন তুলিতে পারে। মস্তিষ্ক হইতে আগত শ্রবণস্নায়ুর (auditory nerve) ছড়ানো প্রান্তগুলি অন্তঃকর্ণের এই তরল পদার্থে ডুবিয়া থাকে এবং শব্দতরঙ্গের স্পন্দন উহাদের মধ্যে সঞ্চারিত হইয়া শ্রবণ-স্নায়ু বাহিয়া **মস্তিষ্কের শ্রবণকেন্দ্রে উপস্থিত হয়** এবং শব্দের অনুভূতি সৃষ্টি করে। ভাবিয়া দেখিতে হইবে যে এখানেই শোনার কাজ সম্পূর্ণ হয়। (এই প্রক্রিয়ার সহিত দেখার প্রক্রিয়া ও অনুভূতির তুলনা কর)। হাতুড়ী স্কুলের পেটা ঘণ্টার উপর আঘাত করিল এবং আমি ঐ শব্দ শুনিলাম—শুধু শুনিলাম নহে, উহা যে ঘণ্টার শব্দ তাহারও বোধ হইল—এই দুই ঘটনার মধ্যে কতগুলি প্রক্রিয়া ধাপে ধাপে কাজ করিতেছে এখন বুঝিতে পারিতেছ। দেখার ন্যায় এখানেও বলিতে পারি—কান শোনে না, **প্রকৃতপক্ষে শোনে মস্তিষ্ক** যখন উহা শব্দতরঙ্গের ব্যাখ্যা (interpretation) করিয়া মনে শব্দের অনুভূতি জাগায়।

মস্তিষ্কই আসলে শোনে

অনুশীলনী (I)

১। শব্দ যে কোনও একটি বস্তুর কম্পন হইতে উৎপন্ন হয় ইহার কি কি প্রমাণ দিতে পার?

২। শব্দ কি ভাবে এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সঞ্চালিত হয় বর্ণনা কর ও ইহার সহিত আলোকের সঞ্চালন প্রণালীর তুলনা কর। কাচের একটি বন্ধ ঘরের ভিতরে কেহ জোরে চিৎকার করিলে বাহিরে কিছু শব্দ শোনা যাইতে পারে—ইহা কিরূপে সম্ভব হয় বুঝাইয়া দাও।

৩। শব্দের সঞ্চালনের জন্য যে স্থূল মাধ্যমের প্রয়োজন তাহার কি পরীক্ষা করিতে পার? বায়ু ব্যতীত অন্য কি কি মাধ্যমের সাহায্যে শব্দ সঞ্চালিত হইতে পারে দৃষ্টান্ত-সহ বুঝাইয়া দাও। রেল লাইনে কান পাতিয়া শুনিলে ষ্টেশনে দাঁড়াইয়া ট্রেণ আসার শব্দ শুনিবার অনেক পূর্বেই উহা শুনা যাইবে—ইহার কারণ কি?

৪। (ক) খালি গলা ও মাইকের আওয়াজ, (খ) ঝড়ের শব্দ ও জলের কল্লোল, (গ) হাতুড়ি ঠোকা ও তানপুরার আওয়াজ, (ঘ) হারমনিয়মের 'সা' ও 'পা' সুর, (ঙ) বেহালার 'সা' ও এস্রাজের 'সা' সুর—ইহাদের পরস্পরের মধ্যে বিভিন্নতার কারণ বুঝাইয়া বল।

৫। খুব কাছাকাছি একটি শব্দ আমি শুনিলাম না অথচ একটি কুকুর উহা শুনিতে পাইয়া ছুটিয়া গেল—ইহার বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও। 'অতীন্দ্রিয় শব্দ' কাহাকে বলে এবং ইহাদের ব্যবহারিক মূল্য কি?

৬। একটি স্বরমাপক যন্ত্রের (sonometer) বর্ণনা সহ উহার ব্যবহার প্রণালী ও প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দাও। টিউনিং ফর্ক কি?

৭। রেডিওতে অভিনয় ও উহার মধ্যে সঙ্গীত, রেলগাড়ীর শব্দ, ঝড়বৃষ্টির শব্দ, সমুদ্রের গর্জন প্রভৃতি শব্দ রেকর্ড করিয়া পুনরুৎপাদন করা হয়—ইহার মূল নীতি দৃষ্টান্ত-সহ সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

৮। পাশের ঘরে চায়ের কাপটি পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আমি এ ঘরে বসিয়া উহা বুঝিতে পারিলাম; কিরূপে ইহা সম্ভব হইল—বুঝাইয়া বল। এই সম্পর্কে মানুষের কানের গঠন-বৈশিষ্ট্য ও এই বৈশিষ্ট্যের উপযোগিতা বর্ণনা কর।

৯। শব্দ যে আলোকের ন্যায় প্রতিফলিত হইতে পারে ইহার (ক) একটি পরীক্ষা ও (খ) কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর।

১০। প্রতিধ্বনি কাহাকে বলে? ইহার সুবিধা-অসুবিধা ও এই সম্পর্কে প্রেক্ষাগৃহে শব্দ-নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার আলোচনা কর। প্রতিধ্বনি-নীতির একটি ব্যবহারিক প্রয়োগ বর্ণনা কর।

অনুশীলনী (II)

১। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কোনগুলি সত্য নহে বল :—

ক। বায়ু ব্যতীত শব্দ সঞ্চালিত হইতে পারে না।

খ। বায়ুর মধ্যে পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণের ঢেউ বিস্তৃত হইয়া শব্দ সঞ্চালিত হয়।

গ। কোনও শব্দ দ্রুতগতিতে সমান ব্যবধানে পুনরাবৃত্ত হইতে থাকিলে উহা সুরে পরিণত হয়।

ঘ। 'অতীন্দ্রিয় শব্দ' কেহ শুনিতে পায় না।

ঙ। কঠিন মাধ্যম তরল মাধ্যম অপেক্ষা ঘন বলিয়া উহার মধ্য দিয়া শব্দ অপেক্ষাকৃত মন্থর গতিতে সঞ্চালিত হয়।

চ। শব্দের কম্পাঙ্ক (frequency of vibration) বর্ধিত হইলে উহার তীব্রতাও (intensity) বৃদ্ধি পায়।

ছ। সেতারের তারের দৈর্ঘ্য ছোট করিলে উহার তীক্ষ্ণতা (pitch) বৃদ্ধি পায়, টান (tension) বেশী করিলে তীক্ষ্ণতা কমে।

জ। আলোকের ন্যায় শব্দও সমতল ও অবতল পৃষ্ঠ হইতে প্রতিফলিত হইতে পারে।

ঝ। বহিঃকর্ণের নালিটি মধ্যকর্ণ দিয়া একেবারে অন্তঃকর্ণের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত।

২। নিম্নলিখিত বাক্যগুলিতে শূন্য স্থান পূরণ কর :—

কোনও বস্তুর ব্যতীত শব্দ সৃষ্টি হইতে পারে না। শব্দের জন্য — মাধ্যমের প্রয়োজন। বায়ুর কণাগুলি — আন্দোলিত হইয়া শব্দ — হয়। বায়ুতরঙ্গে সেকেণ্ডে — বারের কম ও — বারের বেশী কম্পন আমরা শুনিতে পাই না। কম্পন ছন্দে হইলে উহা মাত্র আওয়াজ (noise) ও — ছন্দে হইলে — সৃষ্টি করে।

৩। নিম্নে বাম পাশের স্তম্ভের বাক্যাংশগুলি 'কারণ' ও ডান পাশের স্তম্ভের বাক্যাংশগুলি উহাদের 'ফল' নির্দেশ করিতেছে ; দুইটিকে শুদ্ধভাবে মিলাইয়া বল :—

১। বায়ুতরঙ্গের কম্পন বিস্তার বৃদ্ধি — ১। শব্দের গতি বৃদ্ধি
২। বায়ুতরঙ্গের কম্পাঙ্ক বৃদ্ধি — ২। শব্দহীনতা
৩। বায়ুশূন্য স্থান — ৩। শব্দের তীব্রতা বৃদ্ধি
৪। তরল মাধ্যম অপেক্ষা কঠিন মাধ্যমে — ৪। শব্দের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি
৫। বায়ুতরঙ্গের সেকেণ্ডে ২০ বার কম্পন — ৫। তারার (উচ্চ সপ্তকের) 'সা'
৬। বায়ুতরঙ্গের সেকেণ্ডে ২৫৬ বার কম্পন — ৬। শব্দের প্রতিধ্বনি নিয়ন্ত্রণ
৭। ঘরে নরম আসবাব-পত্র বিন্যাস — ৭। শব্দের অনুভূতি আরম্ভ
৮। বায়ুতরঙ্গের সেকেণ্ডে ৫১২ বার কম্পন — ৮। মুদারার (মধ্য সপ্তকের) 'সা'

৪। নিম্নে প্রতি সারিতে তিনটি করিয়া শব্দ বা বাক্যাংশ দেওয়া আছে, একটি শব্দ (বা বাক্যাংশের অন্তর্গত একটি শব্দ) অনুক্ত আছে ; প্রথম ও দ্বিতীয় শব্দ বা বাক্যাংশের মধ্যে যে সম্পর্ক তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ বা বাক্যাংশের মধ্যে সেই সম্পর্ক রক্ষা করিয়া অনুক্ত শব্দটি বসাও :—

ক। শব্দ : বায়ু :: আলো : —

খ। বাঁশি : সুর :: — : আওয়াজ (noise)

গ। বস্তু : — :: শব্দ : প্রতিধ্বনি

ঘ। বায়ুতরঙ্গের কম্পন বিস্তার : শব্দের তীব্রতা :: বায়ুতরঙ্গের — : শব্দের তীক্ষ্ণতা

ঙ। বেহালার তারের টান : সুরের তীক্ষ্ণতা বৃদ্ধি :: বেহালার তারের — : সুরের তীক্ষ্ণতা হ্রাস

চ। — : শব্দের উৎপত্তি :: শ্রবণ স্নায়ু ও -কেন্দ্র : শব্দের অনুভূতি

ছ। মধ্যকর্ণ : শব্দের — :: বহিঃকর্ণ : শব্দের কেন্দ্রীভবন

দ্বিতীয় অধ্যায়

বিদ্যুৎ

তড়িৎ সেল ও তড়িৎ প্রবাহ

(Electric cell and electric current)

বিদ্যুৎ কি

বিদ্যুৎ বলিতে সহসা আকাশের বিদ্যুতের কথাই মনে হয় কারণ আমাদের বিদ্যুতের সহিত প্রথম পরিচয় সেখানেই। কিন্তু সেই বিদ্যুৎ এখন আমাদের নিত্যদিনের জীবনের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিদ্যুৎ যে আমাদের জীবনযাত্রা কত সহজ করিয়া দিয়াছে, কত ভাবে আমাদের সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্য দান করিতেছে—তাহা শুধু একটি দিন পৃথিবীতে সমস্ত বিদ্যুতের কারবার বন্ধ করিয়া দিলেই বোধ হয় আমরা মর্মে মর্মে বুঝিতে পারিব। এখানে একটি কথা জানিয়া রাখ: আকাশের বিদ্যুৎ যে জাতীয় বিদ্যুৎ তাহাকে **স্থিতীয় বিদ্যুৎ** (statical electricity) বলে—ইহা সাধারণতঃ স্থির। কিন্তু আমরা এখানে যে জাতীয় বিদ্যুতের আলোচনা করিব তাহা হইল গতিশীল বিদ্যুৎ—**ভোল্টীয় বিদ্যুৎ** (voltaic electricity)

ইটালীর গ্যালভানি বলিয়া এক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করিতে করিতে নিতান্ত আকস্মিকভাবে একদিন লক্ষ্য করিলেন যে সদ্যোমৃত একটি ব্যাংএর এক পা যে কোনও ধাতুর সংস্পর্শে (যেমন পিতল) রাখিয়া অন্য পা-টি অপর কোনও ধাতুর (যেমন লোহা) সংস্পর্শে আনিবার সঙ্গে সঙ্গে উহা সংকুচিত হইয়া লাফাইয়া উঠে। পৃথিবীতে কোন এক অতীত দিনের এই সামান্য ঘটনাটি হইতে জগতে যুগান্তকারী এক আবিষ্কারের সূচনা হইয়াছিল, কারণ তড়িৎ সেল নির্মাণের রহস্য ইহা হইতেই মানুষ প্রথম আবিষ্কার করে।

তাড়িৎ সেল (electric cell)

ইতালীয় বৈজ্ঞানিক **ভল্টা** (Volta) এই সেলের আবিষ্কারক এবং সেইজন্য ইহাকে সাধারণতঃ ভোল্টীয় সেল (voltaic cell) বলে। ইহার গঠন-প্রণালী এই প্রকার—

একটি কাচের মোটা মুখ-ওয়ালা বোতলে পাতলা সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ লইয়া উহাতে দুইটি ধাতুর পাত—দস্তা ও তামা—প্রায় অর্ধেক পর্যন্ত ডুবাইয়া দাও এবং উহাদের খোলা প্রান্ত দুইটি একটি তার দিয়া সংযুক্ত করিয়া দাও। এখন পরীক্ষা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে—ঐ তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ **প্রবাহিত** হইতেছে। প্রবাহ বলিতে গতি বুঝায়, গতি থাকিলেই তাহার একটি **দিক** (direction) থাকিবে। বিদ্যুৎপ্রবাহ কোনদিক হইতে কোনদিকে যাইতেছে? উপরোক্ত ক্ষেত্রে, **তারের মধ্য দিয়া, তামার পাত হইতে দস্তার পাতে** (সুতরাং সেলের মধ্য দিয়া ঠিক ইহার বিপরীত দিকে) বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে।
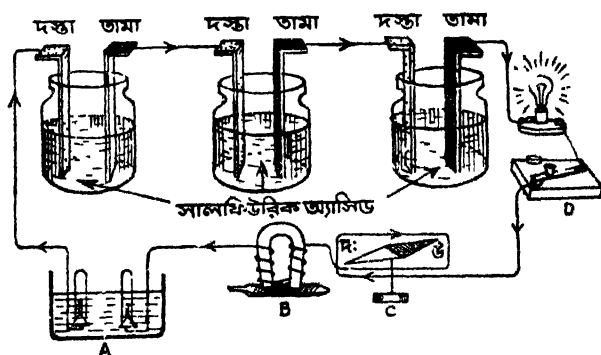
চিত্র নং ১৮৫ : ভোল্টীয় সেলের সাহায্যে বিদ্যুৎ সৃষ্টি, ও বিদ্যুৎপ্রবাহের ফল ; A—তড়িদ্-বিশ্লেষণ ; B—তড়িচ্চুম্বক, C—বিদ্যুৎ ও চুম্বকের পরস্পর ক্রিয়া, D—আলোক সৃষ্টি

এক্ষেত্রে তামার পাতকে **পজিটিভ মেরু** (positive pole) এবং দস্তার পাতকে **নেগেটিভ মেরু** (negative pole) বলা হইয়া থাকে। বিদ্যুৎ সৃষ্টির সহিত সালফিউরিক অ্যাসিড দ্রবণ বিশ্লেষিত হয় এবং তজ্জনিত

রাসায়নিক ক্রিয়ায় পাত দুইটিও ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে। যদি চিত্রের ন্যায় তিনটি সেলের পাতগুলি তার দিয়া একটির সঙ্গে একটি যোগ করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে একটি **ব্যাটারি** (battery অর্থাৎ একাধিক সেলের সংযোগ)—প্রস্তুত হইবে এবং উহা হইতে যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইবে তাহা দিয়া সহজেই টর্চের একটি বাল্ব জ্বালা যাইতে পারিবে। তার-সহ সমগ্র বিদ্যুৎ-পরিবাহী পথটিকে **বর্তনী** (circuit) বলে।

কিছুক্ষণ পরে লক্ষ্য করিবে যে বাতিটি নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে অর্থাৎ প্রবাহের শক্তি কমিয়া যাইতেছে। ইহার কারণ—সালফিউরিক অ্যাসিড বিশ্লেষণের ফলে যে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হইয়াছে উহা তামার পাতের উপর জমিয়া উহাকে আর অ্যাসিডের সংস্পর্শে আসিতে দিতেছে না, ফলে বিদ্যুৎ সৃষ্টি প্রায় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সাধারণ সেলের এই অঘটনটিকে **ছদন** বলে। একটি বুরুশ দিয়া বুদবুদগুলি ঘসিয়া সরাইয়া দিলে আলোটি আবার উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে অর্থাৎ বিদ্যুৎ-প্রবাহ পুনরায় জোরালো হইবে। এই ছদন নিবারণ করিবার জন্য নানা ব্যবস্থা উদ্ভাবিত হইয়াছে—তাহাদের কথা বিভিন্ন সেলের আলোচনা সম্পর্কে বলা যাইবে।
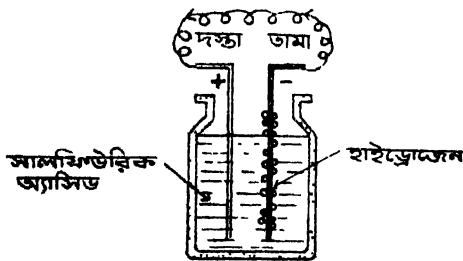
ছদন
(polarisation)

চিত্র নং ১৮৬ : ভোল্টীয় সেল ও উহার ছদন (+ – চিহ্ন দুইটি ভুলক্রমে উল্টাইয়া গিয়াছে)

বিদ্যুৎ চাপ (Electric pressure or Potential)

তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহকে আমরা **নদীর প্রবাহের** সহিত বা **জল-প্রপাতের** সহিত তুলনা করিতে পারি। এই সব ক্ষেত্রে জলের গতি কিরূপে সৃষ্টি হয়? নদীর খাত নদীর উৎপত্তিস্থল হইতে নদীর মুখের দিকে

ক্রমশঃ ঢালু হইয়া আসিয়াছে। জল-প্রপাতে নদীর এই খাত এক স্থানে হঠাৎ ঢালু হইয়া পড়ে বলিয়া সেখানে জলের বেগ কত শক্তিশালী হইয়াছে তাহাও আমরা জানি। সুতরাং বলিতে পারি নদীর খাতের দুইটি স্থানে উচ্চতার পার্থক্য যত বেশী হইবে উহাদের মধ্যের অংশে জলের গতিও তত বেশী হইবে। তা ছাড়া নদীতে জলের গতিপথে প্রস্তর, কাষ্ঠরাশি প্রভৃতি বাধা থাকিলে জলের গতি মন্দ হইয়া যায়। বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্ষেত্রেও সেইরূপ নানাপ্রকার বাধা সৃষ্টি করিয়া বিদ্যুতের শক্তিকে মন্দীভূত করিয়া দেওয়া যায়। বিদ্যুৎ ও জলের প্রবাহের এই সমধর্মিতা ক্রমশঃ আরও স্পষ্ট হইবে।

বিদ্যুৎ ও জলের প্রবাহের তুলনা

বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রিয়া বা ফল

ক। উত্তাপ সৃষ্টি

উপরে তড়িৎ সেল নির্মাণের পরীক্ষায় একটি টর্চের বাল্বের (bulb) মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইয়া উহাকে জ্বালানো যায় দেখিয়াছি। একটি তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে কি না তাহার একটি প্রমাণ হইল—এই পরীক্ষা। অবশ্য খুব মৃদু বিদ্যুৎপ্রবাহকে এইভাবে পরীক্ষা করা যায় না। বিদ্যুৎপ্রবাহে যে বিজলি বাতি জ্বলে তাহা তো আমরা নিত্যদিন দেখিতেছি। কিন্তু **কেন জ্বলে**? কারণ আর কিছুই নহে। উত্তাপ সৃষ্টি। কোনও তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিলে উহা ক্রমশ উত্তপ্ত হইয়া উঠে এবং যথেষ্ট উত্তপ্ত হইলে—তারটি প্রথমে লাল ও পরে সাদা হইয়া আলোক বিকিরণ করিতে থাকে। একটি লোহার দণ্ডকে গনগনে আগুনে কিছুক্ষণ রাখিলে উহা লাল হইয়া উঠে এবং এই অবস্থায় একটি অন্ধকার ঘরে উহাকে লইয়া গেলে দেখা যাইবে যে ঘরটিতে আলোকের কিছু আভাস পাওয়া যাইতেছে। আরও উত্তপ্ত করিলে উহা **গরম-লাল** (red hot) হইতে
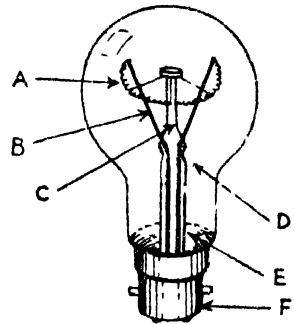
চিত্র নং ১৮৭ : বিজলি বাতি ; A তারটি বিদ্যুৎ প্রবাহের ফলে উত্তাপে সাদা হইয়া আলোক বিকিরণ করে

গরম-সাদা (white-hot) হইয়া উজ্জ্বল আলোক সৃষ্টি করিবে। উত্তাপ সৃষ্টি বিজলি বাতির মূল উদ্দেশ্য নহে—উদ্দেশ্য আলোক সৃষ্টি। তাই বাল্বের মধ্যে এমন ধাতুর বা সংকর ধাতুর তার ব্যবহার করা হয় যাহা সহজেই উত্তপ্ত হইয়া আলোক বিকিরণ করিতে পারে। অবশ্য তারটি যাহাতে পুড়িয়া না যায় সেজন্য বাল্বের মধ্য হইতে বাতাস বাহির করিয়া লইতে হইবে বা উহার ভিতরটি নিষ্ক্রিয় কোন গ্যাসে পূর্ণ করিয়া লইতে হইবে।

ইলেকট্রিক বাল্ব

ইলেকট্রিক **ইস্ত্রি, স্টোভ** (stove)—যাবতীয় উত্তাপ উৎপাদনের যন্ত্রে সেইরকম অন্য নানাপ্রকার উচ্চ রোধ (resistance) ও উচ্চ গলনাঙ্ক (metting point) যুক্ত সংকর ধাতুর তার ব্যবহার করা হয় যাহাতে উহারা
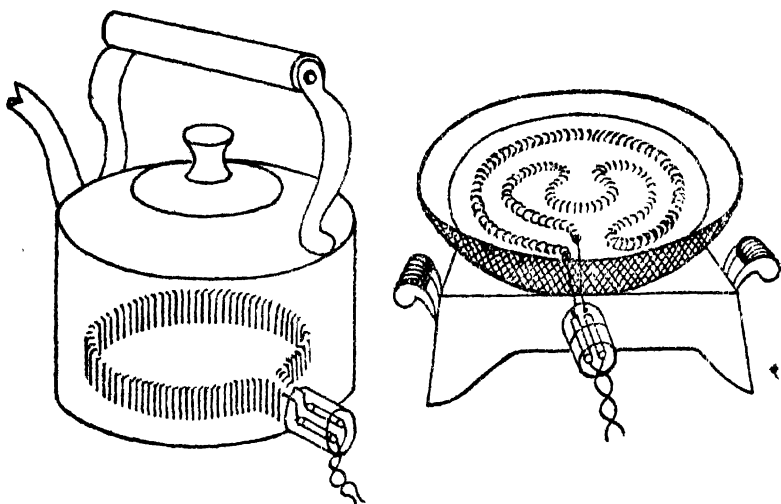
চিত্র নং ১৮৮, ১৮৯ : ইলেকট্রিক কেটলি ও স্টোভ; প্যাঁচ দেওয়া তারটি উত্তপ্ত হইয়া কেটলির জলকে উত্তপ্ত করিয়া দেয় (তারটি অবশ্য অন্তরিত (insulated) থাকে ; কেন ?)

সহজে উত্তপ্ত হইয়া উঠে, কিন্তু গলিয়া পুড়িয়া না যায়। নিকেল, লৌহ ও ক্রোমিয়মের মিশ্রণে উৎপন্ন **নাইক্রোম** (nichrome) বলিয়া একটি সংকর ধাতুর এই গুণ আছে বলিয়া ইহা

ইলেকট্রিক ইস্ত্রি, স্টোভ

এই সব যন্ত্রের তার তৈয়ারী করিতে ব্যবহার হয়। একই বিদ্যুৎবর্তনীতে সমান দৈর্ঘ্যের তামা ও নাইক্রোমের তারের নিকট হাত রাখিয়া উত্তাপের তারতম্য অনুভব কর। এখানে গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহার হয় এরূপ উত্তাপ-উৎপাদক কয়েকটি যন্ত্রের চিত্র দেওয়া হইল। যন্ত্রগুলিকে পর্যবেক্ষণ করিলে উহাদের মূল গঠন-কৌশলের কিছু আভাস পাওয়া শক্ত হইবে না। ইহাদের সম্বন্ধে পরে আবার বলা হইবে।

চিত্র নং ১৯০ঃ ইলেক্ট্রিক ইস্ত্রি, নাইক্রোমের তারটি অভ্রের পাতের উপর এইভাবে আঁকা বাঁকা করিয়া বসানো থাকে, কেন?
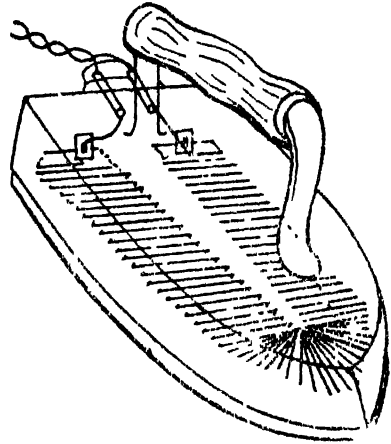
খ। চুম্বকত্ব (magnetic property)

একটি বৈদ্যুতিক তারকে টানিয়া সোজা করিয়া একটি কম্পাসের কাঁটার উপর সমান্তরালভাবে ধর এবং উহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত কর। দেখিবে কম্পাসের কাঁটাটি উত্তর-দক্ষিণ হইতে এক-দিকে কিছু ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। কম্পাসের কাঁটা **কোনদিকে ও কতখানি** ঘুরিয়া দাঁড়াইবে তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক ও উহার শক্তির উপর নির্ভর করিবে। একটু সাবধানে কাঁটাটির ঘুরিবার ভঙ্গি লক্ষ্য করিয়া যদি ঠিক সময় পরে পরে সুইচ
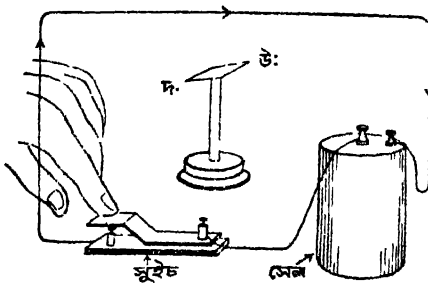
চিত্র নং ১৯১ঃ বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে তারের চুম্বকত্ব প্রাপ্তি—কম্পাসের কাঁটা ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে

টিপিয়া প্রবাহ একবার চালাও ও একবার বন্ধ কর তাহা হইলে দেখিবে দোলনার ন্যায় তালে তালে গতির অনুকূলে ধাক্কা খাইয়া কাঁটাটির এপাশ-ওপাশ ঘূর্ণনের পরিমাণ ক্রমশঃ বাড়িতেছে। কম্পাসের কাঁটাটি এইভাবে আন্দোলিত হইতেছে কেন? নিশ্চয় বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে পরিবাহী তারে কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছে। এই পরিবর্তন আর কিছুই নহে—উহার **চুম্বকত্ব** প্রাপ্তি। কারণ উপরের পরীক্ষায় যদি তারটিকে (অন্তরিত করিয়া) একটি **কাঁচা লোহার** (অর্থাৎ বিশুদ্ধ, নরম লোহা, ইস্পাত নহে) দণ্ডের (সোজা বা U-আকৃতির) চারিপাশে জড়াইয়া তারের মধ্যে বিদ্যুৎ চালাইয়া দাও তাহা হইলে একটি মজার ব্যাপার লক্ষ্য করা যাইবে: দেখিবে এই অবস্থায় তারের কুণ্ডলীর মধ্যস্থিত লোহার দণ্ডটি একটি চুম্বকের ধর্ম প্রাপ্ত হইয়াছে। দৃষ্টান্তক্রমে একটি লোহার পেরেক বা উখা উহার নিকটে আনিলে বস্তুটি আকৃষ্ট হইবে, একটি চুম্বকের কাঁটা সামনে ধরিলে উহার মুখ ঘুরিয়া অন্যদিকে দাঁড়াইবে ইত্যাদি। (১৮৫ নং চিত্র (B) দেখ।)

আরও লক্ষ্য কর—**বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে লৌহদণ্ডটির চুম্বকত্ব অন্তর্হিত হইয়াছে** অর্থাৎ উহা পুনরায় পূর্বের সাধারণ লৌহদণ্ডে পরিণত হইয়াছে। কাঁচা লোহার স্থলে **ইস্পাত** লইয়া পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে যদিও বিদ্যুৎপ্রবাহের সঙ্গে সঙ্গে ইস্পাতটি চুম্বকে পরিণত হইয়াছে কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিলে ইস্পাত খণ্ডটির চুম্বকত্ব দূর হইবে না অর্থাৎ উহাকে আবর্তন করিয়া বিদ্যুৎ চালনার ফলে উহা একটি **স্থায়ী চুম্বকে পরিণত হইয়াছে।**

বিদ্যুৎ ও কাঁচা লোহার মধ্যে উপরোক্ত সম্পর্ক কতকগুলি প্রয়োজনীয় যন্ত্রে কৌশলে প্রযুক্ত হইয়া মানুষের অশেষ উপকার সাধিত হইয়াছে। এখানে দুই একটির বিবরণ দেওয়া গেল :—

তড়িচ্চুম্বক (**electromagnet**)—ইলেকট্রিক ঘণ্টার মূল কৌশল হইল উপরোক্ত নীতিটি অর্থাৎ একটি কাঁচা লৌহখণ্ডের (U-এর ন্যায় বাঁকানো—ইহাতে দণ্ড-চুম্বক অপেক্ষা শক্তি অনেক বেশী হয়) চারিপার্শ্বে একটি অন্তরিত (insulated) তার জড়াইয়া ঐ তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ সঞ্চালন করিলে লৌহখণ্ডটি চুম্বকে পরিণত হয়। এই সরঞ্জামটিকে

তড়িচ্চুম্বক বলে—তড়িচ্চুম্বক অর্থাৎ যে চুম্বকের চুম্বকত্ব তড়িৎ-প্রবাহের উপর নির্ভর করে।

চিত্র নং ১৯২ : একটি লৌহখণ্ডকে বেষ্টন করিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে উহা চুম্বকে পরিণত হয় ; তারটি লৌহখণ্ডের দুই বাহুতে কি ভাবে জড়ানো হইয়াছে লক্ষ্য কর

তড়িচ্চুম্বকের শক্তি কিসের উপর নির্ভর করিবে ?—

১। বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি ;

২। কুণ্ডলীতে তারের পাকের সংখ্যা।

সুতবাং তড়িচ্চুম্বককে প্রয়োজনমত কম বা বেশী শক্তিশালী করিয়া প্রস্তুত করা যায় এবং সব চেযে বড সুবিধা যে ইচ্ছামত **একই চুম্বকে** বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি কখনও বাড়াইয়া, কখনও কমাইয়া ইহার চৌম্বক-শক্তিও বাড়ানো-কমানো যায় বা একেবারে অন্তর্হিত করা যায়। এই ধর্ম কৌশলে ব্যবহার করিযা টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, **ইলেকট্রিক ক্রেণ** (crane), **বৈদ্যুতিক ঘণ্টা** প্রভৃতি যন্ত্রের উদ্ভাবন সম্ভব হইয়াছে। এখানে একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার নির্মাণ-প্রণালী বর্ণনা করা যাইতেছে :—

বৈদ্যুতিক ঘণ্টা (**electric bell**)—এখানে বুঝিবার সুবিধার জন্য একটি বৈদ্যুতিক ঘণ্টার নক্সা-ছবিতে উহার অংশগুলির গঠন, অবস্থান ও পরস্পরের যোগাযোগ দেখানো হইল।

তড়িচ্চুম্বককে ঘণ্টা বাজাইবার কাজে কিরূপে ব্যবহার করা যায় ? তাহা হইলে ঘণ্টা বাজাইতে হইলে কি কি প্রয়োজন দেখা যাক :—

১। একটি ধাতুর বাটি ;

২। একটি ছোট হাতুড়ী ; একটি মোটা তারের মাথায় একটি ধাতুর বল জুড়িয়া দিয়া উহা তৈয়ারী করা যায় ;

৩। **হাতুড়ীটিকে একবার সামনে, একবার পিছনে আনা-গোনা করাইয়া ঘণ্টাটিকে আঘাত** করানো।

তৃতীয় ব্যবস্থাটি কার্যে পরিণত করিবার জন্য আবার তাড়িত চুম্বকের ধর্মের কথা চিন্তা কর: যদি লোহার হাতুড়ীটির দণ্ডের দিকের প্রান্ত একস্থানে দৃঢ়ভাবে আঁটা থাকে (১৯৩ নং চিত্র) তাহা হইলে দণ্ডটির মাঝ বরাবর একটা তড়িত চুম্বক রাখিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে চুম্বকের টানে লোহার হাতুড়িটি আগাইয়া গিয়া বাটিটিকে আঘাত করিবে এবং প্রবাহ বন্ধ করিলে হাতুড়ীটি **স্প্রিংএর মত** (কারণ এক প্রান্ত বদ্ধ) লাফাইয়া পূর্বস্থানে ফিরিয়া আসিবে। আবার প্রবাহ চালাইলে হাতুড়ীটি, চুম্বকের টানে আকৃষ্ট হইয়া সামনে আগাইয়া বাটিটিকে আঘাত করিবে ও প্রবাহ বন্ধ করিলে যথাস্থানে ফিরিয়া আসিবে। এইভাবে ঘণ্টা বাজানোর একটা ব্যবস্থা হইতে পারে।

হাতুড়ীর আগে-পিছে গতির সাহায্যে ঘণ্টাধ্বনি
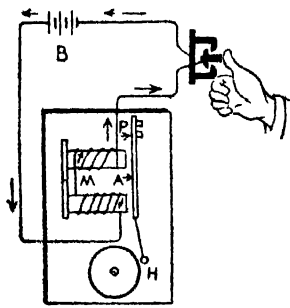
চিত্র নং ১৯৩: সরল বৈদ্যুতিক ঘণ্টা—সুইচ পর্যায়ক্রমে টিপিয়া ও ছাড়িয়া সবিরাম ঘণ্টাধ্বনি করা যায়

কিন্তু এ ব্যবস্থায় বারবার সুইচ টিপিতে ও ছাড়িতে হইবে এবং ঘণ্টার ধ্বনিতে মধ্যে মধ্যে বিরতি ঘটিবে। **একবার সুইচ টিপিয়া ধরিলাম ও ঘণ্টাটি একটানা বাজিয়া চলিল, এরূপ ব্যবস্থা** সম্ভব হয় না? নিশ্চয় হয়। পরের চিত্রটি দেখ—

বিদ্যুৎপ্রবাহ (১) T_1 বিন্দু হইতে শুরু করিয়া, (২) তড়িচ্চুম্বকের গায়ে জড়ানো তারের মধ্য দিয়া, (৩) হাতুড়ীর গোড়ার প্রথম অংশ P, (৪) উহাদের **পশ্চাতের B স্ক্রুর** ভিতর দিয়া T_2 বিন্দু হইয়া সুইচের মধ্য দিয়া সেলে ফিরিয়া আসিতেছে। **এইবার এই B স্ক্রুর দিকে একটু বিশেষ নজর দাও।** স্ক্রুটি আলগাভাবে হাতুড়ীটিকে **কেবলমাত্র স্পর্শ** করিয়া আছে, সুতরাং হাতুড়ীটি তড়িচ্চুম্বকের টানে যেমন একটু আগাইয়া যাইবে, অমনি উহার ও স্ক্রুর মধ্যে ফাঁক সৃষ্টি হইয়া ঐ স্থানে বিদ্যুৎপ্রবাহে ছেদ পড়িবে। তৎক্ষণাৎ বিদ্যুৎপ্রবাহের

অভাবে তড়িচ্চুম্বক আর চুম্বক রহিল না—সাধারণ এক খণ্ড লৌহে পরিণত হইল। সুতরাং হাতুড়ীর দণ্ডের উপর চুম্বকের আকর্ষণ রহিল না, কাজে কাজেই উহা স্প্রিং এর ন্যায় লাফাইয়া যথাস্থানে ফিরিয়া আসিল। আসিবামাত্র হাতুড়ীর দণ্ড ও স্ক্রুর মধ্যে পুনর্বার সংযোগ স্থাপিত হইল, ফলে তড়িচ্চুম্বকের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইল এবং

বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় তড়িচ্চুম্বকের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের কৌশল

আবার হাতুড়ী আগাইয়া ঘণ্টার বাটীতে আঘাত করিল। এই ভাবে সুইচ যতক্ষণ টিপিয়া ধরিয়া থাকিবে ততক্ষণ বিদ্যুৎপ্রবাহ **আপনা হইতেই একবার বন্ধ, একবার চলমান হইয়া** হাতুড়ীটিকে আসা-যাওয়া করাইবে অর্থাৎ ঘণ্টাটিতে আঘাতের পর আঘাত ঘটিয়া উহা বাজিয়া চলিবে।
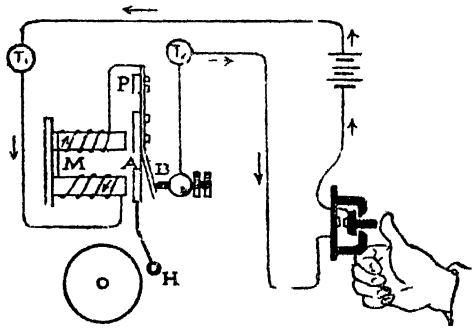
চিত্র নং ১৯৪ : বৈদ্যুতিক ঘণ্টা —বিদ্যুৎপ্রবাহের বর্তনীর পথ ভাল করিয়া লক্ষ্য কর

গ। রাসায়নিক ক্রিয়া (chemical action)

বিদ্যুৎপ্রবাহ বর্তনীর মধ্যে বিশেষ অবস্থায় রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটাইতে পারে যদিও গৃহস্থালীর কাজেকর্মে আমরা ইহার দৃষ্টান্ত দেখি না। কিন্তু আধুনিক শিল্পজগতে বিদ্যুতের এই রাসায়নিক শক্তির নানা প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। কোনও ভাল চামচ বা খেলার কাপ-শীল্ড ইত্যাদির উপর লক্ষ্য করিলে **E P N S** এই চারিটি অক্ষর খোদিত দেখিতে পাইবে। ইহাদের অর্থ Electro-Plated Nickel with Silver অর্থাৎ নিকেলে গড়া এই দ্রব্যগুলির উপরিভাগে বৈদ্যুতিক প্রক্রিয়ায় রৌপ্যের আস্তরণ (plating) সৃষ্টি করিয়া উহাদের নির্মাণ করা হইয়াছে। আমরা পরে দেখিব যে

অ্যালুমিনিয়ম, তামা প্রভৃতি নানা ধাতুকে তাহাদের মূল **ধাতুপ্রস্তর** (ores) হইতে **নিষ্কাশন** (extraction) করিবার বা অবিশুদ্ধ অবস্থা হইতে শোধন করিবার উদ্দেশ্যে আজকাল বিদ্যুতের এই **রাসায়নিক ক্রিয়ার সাহায্য**
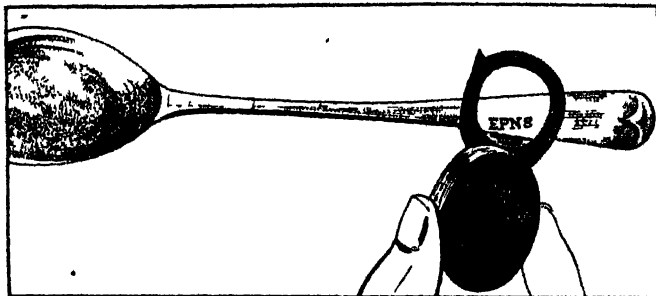
চিত্র নং ১৯৫ : চামচের গায়ে EPNS অক্ষর কয়টি লেন্সের সাহায্যে পরিষ্কার দেখা যাইতেছে

লওয়া হইতেছে। ইহাতে প্রচুর বিদ্যুৎশক্তির প্রয়োজন হয় এবং এইজন্যই বিদ্যুৎসৃষ্টির কারখানার নিকট এই সকল ধাতুর কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

পরীক্ষা ঃ একটি কাচের পাত্রের মধ্যে দুইটি কার্বন দণ্ড স্থাপন করিয়া উহাতে কিছু তুঁতের (১১৭ পৃষ্ঠা) দ্রবণ ঢালিয়া দাও এবং কার্বন দণ্ডের মাথা দুইটি একটি ব্যাটারির প্রান্ত-বন্ধনের (terminal) সহিত যোজন করিয়া দাও। এই সরঞ্জামটিকে **ভল্টামিটার** (voltameter) বলে। ভল্টামিটারের মধ্যে

তড়িদ্‌বিশ্লেষণ (electrolysis)
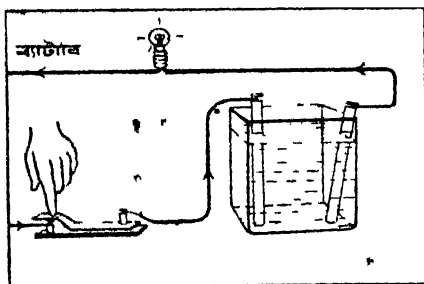
চিত্র নং ১৯৬ : তড়িদ্‌বিশ্লেষণের পরীক্ষা, ভল্টামিটারে জল ও বিভিন্ন যৌগের লবণ দ্রবণ লইয়া বর্তনীতে বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি লক্ষ্য কর

বিদ্যুৎ-পরিবাহক দণ্ড দুইটির নাম **তড়িৎ-দ্বার** (electrode) এবং যে

তড়িৎ-দ্বার দিয়া প্রবাহ ভল্টামিটারে প্রবেশ করে উহাকে **অ্যানোড** (anode) ও অপরটিকে **ক্যাথোড** (cathode) বলে। দেখিবে ভল্টামিটারের ক্যাথোডের উপর তামার কণিকার একটা লালচে স্তর ধীরে ধীরে সঞ্চিত হইতেছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত করিলে তামার কণিকা পুনরায় নূতন ক্যাথোডের উপর অর্থাৎ অপর দণ্ডটির উপর জমা হইতে থাকিবে। বিদ্যুৎবর্তনীর মধ্যে একটি ছোট বাল্ব সংযুক্ত করিয়া দিয়া (১) তুঁতের দ্রবণটিকে গাঢ় করিয়া, (২) কার্বন দণ্ড দুইটিকে কখনও কাছাকাছি, কখনও তফাৎ করিয়া দিয়া, (৩) তুঁতের দ্রবণের পরিবর্তে শুধু জল, অ্যাসিড-মিশ্রিত জল বা অন্য কোনও তরল পদার্থ লইয়া—নানাভাবে, বিভিন্ন অবস্থায় বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তির তারতম্য লক্ষ্য করিতে পার। (আলোটি কখনও জোরে, কখনও মৃদুভাবে জ্বলিবে; কেন?)

উপরের প্রক্রিয়াটিকে **ইলেক্‌ট্রোপ্লেটিং** (electroplating) বলে। পাত্রে তুঁতের দ্রবণের পরিবর্তে রৌপ্য-বা ক্রোমিয়ম-(chromium) ঘটিত কোনও লবণের দ্রবণ লইয়া চামচ, খেলার শীল্ড ইত্যাদি বস্তুকে ক্যাথোড করিয়া যদি বিদ্যুৎ চালানো যায় তাহা হইলে উহাদের উপর নূতন রৌপ্যের বা ক্রোমিয়মের একটি উজ্জ্বল স্তর পড়িয়া বস্তুটিকে নব কলেবর দান করিবে। এইভাবে—
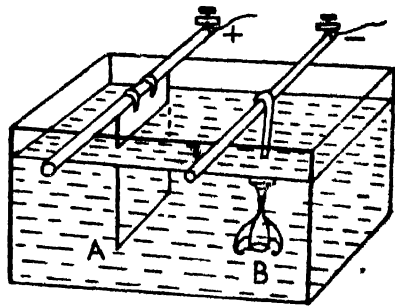
চিত্র নং ১৯৭ : ইলেকট্রোপ্লেটিং : ভল্টামিটার ; একটি পুরানো কাপকে ক্যাথোড (B) করিয়া সিলভার-নাইট্রেট দ্রবণ ও রৌপ্য অ্যানোডের (A) সাহায্যে কাপটির গায়ে রৌপ্যের নূতন স্তর ফেলা হইতেছে

১। পুরাতন বস্তুর নূতন রূপ দেওয়া যাইতে পারে;

২। লোহা প্রভৃতি মজবুত ধাতুর নির্মিত কোনও বস্তুর উপরিভাগে সহজে মরিচা ধরে না এমন ধাতুর (যেমন নিকেল বা ক্রোমিয়ম) স্তর সৃষ্টি করিয়া উহাকে মরিচা পড়ার উপদ্রব হইতে বাঁচানো যাইতে পারে;

৩। ঘর্ষণে ক্ষয়িত কোনও ধাতুর দ্রব্যকে (যেমন যন্ত্রের অংশ) বড করিয়া পূর্বাবস্থায় আনা যাইতে পারে।

উপরোক্ত ক্ষেত্রে লবণজাতীয় পদার্থের দ্রবণটি বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে বিশ্লিষ্ট হইয়া উহার ধাতব উপাদানটি একটি তড়িৎ-দ্বারের উপর সঞ্চিত হইতেছে। **শুধু জলের** মধ্যে (অবশ্য সামান্য একটু সালফিউরিক অ্যাসিড মিশাইয়া লইতে হইবে, কারণ বিশুদ্ধ জলের বৈদ্যুতিক রোধ (electrical resistance) অত্যন্ত বেশী বলিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতে পারে না) এইভাবে বিদ্যুৎ চালিত করিলে **জল বিশ্লিষ্ট হইয়া** হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনে পরিণত হইবে এবং তড়িৎ-দ্বার দুইটির উপর দুইটি টেষ্ট টিউব উল্টাইয়া রাখিয়া দিলে ক্যাথোডের টেষ্ট টিউবে হাইড্রোজেন ও অ্যানোডের টেষ্ট টিউবে অক্সিজেন সঞ্চিত হইবে। (চিত্র নং ১৮৫ (A) দেখ)

তড়িৎপ্রবাহের শক্তি

আজকাল বিদ্যুতের যুগে **ওয়াট** (watt), **অ্যাম্পিয়র** (ampere), **ভোল্ট** (volt), **ইউনিট** (unit)—প্রভৃতি পরিভাষাগুলি নিত্যব্যবহার্য শব্দ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের কতকগুলি সম্বন্ধে আমাদের মোটামুটি ধারণা আছে; যেমন ভোল্ট। ভোল্ট শব্দটি ব্যবহার করিয়া সচরাচর আমরা বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি নির্দেশ করিয়া থাকি। **"সাবধান ৪৪০ ভোল্ট"** এই জাতীয় সতর্কতাজ্ঞাপক বিজ্ঞাপন আজকাল রাস্তার ধারে বিদ্যুৎ-পরিবহনের তারের খুঁটিতে, লিফ্‌টের ঘরে, কারখানায়—নানা জায়গায় দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে আমরা তড়িৎপ্রবাহ সৃষ্টির ব্যাপারটি পর্যালোচনা করিয়া উপরোক্ত পারিভাষিক শব্দগুলির অর্থ বুঝিতে চেষ্টা করিব।
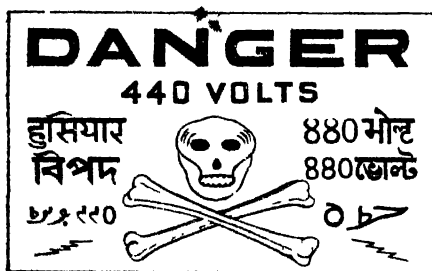
চিত্র নং ১৯৮: উচ্চ চাপের বিদ্যুৎপ্রবাহের বিপদ হইতে সাবধান করিবার পরিচিত বিজ্ঞাপন

বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রকৃতি বুঝিবার উদ্দেশ্যে ইহার সহিত জলের প্রবাহের তুলনাটি বেশ যুক্তিপূর্ণ ও মূল্যবান। নিম্নের চিত্রটি দেখ। এখানে দুইটি বেলজারের মধ্যের যোজক নলটি খুলিয়া দিলে যে পাত্রে জলের তল বেশী উঁচুতে রহিয়াছে (জলের পরিমাণ বেশীর জন্য নহে) সেই পাত্র হইতে অপর পাত্রে জল প্রবাহিত হইবে (৮০ পৃষ্ঠা দেখ)। বিভিন্ন ভাবে পরীক্ষা করিয়া দেখা যায় যে এই প্রবাহের শক্তি নির্ভর করিবে—

বিদ্যুৎপ্রবাহের সহিত জলের প্রবাহের তুলনা

ক। উভয় পাত্রে জলতলের উচ্চতার পার্থক্যের উপর,

খ। নলটি মোটা না সরু তাহার উপর;

গ। নলটি কত লম্বা তাহার উপর।
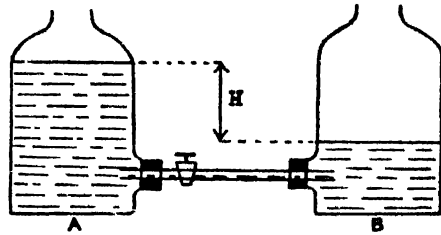
চিত্র নং ৭৯ : A পাত্রের জল B পাত্রের মধ্যে প্রবাহিত হইবে

আমাদের সাধারণভাবে ধারণা আছে যে জল একটি পাত্রে যত উঁচুতে রাখা হইবে ততই উহার চাপ বেশী হইবে এবং উহা তত জোরে পাত্রের সহিত সংযুক্ত নল বাহিয়া নীচে নামিতে থাকিবে। সহরে জল-সরবরাহ এই নীতির উপরই নির্ভর করে। দুইটি পাত্রে জল একই তলে থাকিলে সংযোগকারী নল দিয়া জল প্রবাহিত হইবে না। তা ছাড়া মোটা পাইপ দিয়া যে বেশী পরিমাণ জল বহিয়া যাইতে পারে ইহাও অতি সাধারণ অভিজ্ঞতা। তৃতীয়তঃ, ঐ জল সরবরাহের দৃষ্টান্ত হইতেই আমরা দেখিতে পাই কলিকাতায় টালার কাছাকাছি (যেখানে ফিল্টার করা জল উঁচুতে ট্যাঙ্কে তুলিয়া রাখা হইয়াছে) যে সব বাড়ী আছে সেগুলিতে দোতলায়, তিনতলায় স্বচ্ছন্দে কলের জল পাওয়া যায়, আর দূরে বালীগঞ্জ বা টালীগঞ্জ অঞ্চলে দীর্ঘ নল বাহিয়া যাইবার পর প্রবাহের শক্তি এত কমিয়া যায় যে জল একতলাতেই ভাল করিয়া পাওয়া যায় না।

ঠিক তেমনি একটি **বিদ্যুৎবর্তনীতে** (**electrical circuit**) **বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি** নির্ভর করে—

ক। বিদ্যুতের চাপের উপর—ইহাকেই ভোল্ট বলে;

খ। তার কত সরু বা মোটা তাহার উপর: সরু হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ কম ও মোটা হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ বেশী হইবে;

গ। তারটি কত দীর্ঘ তাহার উপর: তার যত বেশী দীর্ঘ হইবে বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি তত কমিয়া যাইবে।
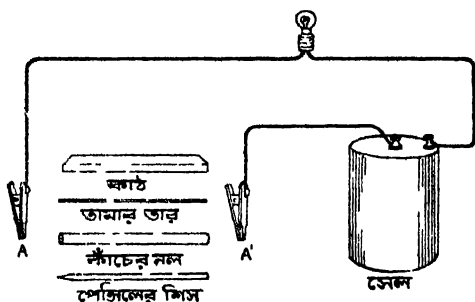
চিত্র নং ২০০: বিভিন্ন পদার্থের বৈদ্যুতিক পরিবাহিতার পরীক্ষা, A ও A'এর মধ্যে সমান দৈর্ঘ্যের বস্তুগুলি বর্তনীতে যোজন করিয়া আলোর উজ্জ্বলতা লক্ষ্য কর

পরিবাহিতা (conductivity)—বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রথম কথা হইল পরিবাহক তারের **পরিবাহিতা**। একটি ব্যাটারীর দুই প্রান্ত-বন্ধন তামার তারের সাহায্যে একটি ছোট্ট বাল্বের সহিত যোজন করিয়া দাও—দেখিবে বাল্বটি জ্বলিতেছে। এখন তারের কিছু অংশ সরাইয়া উহার স্থলে একই দৈর্ঘ্যের (১) **কাচের নল**, (২) **কাঠের দণ্ড**, (৩) **পেন্সিলের শিস** ইত্যাদি যোজন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ—বাল্বটির উজ্জ্বলতা কম-বেশী হইতেছে বা কখনও উহা একেবারেই জ্বলিতেছে না। ইহা হইতে বোঝা যায় যে সকল পদার্থ সমানভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন করিতে পারে না। এইভাবে পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থকে দুইটি বড় শ্রেণীতে ভাগ করা যায়:—

ক। **পরিবাহী** (conductors)—সকল প্রকার **ধাতু**; অধাতুর মধ্যে **অঙ্গার** (carbon);

খ। **অপরিবাহী** (non-conductors বা insulators)—কাচ, রবার, চীনামাটি, সিল্ক, তুলা, কাগজ, মোম, প্লাষ্টিক (plastic), বাতাস প্রভৃতি।

সুতরাং যেখানে বিদ্যুতের উত্তম পরিবহন প্রয়োজন সেখানে আমরা পরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করিব, যেখানে উহার পরিবহন রোধ করা প্রয়োজন সেখানে অপরিবাহী পদার্থ ব্যবহার করিব।

বিদ্যুৎচাপ বা ভোল্ট (volt)—বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বিতীয় কথা হইল—বিদ্যুতের চাপ। **এই চাপকে যে এককে (unit) মাপা হয় তাহার নাম ভোল্ট।** জলের চাপ না থাকিলে জল প্রবাহিত হইবে না, তেমনি বিদ্যুৎবর্তনীতে চাপ না থাকিলে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইবে না। বিদ্যুতের এই চাপ উৎপন্ন হয় বিদ্যুৎ-উৎপাদকের (তড়িৎ সেল, ডায়নামো প্রভৃতি) মধ্যে। একটি টর্চের ব্যাটারিতে এই চাপ মাত্র ২৷৩ ভোল্ট, বাড়ীর বৈদ্যুতিক তারে বিদ্যুতের চাপ সাধারণতঃ ২২০ ভোল্ট (আমেরিকায় ১১০ ভোল্ট)। ট্রামের তারে ও ইলেকট্রিক ট্রেনের তারে বিদ্যুতের চাপ যথাক্রমে ৪৫০ ও ২৫,০০০ ভোল্ট। কারখানার নানা কাজে প্রয়োজন অনুযায়ী এই সকল প্রকার ভোল্টের বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যবহার করা হয়। আকাশের বিদ্যুৎ-চমকে (অবশ্য উহা স্থিতীয় বিদ্যুৎ) ২০ কোটি ভোল্ট পর্যন্ত চাপ সৃষ্টি হয়। প্রসঙ্গতঃ একটি মজার ব্যাপার জানিয়া রাখ—২০০ ভোল্ট চাপে মানুষের মৃত্যু পর্যন্ত ঘটিতে পারে, কিন্তু লক্ষ ভোল্ট বা আরও বেশী চাপে মানুষের কোনই ক্ষতি হয় না—প্রমাণিত হইয়াছে।

রোধ (resistance)—বিদ্যুৎপ্রবাহে **রোধ** বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করে। পাইপ সরু হইলে জলের প্রবাহে বাধা সৃষ্টি হয়, তেমনি তার সরু হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধা উৎপন্ন হয়। আবার পাইপ লম্বা হইলে যেমন জলের প্রবাহের শক্তি কমিয়া যায়, তেমনি তার লম্বা হইলেও বিদ্যুৎপ্রবাহে অধিকতর বাধা সৃষ্টি হইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি কমিয়া যায়। বিদ্যুতের **রোধ মাপিবার এককের নাম ওম (ohm)।**

তাহা হইলে বিদ্যুৎপ্রবাহে **ভোল্ট ও রোধ পরস্পর বিরোধী** শক্তি। এই উভয়ের সমবেত ক্রিয়ার ফলে একটি বিদ্যুৎবর্তনীতে **যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হয় তাহার শক্তিকে মাপিবার এককের নাম আম্পিয়র (ampere)।** আম্পিয়র হইল বিদ্যুৎপ্রবাহের হার **(rate),** (বিদ্যুৎপ্রবাহের পরিমাণ (quantity) নহে) অর্থাৎ একটি **নির্দিষ্ট**

সময়ে, একটি নির্দিষ্ট **পরিমাণ** বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে তাহাকে আম্পিয়র বলা হয়।

বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চুম্বকের পরস্পর ক্রিয়া

পূর্বে (২০৩ পৃষ্ঠা) বিদ্যুৎপ্রবাহের ক্রিয়া বা ফল প্রসঙ্গে চৌম্বকশক্তির উল্লেখ করা হইয়াছে। এখানে বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চৌম্বকশক্তির পরস্পর সম্পর্কের কথা আর একটু বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা যাক।

আম্পিয়রের নিয়ম (Ampere's Rule)

পরীক্ষাঃ মনে কর (২০১ নং চিত্র) একটি কম্পাসের কাঁটা এবং ঠিক উহার উপরে একটি তারকে সমান্তরালভাবে রাখিয়া ব্যাটারির সাহায্যে তারটির মধ্য দিয়া তীর-চিহ্ন নির্দেশিত দিকে বিদ্যুৎ চালাইয়া দেওয়া হইয়াছে। এই অবস্থায় কম্পাসের কাঁটাটি কোন দিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইবে?
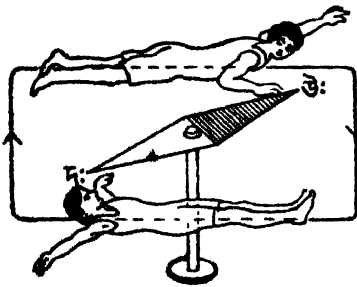
চিত্র নং ২০১ : আম্পিয়রের নিয়ম—কম্পাস-কাঁটার উত্তর মেরু উপরোক্ত অবস্থায় সাঁতারুর বাম হাতের দিকে ঘুরিয়া থাকিবে

ইহার নিয়মটি মনে রাখিবার সহজ উপায় হইল এই—

যদি সব সময় **কম্পাসের দিকে মুখ রাখিয়া** বিদ্যুৎপ্রবাহ অভিমুখে তার বাহিয়া সাঁতার কাটিয়া যাইতেছ কল্পনা কর তাহা হইলে তোমার বাম হাত যে দিকে থাকিবে কম্পাস-কাঁটার উত্তর মেরুটি সেই দিকে ঘুরিবে। ইহাকে **আম্পিয়রের নিয়ম** বলে।

পরীক্ষাঃ এইবার ব্যবস্থাটি অন্য রকম করা যাক: দুই মুখ খোলা একটি মোটা কাচের নলের একটি মুখ প্রথমে ছিপি দিয়া আঁটিয়া উহার মাঝামাঝি ফুটা করিয়া একটি দণ্ড-চুম্বকের উত্তর মেরু নলটির ভিতর অল্প কিছু দূর প্রবেশ করাইয়া যাও। এইবার খোলা মুখটি উপরের দিকে রাখিয়া নলটির মধ্যে কিছু পারদ ঢালিয়া দাও এবং একটি ব্যাটারির বর্তনীর

একপ্রান্ত ছিপির মধ্য দিয়া ঢুকাইয়া ঐ পারদে ডুবাইয়া রাখ। এখন নলের উপরের মুখটিও ছিপি দিয়া বন্ধ করিয়া উহার মধ্য দিয়া ব্যাটারির বর্তনীর অপর প্রান্তটি ঢুকাইয়া উহা হইতে একখণ্ড সোজা তার ফাঁস দিয়া ঝুলাইয়া দাও যেন উহার নিম্ন প্রান্ত পারদে আলগাভাবে ডুবিয়া থাকে। এখন বর্তনীর মধ্য দিয়া জোরালো বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইলে লম্বমান সোজা তারটি চুম্বকের মেরুর চারি-পাশে ঘুরিতে থাকিবে। এই পরীক্ষায় **তারটি সচল, কিন্তু চুম্বকটি স্থির,** অর্থাৎ পূর্বের পরীক্ষায় অবস্থা যাহা ছিল এখানে ঠিক তাহার বিপরীত হইয়াছে। এখানে দেখা যাইবে যে তারটি উহাতে বিদ্যুৎ-প্রবাহ চালিত করিবার পূর্বে যে অবস্থানে ছিল, বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে ঐ অবস্থান হইতে উপরোক্ত আম্পিয়রের নিয়মে ঘুরিয়া যাইতেছে। বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তন করিয়া দিলে ঘূর্ণনের দিকও পরিবর্তিত হইবে। সুতরাং দেখা গেল—বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চুম্বক পরস্পরের দ্বারা একই নিয়মে প্রভাবিত হয়।
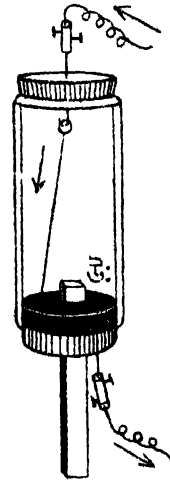
চিত্র নং ২০২ : বিদ্যুৎপ্রবাহ ও চুম্বকের পরস্পর প্রভাব ; চিত্রে লম্বমান তারটি উঃ মেরুর চারি-ধারে ঘড়ির কাঁটার দিকে অথবা বিপরীত দিকে ঘুরিবে বল।

বার্লো-চক্র (Barlow's Wheel)—এই মজার যন্ত্রটিও উপরোক্ত নীতির প্রয়োগে উদ্ভাবিত। গভীরভাবে কিনারা-কাটা (অর্থাৎ তারা-আকৃতি) একটি তামার চক্রের কেন্দ্রের ভিতর দিয়া একটি অনুভূমিক (horizontal) অক্ষ (C) আছে। চক্রটি ঐ অক্ষকে কেন্দ্র করিয়া বিনা বাধায় ঘুরিতে পারে। অক্ষসমেত চাকাটিকে একটি কাঠের আধারের (stand)—ABC—উপর বসানো হইয়াছে। আধারের যে পীঠ (base)—AD—আছে উহার মধ্যস্থলে একটি ছোট গর্তে (M) কিছু পারদ রাখা হইয়াছে, যাহাতে চাকাটি ঘুরিলে একটির পর একটি দাঁতের অগ্রভাগ ঐ পারদ স্পর্শ

করে। এইবার ছবিতে যেরূপ দেখানো হইয়াছে (ভাঙ্গা লাইনের সাহায্যে) ঐ ভাবে একটি ব্যাটারির পজিটিভ ও নেগেটিভ প্রান্ত-বন্ধনের সহিত যথাক্রমে অক্ষ (C) ও পারদের (M) যোজন (connection) করিয়া দাও এবং একটি অশ্বক্ষুরাকৃতি চুম্বক (NS) এমন ভাবে পীঠের উপর স্থাপন কর যেন পারদ-পাত্রটি চুম্বকের দুই মেরুর মধ্যস্থলে থাকে। দেখিবে —চক্রটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিয়া চলিযাছে। বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিক পরিবর্তন করিলে অথবা চুম্বকের মেরু দুইটির অবস্থান ঘুরাইয়া দিলে চক্রের ঘূর্ণনের দিকও পরিবর্তিত হইবে।
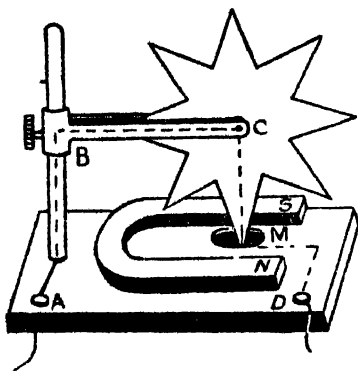
চিত্র নং ২০৩ : বার্লো-চক্র ; A হইতে BCM এর অভিমুখে···নির্দেশিত পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিলে চাকাটি ঘড়ির কাঁটার বিপরীত দিকে ঘুরিতে থাকিবে (আম্পিয়ারের নিয়ম খাটিতেছে কিনা ভাবিয়া দেখ)

তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ

(Electro-magnetic Induction)

তড়িৎ সেল যদি বিদ্যুৎ উৎপাদনের একমাত্র উপায় হইত তাহা হইলে বোধ হয় টেলিগ্রাফ বা বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ছাড়া বিদ্যুতের আর বিশেষ কোনও প্রয়োগ আমাদের জীবনে দেখিতে পাইতাম না। ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত ইংরাজ বৈজ্ঞানিক **মাইকেল ফ্যারাডে** (Michael Faraday) একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার করিলেন। নিম্নের পরীক্ষাটি ফ্যারাডের নূতন আবিষ্কারের মূল সূত্রটি বুঝিতে সাহায্য করিবে—

পরীক্ষা : একটি কাঠের বা পিচবোর্ডের ফাঁপা সিলিণ্ডারের (cylinder) চারিধারে একটি বিদ্যুতের তার স্ক্রু-এর ভঙ্গীতে জড়ানো হইয়াছে এবং এই **কুণ্ডলীর** (coil) তারের প্রান্ত দুইটি একটি গ্যালভানোমিটারের সহিত

যোজিত করা হইয়াছে। স্পষ্টই এখন এই কুণ্ডলীতে (circuit) বিদ্যুতের কোনও সম্পর্ক নাই, সুতরাং গ্যালভানোমিটারে বিদ্যুৎপ্রবাহের কোনও
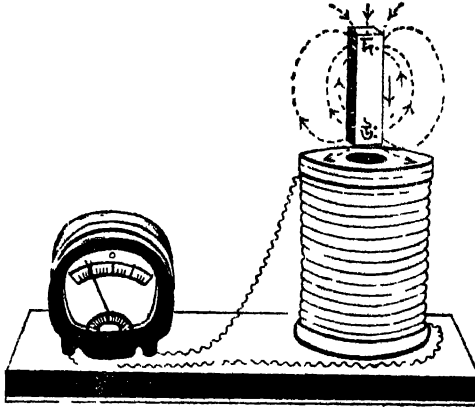
চিত্র নং ২০৪ ত'ড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (১), দণ্ড-চুম্বকটি কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করাইবার সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটা বাম দিকে ঘুরিয়া যাইতেছে

লক্ষণ পাওয়া যাইবে না। এইবার একটি লম্বা দণ্ড-চুম্বক লইয়া দ্রুতগতিতে কুণ্ডলীর মধ্যে প্রবেশ করাইয়া দাও। সঙ্গে সঙ্গে গ্যালভানো-

চিত্র নং ২০৫. তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (২); দণ্ড চুম্বকটি স্থির অবস্থায় থাকিলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা নড়ে না
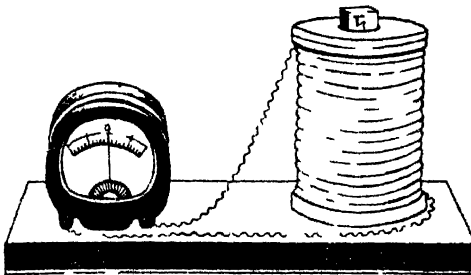
মিটারের কাঁটা একদিকে ঘুরিয়া সামান্য পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহের নির্দেশ দিবে। পরে কুণ্ডলীর মধ্যে যখন চুম্বকটিকে স্থির অবস্থায় ধরিয়া রাখা হইবে

তখন আর কুণ্ডলীর তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ থাকিবে না। আবার যখন চুম্বকটিকে দ্রুতগতিতে কুণ্ডলীর মধ্যদেশ হইতে টানিয়া বাহির করিয়া লওয়া
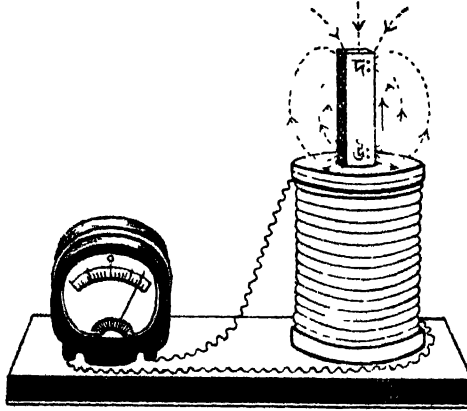
চিত্র নং ২০৬ : তড়িৎ চুম্বকীয় আবেশ (৩) ; দণ্ড চুম্বকটি কুণ্ডলী হইতে বাহির করিয়া লইবার সময় গ্যালভানোমিটারের কাঁটা ডানদিকে ঘুরিয়া যাইতেছে

হইবে তখন গ্যালভানোমিটারটিতে আর একবার বিদ্যুৎপ্রবাহের নির্দেশ পাওয়া যাইবে, কিন্তু এবার বিপরীত দিকে।
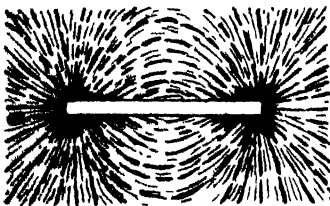
চিত্র নং ২০৭ : চৌম্বক-ক্ষেত্র ; লোহাচুরগুলির বিন্যাস ভঙ্গী হইতে চুম্বকের বল চারিপাশে কি ভাবে ছড়াইয়া আছে বুঝা যায়

সুতরাং দেখা গেল—একটি চুম্বককে একটি তারের কুণ্ডলীর মধ্যে দ্রুত **আনাগোনা করাইয়া** কুণ্ডলীর তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়।

আমরা কল্পনা করিতে পারি যে **চুম্বকের বল** (force) তাহার চতুষ্পার্শ্বের স্থানে একটি বিশেষ ভঙ্গীতে ছড়াইয়া আছে, নচেৎ চুম্বক দূর হইতে একখণ্ড লোহাকে একটি দিকে আকর্ষণ করে কি করিয়া? এইজন্য চুম্বকের চতুষ্পার্শ্বের স্থানকে **চৌম্বক-ক্ষেত্র** (magnetic

field) বলা হয়। সুতরাং উপরোক্ত পরীক্ষায় বলিতে পারি কুণ্ডলীটি একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রের মধ্যে অবস্থান করিতেছে এবং চুম্বকটির গতির জন্য এই **চৌম্বক-ক্ষেত্রের** (অর্থাৎ চুম্বকের বল যে ভঙ্গীতে চতুষ্পার্শ্বের স্থানে ছড়াইয়াছিল তাহার) **পরিবর্তন ঘটিতেছে**। সুতরাং ফ্যারাডে

ফ্যারাডের সূত্র

এই সূত্র আবিষ্কার করিলেন যে একটি কুণ্ডলী যদি একটি চৌম্বক-ক্ষেত্রে অবস্থান করে এবং কোনও কারণে ঐ চৌম্বক-ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটে (যেমন চুম্বকের গতি) তাহা হইলে কুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইবে। এই ব্যাপারটিকে **তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ** (electro-magnetic induction) বলে। উপরোক্ত পরীক্ষায় যদি আমরা **চুম্বকটিকে** কুণ্ডলীর মধ্যে অক্ষ (axis) বরাবর **স্থির রাখিয়া** কুণ্ডলীটিকে চুম্বক বরাবর আনাগোনা করাই তাহা হইলেও কুণ্ডলীর চতুষ্পার্শ্বের চৌম্বক-ক্ষেত্রের পরিবর্তন ঘটিবে (আপেক্ষিক ভাবে) এবং সে ক্ষেত্রেও একই নীতিতে আমরা কুণ্ডলীর মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিতে পারিব।
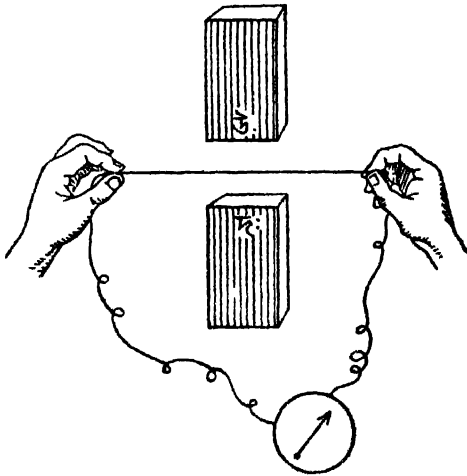
চিত্র নং ২০৮ : তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ (৩) ; তারটিকে এইভাবে উ: মেরু ও দ: মেরুর মধ্যে ওঠানামা করাইলে গ্যালভানোমিটারের কাঁটা এপাশ-ওপাশ করিবে

পরীক্ষা ঃ কুণ্ডলীর পরিবর্তে ২০৮ নং চিত্রের ন্যায় একটি তারের দুই প্রান্ত একটি গ্যালভানোমিটারের সহিত যুক্ত করিয়া তারের মধ্যস্থ একটি অংশকে টান করিয়া ধরিয়া যদি দ্রুতগতিতে দুইটি চুম্বকের দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে লম্বভাবে ওঠানামা করানো যায় তাহা হইলেও যে ঐ তারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইবে তাহা গ্যালভানোমিটারের কাঁটার গতিতে লক্ষ্য করা যাইবে। আরও লক্ষ্যণীয়—তারের ওঠানামার সঙ্গে বিদ্যুৎ-প্রবাহের দিকও পরিবর্তিত হইবে।

ডায়নামো (dynamo)

উপরোক্ত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশই বিদ্যুৎ সৃষ্টির বিখ্যাত যন্ত্র **ডায়নামো** উদ্ভাবনের মূলে রহিয়াছে।

পরীক্ষা ঃ চিত্রের ন্যায় যদি একটি **তারের ফাঁসকে** (loop) দ্রুতগতিতে দুইটি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে ঘোরানো যায় তাহা হইলে উহার মধ্যে উপরোক্ত নিয়মে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইবে। ইহাই হইল ডায়নামোর একটি সরল রূপ। লক্ষ্য কর—ঘূর্ণনের সময় ফাঁসটির এক পার্শ্ব উঠিতেছে, অপর পার্শ্ব নামিতেছে।
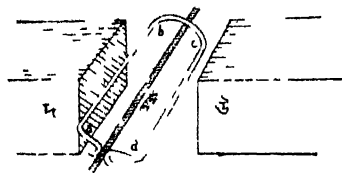
চিত্র নং ২০৯ : ডায়নামোর মূল নীতি—abcd তারের ফাঁসটিকে দুই বিপরীত মেরুর মধ্যে ঘোরানো হইতেছে

পূর্বের পরীক্ষায় দেখিলাম বিদ্যুৎপ্রবাহটি এরূপ ক্ষেত্রে তারের মধ্যে **একবার এদিক, একবার ওদিক** করিবে। এইরূপ বিদ্যুৎপ্রবাহকে **পরিবর্তী প্রবাহ** (alternating current) বলে। যান্ত্রিক ব্যবস্থা কৌশলে এরূপ করা যায় যাহাতে **ফাঁসটি একদিকে ঘুরিলেও** বিদ্যুৎ-প্রবাহ পরিবর্তী না হইয়া **একমুখী** (direct) হইবে এবং তখন আমরা ডায়নামোর সাহায্যে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপাদন করিতে পারিব। তড়িৎ সেল হইতে উৎপন্ন বিদ্যুৎশক্তির একটা সীমা আছে, কিন্তু ডায়নামোর মধ্যে চুম্বকের শক্তি ও ফাঁসের ঘূর্ণনগতি বাড়াইয়া ইচ্ছামত প্রচণ্ড শক্তিশালী বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায়। বিদ্যুৎ যে আজ আমাদের আজ্ঞাবহ দাস

হইয়া আলাদীনের প্রদীপের দৈত্যের ন্যায় দুনিয়ার সহস্র প্রয়োজন মিটাইতেছে তাহা এই ডায়নামোর দৌলতেই সম্ভব হইয়াছে এবং ইহার সৃষ্টির পশ্চাতে রহিয়াছে মাইকেল ফ্যারাডের আবিষ্কৃত এই তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ।

বৈদ্যুতিক মোটরের (motor) আলোচনা প্রসঙ্গে আবার আমরা ডায়নামোর কথায় ফিরিয়া আসিব।

বিভিন্ন জাতীয় তড়িৎ সেল (Electric cells)

এইবার আমরা বিভিন্ন প্রকার তড়িৎ সেলের কিছু বিস্তৃত বিবরণ দিব। ভল্টার তড়িৎ সেলের আলোচনা প্রসঙ্গে তড়িৎ সেলের মূল নীতিগুলি সম্বন্ধে প্রথমেই আলোচনা করা হইয়াছে। ভল্টার তড়িৎ সেল যে বিশেষ কার্যকরী নহে, এবং কেন নহে, তাহাও বলা হইয়াছে। নিম্নে বর্ণিত সেল দুইটি কিন্তু বিদ্যুৎ উৎপাদনের প্রয়োজনে নানাভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাদের কথা এইবার বলা যাইতেছে—

ডেনিয়েল সেল (Daniell cell)

ইহার গঠনপ্রণালী এইরূপ—
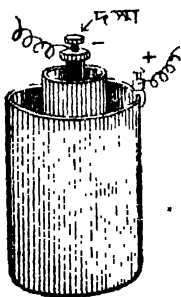
চিত্র নং ২১০ : ডেনিয়েল সেল
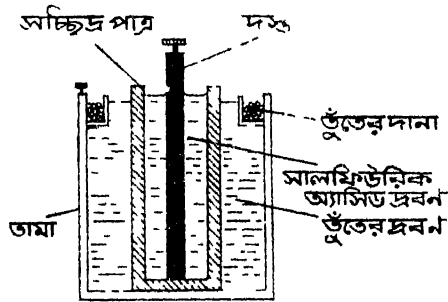
চিত্র নং ২১১ : ডেনিয়েল সেলের লম্বচ্ছেদ : পাশের চিত্রের সহিত মিলাইয়া দেখ

একটি তামার পাত্রে তুঁতের সম্পৃক্ত (saturated) দ্রবণ আছে। আর একটি বহুরন্ধ্র পাত্রে (porous) (যেমন চীনামাটির প্রস্তুত কোনও আধার) লঘু (dilute) সালফিউরিক অ্যাসিড ও উহার মধ্যে একটি দস্তার দণ্ড রাখিয়া

সমগ্র পাত্রটি প্রথম পাত্রের মধ্যে ডুবাইয়া দেওয়া হয়। দস্তার দণ্ডটিকে পূর্বে পারদে ডুবাইয়া উহাকে **পারদ-মিশ্র** (amalgam) করিয়া লওয়া হয় (ধাতুর সহিত পারদের সহজেই মিশ্রণ ঘটে—ইহাকে পারদ-মিশ্র বলে ; উপরোক্ত ক্ষেত্রে দস্তার দণ্ডটির উপরিভাগে দস্তা ও পারদের মিশ্রণের একটি স্তর পড়িয়া যায়)। তামার পাত্রেব ভিতরের গায়ে, উপরের দিকে ঝোলানো-বারান্দার (balcony) ন্যায় দুইটি ছোট তাক আছে—উহাদের তলা ঝাঁঝরার ন্যায় ছিদ্র বিশিষ্ট। ঐ তাকে **তুঁতের কেলাস** (crystals) রাখা হয় এবং তাক দুইটি বাহিরের তুঁতেব দ্রবণে ডুবিয়া থাকে ; উদ্দেশ্য—তামার পাত্রের মধ্যে তুঁতের দ্রবণকে সবদা সম্পৃক্ত রাখা। তামার পাত্রের কিনারায় একটি, ও দস্তাব দণ্ডে একটি, বিদ্যুতের তার যোজন করিবার **প্রান্ত-বন্ধন** (binding screw) থাকে। এই সেলে **তামার পাত্রের গাত্র পজিটিভ** মেরু ও **দস্তা নেগেটিভ** মেরু। অন্য আর এক প্রকার ব্যবস্থায় তামার পাত্রের স্থলে একটি বড মুখওয়ালা **কাচের বোতল** লইয়া উহাব মধ্যে পজিটিভ মেরু হিসাবে **স্বতন্ত্র একটি তামার দণ্ডও** ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এই সেলের ভোল্টশক্তি (voltage) প্রায় অপরিবর্তিত থাকে, কাবণ এই সেলে ছদন (polarisation) ঘটিতে পারে না ; যেহেতু দস্তা ও সালফিউরিক অ্যাসিডের ক্রিয়ায় উৎপন্ন **সদ্যোজাত** (nascent) **হাইড্রোজেন** (এই হাইড্রোজেন খুব শক্তিশালী) অপর মেরুতে গিয়া তুঁতের দ্রবণকে বিশ্লিষ্ট করিয়া তামা ও সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এবং এইভাবে হাইড্রোজেন রাসায়নিক ক্রিয়ায় ব্যয়িত হইয়া যাওয়ায় বুদ্‌বুদ আকারে তামার মেরুর উপর জমিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে না।

ছদন ঘটে না কেন

লেক্লান্সে সেল (**Leclanche cell**)

লেক্লান্সে নামে একজন ফরাসী বৈজ্ঞানিক একটি সেল উদ্ভাবন করেন—উহা অল্প খরচে প্রস্তুত করা যায় এবং দীর্ঘস্থায়ীও বটে। উদ্ভাবকের নামানুসারে ইহার নাম লেক্লান্সে সেল। এই সেলে একটি বহুরন্ধ্র (porous) পাত্রে একটি **কার্বনের দণ্ড** থাকে এবং উহার চারিপাশে বেশ করিয়া **ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড** ও **কার্বনের** গুঁড়া

ঠাসিয়া দিয়া পাত্রসমেত একটি মোটা মুখওয়ালা কাচের বোতলে বসাইয়া দেওয়া হয়। শেষোক্ত বোতলে **অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইড** (ammonium chloride)-এর দ্রবণ থাকে এবং উহাতে একটি দস্তার দণ্ড রাখা হয়। এই সেলের কার্বন-দণ্ড ও দস্তা-দণ্ড যথাক্রমে সেলের পজিটিভ ও নেগেটিভ মেরু সুতরাং একটি তার দিয়া উহাদের যোজিত করিলে **তারের মধ্যে কার্বন হইতে দস্তার দিকে** একটি বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি হইবে। এখানেও বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে পজিটিভ মেরুর নিকট হাইড্রোজেনের বুদ্বুদ সৃষ্টি হইয়া সেলের বিদ্যুৎপ্রবাহে বিঘ্ন ঘটিবার উপক্রম হয়, কিন্তু ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড থাকার ফলে হাইড্রোজেন অবিলম্বে অক্সিজেনের সহিত রাসায়নিক ভাবে যুক্ত হইয়া জলে পরিণত হয় এবং ছদনের সম্ভাবনা দূর হয়। এই সেলের বৈদ্যুতিক চাপ মোটামুটি ১·৫ ভোল্ট।

ব্যবহার—লেক্লান্সে সেলও একটানা বিদ্যুৎ সরবরাহের কার্যে বিশেষ উপযোগী নহে, কারণ সেক্ষেত্রে উহাতেও অল্প কিছু ছদন ঘটিতে পারে। তাই যে সব ক্ষেত্রে একটানা দীর্ঘকাল বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজন নাই

চিত্র নং ২১১ : ড্রাই সেল
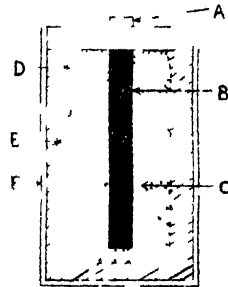
চিত্র নং ২১২ : ড্রাই সেলের লম্বচ্ছেদ, A—কার্বন দণ্ডের মাথা, B কার্বনদণ্ড, C—ম্যাঙ্গানীজ ডাই-অক্সাইড ও কার্বনের গুঁড়া, D—মসলিন ব্যাগ, E—লেই, F—দস্তার আধার

সে সব ক্ষেত্রে লেক্লান্সে সেল অনায়াসে ব্যবহার করা যাইতে পারে—যেমন বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি চালাইবার কাজে। সাধারণতঃ

এই যন্ত্রগুলি ব্যবহারের মধ্যে মধ্যে অল্প বা দীর্ঘকাল বিরতি ঘটে এবং এই সময়ের মধ্যে সেলটি সম্পূর্ণ ছদন-মুক্ত হইয়া পূর্ণ শক্তি ফিরিয়া পায়।
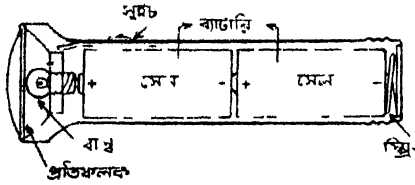
চিত্র নং ২১৩ : টর্চ লাইট (torch light), সেল দুইটি পরস্পর এবং বাল্বের সহিত কিরূপে যুক্ত আছে দেখ (টর্চটি কি জ্বলিতেছে ?)

ড্রাই সেল (**dry cell**)—টর্চ ব্যাটারিতে যে **শুষ্ক সেল** (dry cell) ব্যবহার করা হয় উহা প্রকৃতপক্ষে একটি লেক্লান্সে সেল, শুধু ইহাতে অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের **দ্রবণের স্থলে** অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের সহিত ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড ও জল মিশাইয়া **লেই** (paste) করিয়া ব্যবহার হয়। সুতরাং "ড্রাই" সেল সত্যসত্যই শুষ্ক নহে, কারণ কোনও সেলই সম্পূর্ণ শুষ্ক অবস্থায় কাজ করিতে পারে না।

সীসক সঞ্চায়ক (Lead Accumulator)

সঞ্চায়কের মূল নীতি—ভোল্টীয় সেল, ডেনিয়েল সেল, লেক্লান্সে সেল—ইহারা সকলেই **মৌল সেল** (primary cell) অর্থাৎ ইহারা **মূল উপকরণ হইতে** রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদন করে; এই প্রক্রিয়ার ফলে উপকরণগুলির ক্ষয় ও পরিবর্তন ঘটে এবং উহাদের স্থলে আবার নূতন মালমসলা ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু এইবার আমরা যে সেলের আলোচনা করিব উহা সম্পূর্ণ অন্য জাতীয়। ইহাদের **সঞ্চায়ক** (accumulator) বলে। **মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন** চালাইতে যে ব্যাটারি ব্যবহার হয় তাহা এই শ্রেণীর। নাম হইতেই বুঝা যায় এই সেলে **অন্য কোনও উৎস হইতে** উৎপন্ন বিদ্যুৎ **সঞ্চয়** (accumulate অর্থ—সঞ্চয় করা) করিয়া রাখা হয়। এই অন্য উৎসের কথাও আমরা তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশ প্রসঙ্গে পূর্বে বলিয়াছি। এই উৎসই হইল ডায়নামো। মোটর গাড়ীতে ইঞ্জিনের সহিত একটি ছোট ডায়নামো সংযুক্ত করা আছে। গাড়ী চলিলে ডায়নামোও চলে এবং বিদ্যুৎ উৎপাদিত হয়, আর ঐ বিদ্যুৎ

উপরোক্ত সেলে সঞ্চিত থাকিয়া প্রয়োজন মত খরচ হইয়া গাড়ীর আলো জ্বালাইতে, হর্ণ বাজাইতে বা **"স্টার্ট"** (start) দিতে সাহায্য করে। সেলের মধ্যে জমা-খরচের এই প্রক্রিয়া ক্রমাগত চলিতে থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে—সঞ্চায়ক সেলের **নিজস্ব বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার শক্তি নাই,** যেমন মৌল সেলের আছে—অন্য শক্তিশালী উৎস হইতে বিদ্যুৎ **সংগ্রহ** বা যেন **ধার করিয়া** উহা বিদ্যুৎ সরবরাহ করে। এজন্য উহাদের **মৌল** সেলের সহিত তুলনায় **গ্রাহী সেল** (secondary cell) বলা হয়। **ইহার চার্জ** (charge) **করার ব্যাপার অনেকটা যেন ঘড়িতে দম দেওয়ার ন্যায়।** কারণ ঘড়ির চলার শক্তিও ধার করা—উহা আসলে আসিতেছে মানুষের **হাতের কব্জির শক্তি** হইতে। সঞ্চায়ক সেলের মূল গঠন-ভঙ্গী এইরূপ :—

গঠন-ভঙ্গী ও কার্যপ্রণালী—একটি সালফিউরিক এসিডের লঘু-দ্রবণ-পূর্ণ পাত্রে দুইটি সীসার (বা সিসকের) (lead পাত রাখা হয়। ইহাদের একটি হইল পজিটিভ মেরু, অপরটি নেগেটিভ মেরু। প্রথম পাতটি সাধারণ সীসার তৈয়ারী এবং দ্বিতীয় পাতটি সীসার উপর সীসক-অক্সাইড-এর (তোমরা চতুর্থ অধ্যায়ে ধাতুর অক্সাইডের কথা পড়িয়াছ) আস্তরণ দেওয়া। এখন পাত দুইটি ধাতুর তারের সাহায্যে কোনও ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক বাল্ব বা ইলেকট্রিক হর্ণের (horn) সহিত যথানিয়মে যোজন করিয়া দিলে দেখা যাইবে আলো জ্বলিতেছে বা হর্ণ বাজিতেছে এবং তারের মধ্যে **সীসক-অক্সাইড-এর পাত হইতে সীসকের পাতের দিকে** বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিতেছে (কেমন করিয়া জানিবে?); অর্থাৎ সীসক-অক্সাইড-যুক্ত পাতটি পজিটিভ ও অপরটি নেগেটিভ মেরু। এই বিদ্যুৎসৃষ্টির কালে দুইটি পাতের সহিতই সালফিউরিক এসিডের রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া উহাদের উপর সীসক-সালফেট লবণ জমিতেছে। সুতরাং এতক্ষণ ইহা সাধারণ তড়িৎ সেলের ন্যায়ই কাজ করিতেছে।

কিন্তু **এইবার উহার সহিতই সাধারণ সেলের মূল প্রভেদ** দেখিব। কিছুক্ষণ চলিবার পর যখন সঞ্চায়কের দুইটি পাতই উহাদের উপর সীসক-সালফেট জমিয়া প্রায় একই অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইবে তখন

স্বভাবতঃ বিদ্যুৎপ্রবাহ ক্ষীণ হইয়া আসিবে। এখন যদি কোনও বিদ্যুতের উৎস হইতে (সাধারণতঃ বাড়ীর বিদ্যুৎ-সরবরাহ হইতে করা হয়) বিদ্যুৎপ্রবাহ এই **সেলের মধ্যে পজিটিভ হইতে নেগেটিভ মেরুর দিকে** (অর্থাৎ সাধারণ নিয়মের উল্টোদিকে) চালিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে দেখা যাইবে পজিটিভ পাতটির উপর পুনরায় সীসক-অক্সাইড সঞ্চিত হইতেছে এবং নেগেটিভ পাতটি পরিষ্কার হইয়া উহার উপর আবার নূতন ধাতব সীসকের স্তর পড়িতেছে অর্থাৎ পাত দুইটি পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়া আসিতেছে। ইহাকেই **'চার্জ' (charge) করা** বলে। এখন আবার সেলটি উহার পূর্ণ শক্তি ফিরিয়া পাইল। এইবার বিদ্যুতের মূল উৎসের সংযোগ হইতে ব্যাটারিকে সরাইয়া লইয়া উহার দুই প্রান্ত-বন্ধন একটি টর্চের বাল্বের সহিত যোগ করিয়া দিলে দেখিব বাল্বটি আবার উজ্জ্বলভাবে
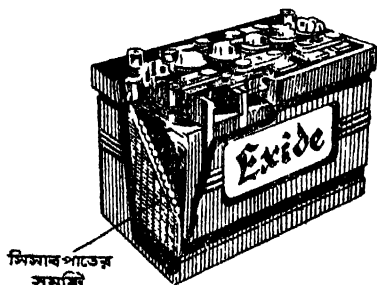
চিত্র নং ২১৪ : বাজার চলন সঞ্চায়ক (accumulator)

জ্বলিতেছে। আমরা মনে করিতে পারি, এই **দ্বিতীয় বার**, বাহিরের উৎস হইতে গৃহীত বিদ্যুৎশক্তিই ব্যাটারির মধ্যে মুক্ত হইয়া বাল্বটিকে জ্বালাইতেছে। কিছুকাল পরে এই সঞ্চিত বিদ্যুৎশক্তি নিঃশেষিত হইয়া গেলে পুনরায় যদি ব্যাটারির প্রান্ত-বন্ধন দুইটিকে পূর্বের ন্যায় বাড়ীর বিদ্যুৎ-সরবরাহের সহিত যোজন করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে ব্যাটারিতে আবার বিদ্যুৎ উৎপাদন করিবার শক্তি ফিরিয়া আসিবে।

বাজার-চলন (commercial) সঞ্চায়ক—উপরে বর্ণিত সেলটি হইল সঞ্চায়কের একটি অতি সরল, সংক্ষিপ্ত নমুনা। আসলে উহার শক্তি ও স্থায়িত্ব বাড়াইবার জন্য—

(১) **অনেকগুলি পজিটিভ ও নেগেটিভ পাত একটি অন্তর করিয়া** (alternately) পরস্পর-সংযুক্ত থাকে ও এইভাবে যুক্ত হইয়া পাতগুলি **এক একটি খুব বড় পাতের কাজ করে**। পাত বড় হইলে

সেলের শক্তিও বেশী হয়, কিন্তু পাতগুলির সমগ্র আয়তনের সমান করিয়া দুইটি মাত্র বড় পাত দিয়া ব্যাটারি নির্মাণ করিলে উহা অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া পড়িত এবং ব্যবহার করিতে অসুবিধা হইত—তাই এইরূপ ব্যবস্থা।

(২) পাতগুলি সাধারণ সীসায় প্রস্তুত না করিয়া একপ্রকার **ঝাঁঝরা** (spongy) **সীসায়** তৈয়ারী করা হয়। উদ্দেশ্য একই—অর্থাৎ জায়গা না বাড়াইয়া যথাসম্ভব বিস্তৃত **উপরিতলের** (surface) সুযোগ লওয়া, কারণ **পাতের উপরিতলের সহিতই রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটিয়া** বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়।

সঞ্চায়ক সেলের বৃহৎ সম্ভাবনা—এইভাবে প্রচুর শক্তিসম্পন্ন সঞ্চায়ক নির্মাণ করা যাইতে পারে। বৈজ্ঞানিকেরা ভবিষ্যতে ক্ষুদ্র আয়তনের, অথচ বৃহৎ শক্তিসম্পন্ন সঞ্চায়ক নির্মাণের উপর বিশেষ গুরুত্ব অর্পণ করিতেছেন। কারণ ইহার সাহায্যে মানুষের প্রয়োজনের নানা ক্ষেত্রে অনেক নূতন নূতন উদ্ভাবন সম্ভব হইবে। অনেক পাশ্চাত্য দেশে বিরাট বিরাট **ট্রলি বাস** (trolley bus) যানবাহনের কাজ করে (বাস, অথচ ট্রামের ন্যায় ট্রলির সাহায্যে মাথার উপরের তার হইতে বিদ্যুৎশক্তি সংগ্রহ করিয়া চলে বলিয়া এই নাম)। সহরে বিদ্যুৎ সরবরাহ হঠাৎ বন্ধ হইয়া গেলে বাসের মোটরের সহিত যুক্ত সঞ্চায়ক হইতে বিদ্যুৎশক্তি গ্রহণ করিয়া এই জাতীয় বাস সাময়িকভাবে কাজ চালাইয়া যায়—যাত্রীদের অসুবিধায় পড়িতে হয় না।

তাহা হইলে আমরা এ পর্যন্ত **বিদ্যুৎ উৎপাদনের তিন প্রকার উৎস** বা **প্রক্রিয়ার** পরিচয় পাইলাম :—

১। মৌল সেল (primary cell)—ইহার মূল নীতি হইল সকল পদার্থের মধ্যে যে প্রকৃতি-দত্ত বিদ্যুৎশক্তি নিহিত রহিয়াছে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে তাহারই কিছু অংশ মুক্ত করিয়া দেওয়া ;

২। গ্রাহী সেল (সঞ্চায়ক) (secondary cell)—এখানে অন্য উৎস হইতে সেলে বিদ্যুৎশক্তি গ্রহণ ও সঞ্চয় করিয়া উহা আবশ্যকমত ব্যবহার করা হয়।

৩। ডায়নামো—এখানে যান্ত্রিক শক্তি (যেমন ঘূর্ণন), চুম্বকত্ব, তাপ (কারণ তাপ হইতেই সাধারণতঃ যান্ত্রিক শক্তি উৎপাদন করা হয়) প্রভৃতি

অন্যজাতীয় শক্তিকে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের নীতিতে **বিদ্যুৎশক্তিতে রূপান্তরিত করা হয়।**

বিদ্যুৎশক্তি ও উহার প্রয়োগ

পূর্বে (২০৩ পৃষ্ঠা) বিদ্যুৎপ্রবাহের বিভিন্ন ফল বা ক্রিয়া সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। একটি তারে যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে তাহা বিদ্যুৎ-প্রবাহের এই সকল **লক্ষণ** হইতে বুঝিতে পারা যায়। এই লক্ষণগুলিকে আমরা কোনও বস্তুর **বিদ্যুৎপ্রবাহ-জনিত পরিবর্তন** বলিয়াও বিবেচনা করিতে পারি। যেমন একটি তারে বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইলে (১) উহা চুম্বকত্ব প্রাপ্ত হয়, (২) উহা উত্তপ্ত হইয়া উঠে। ইহারা হইল **অবস্থাগত পরিবর্তন,** (physical change) কারণ অতি সহজেই পরিবর্তিত বস্তুগুলি পূর্বাবস্থা ফিরিয়া পায়। কিন্তু বিদ্যুৎপ্রবাহের ফলে যখন রাসায়নিক ক্রিয়া ঘটে তখন বস্তুর গভীরতর পরিবর্তন ঘটে। এখানে বস্তুটির বিশ্লেষণ ঘটিয়া উহা নূতন পদার্থে পরিণত হয়। ইহারই নাম **রাসায়নিক পরিবর্তন** (chemical change)।

বর্তমান আলোচনায় বিদ্যুৎকে **শক্তি** (energy) হিসাবে ব্যবহার করিয়া ইহার সাহায্যে আমরা যে সব প্রয়োজনীয় কাজ সচরাচর করাইয়া লইয়া থাকি তাহারই কথা বলিব।

তাপ (heat)

ইলেকট্রিক ষ্টোভ (stove)—বিদ্যুৎশক্তির সাহায্যে তাপ ও আলোক সৃষ্টির কথা আলোচনা করা হইয়াছে, (২০৩ পৃষ্ঠা) এখানে বিষয়টির পুনরালোচনা করা যাক। বিদ্যুৎপ্রবাহের দ্বারা তাপ উৎপন্ন করার মূল নীতি হইল—

(১) বিদ্যুৎপ্রবাহে **রোধ** (resistance) অর্থাৎ বাধা সৃষ্টি করা—রোধ যত বেশী হইবে তাপও তত বেশী হইবে ;

(২) যন্ত্রে উত্তপ্ত করার অংশটি এমন ধাতুতে প্রস্তুত হইবে যাহা তাপের ফলে গলিয়া বা পুড়িয়া না যায়।

তাই ইলেকট্রিক ষ্টোভে লক্ষ্য করিলে দেখিব (২০৪ পৃষ্ঠা দেখ)—দেওয়ালের তারের বিদ্যুৎপ্রবাহকে প্লাগ (plug) হইতে দুইটি **মোটা**

তামার তারে (lead-in) (যাহার রোধ খুব কম এবং সে কারণে যাহার মধ্য দিয়া সহজেই বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতে পারে) ষ্টোভের পাদদেশ পর্যন্ত পৌঁছাইয়া দিয়া যে পরিমাণ স্থানে তাপ সৃষ্টি করিতে হইবে সেই পরিমাণ স্থানে বিদ্যুৎপ্রবাহকে এমন ধাতুর তারের মধ্য দিয়া চালিত করা হয় যাহাতে রোধ খুব বেশী হয়। **নাইক্রোমের** (nichrome) কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। **ইউরেকা** (eureka) আর একটি সংকর ধাতু—নিকেল ও তামার মিশ্রণে প্রস্তুত—যাহারও এই গুণ আছে। সুতরাং ইলেকট্রিক ষ্টোভের **উত্তাপক তার** (elements) এই সকল সংকর ধাতু দিয়া প্রস্তুত করা হয়। আরও একটি ব্যাপার সহজেই বুঝা যায়: উত্তাপক তার যত **দীর্ঘ** হইবে ততই বেশী পরিমাণ তাপ সৃষ্টি করা যাইবে। তাই এই তারকে **ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া** এবং অনেক সময় তারটিকেও **কুণ্ডলীকৃত** (coiled) করিয়া যত অল্পস্থানে যত বেশী তার জড় করা যায় তাহার ব্যবস্থা করা হয়। বিষয়টিকে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া দেখা যাক—

গঠন-কৌশল

উত্তাপক তার না হয় উত্তপ্ত হইয়া লাল হইল কিন্তু যে পাত্রটি বা বস্তুটিকে উত্তপ্ত করিতে হইবে তাহাতে ঐ তাপ কিভাবে সঞ্চালিত হইবে? তাপ-সঞ্চলনের যে যে প্রক্রিয়া আছে তাহাদের কথা চিন্তা কর—(ক) পরিবহন, (খ) পরিচলন, (গ) বিকিরণ।

তাপ-সঞ্চলন প্রক্রিয়া

পরিবহনে তাপের উৎসের সহিত বস্তুটির প্রত্যক্ষ যোগের প্রয়োজন হয়। কিন্তু যে তারে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ প্রবাহিত হইতেছে তাহার সহিত যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ যোগ বর্জন করিয়া চলিতে হইবে, নতুবা **শক** (shock) লাগিয়া সমূহ বিপদের সম্ভাবনা, তাহা আমরা জানি। সুতরাং এরূপ ক্ষেত্রে পরিবহনের সুযোগ না লইয়া অপর দুইটি প্রক্রিয়া—অর্থাৎ পরিচলন ও বিকিরণ, ইহাদেরই উপর নির্ভর করিতে হইবে। দেখা গিয়াছে যে এই জাতীয় ইলেকট্রিক ষ্টোভে কিছু কম-বেশী শতকরা **৬০ ভাগ তাপ বিকিরণ** ও **৪০ ভাগ তাপ পরিচলন** প্রক্রিয়ায় সঞ্চালিত হইয়া থাকে।

ফিউজ (**fuse**)—বৈদ্যুতিক প্রবাহের ফলে তাপসৃষ্টি নীতির আর

একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবহার হইল বাড়ীর বিদ্যুৎ সরবরাহে (electric installation) **ফিউজ তারের** ব্যবস্থা। মিটার ঘরে মিটারের বাক্সের উপর **লোহার সুইচ** খুলিলেই (ইহা কখনও কাহারও সাহায্য না লইয়া করিতে চেষ্টা করিও না এবং সব সময় একটি কাঠের তক্তা, টুল বা ঐ জাতীয় বিদ্যুৎ-অপরিবাহী বস্তুর উপর দাঁড়াইয়া করিতে হইবে, নতুবা মারাত্মক বিপদ ঘটিতে পারে) দেখিবে লম্বা লম্বা চীনামাটির কয়েকটি আধারের (stand) উপর **সূক্ষ্ম একটি করিয়া সীসার তার** বসানো রহিয়াছে। এগুলিকেই ফিউজ তার বলে। ইহাদের উদ্দেশ্য হইল এই:
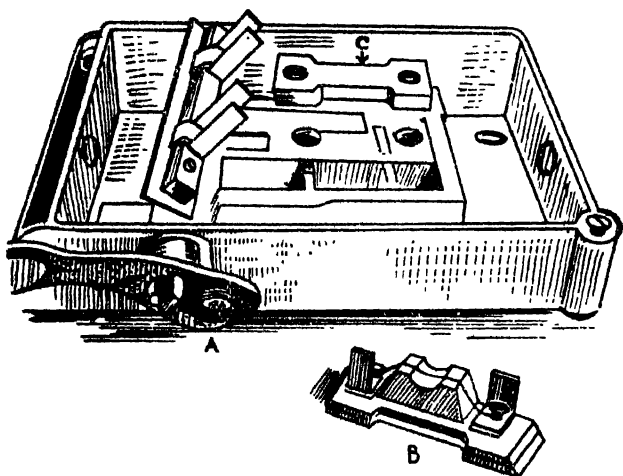
চিত্র নং ২১৫ : A—মিটার বাক্সের লোহার সুইচের ভিতর ফিউজ তারের আধার (C) ; B—আধারটিকে খুলিয়া দেখানো হইয়াছে

ধরা যাক বাড়ীর ইলেকট্রিক লাইনে কোথাও কোনও ত্রুটি আছে। তাহা হইলে অবশ্য সেখানে রোধ সৃষ্টি হইবে এবং ঐ রোধকে অতিক্রম করিবার জন্য ঐ স্থানে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎপ্রবাহ আসিয়া জমা হইবে। ইহাতে অতিরিক্ত তাপে ঐ স্থানে আগুন জ্বলিয়া বাড়ীতে বিপদ ঘটিতে পারে। কিন্তু ফিউজ তার থাকায় বিপজ্জনক পরিমাণ বিদ্যুৎপ্রবাহ উপরোক্ত স্থানে আসিয়া সঞ্চিত হইবার

ফিউজের বৈজ্ঞানিক নীতি

পূর্বেই **নরম ফিউজ তার তাপে গলিয়া পুড়িয়া** বিদ্যুৎসরবরাহের যোগ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে এবং সম্ভাব্য বিপদ হইতে রক্ষা পাওয়া যাইবে।

আলোক

বিজলি বাতি—আলোক সৃষ্টিরও মোটামুটি একই নিয়ম। এখানে আলোর মধ্যে বিদ্যুৎ পরিবাহী তারটি এমন ধাতুতে নির্মাণ করিতে হইবে যাহাতে উহা সহজেই **তাপের ফলে সাদা** হইয়া উঠে। ইহার জন্য প্রয়োজন—(১) তারটির বৈদ্যুতিক রোধ যেন খুব বেশী হয় এবং (২) যেন অধিক তাপেও উহা শক্ত, দৃঢ় থাকে ও **পুড়িয়া না যায়।** শেষোক্ত

গঠন-কৌশল

কারণে তারটিকে **বায়ুশূন্য** অথবা কোন **নিষ্ক্রিয় গ্যাস-পূর্ণ** পরিবেশে রাখিতে হইবে। **টাঙ্গষ্টেন** (tungsten) বলিয়া একপ্রকার শক্ত, রৌপ্যের ন্যায় সাদা ধাতু পাওয়া যায়—যাহার বৈদ্যুতিক রোধ (electrical resistance) খুব বেশী, সুতরাং বিদ্যুৎ পরিবহন কালে **তীব্র উষ্ণতায় সাদা হইয়া আলোক বিকিরণ করে**; আর বাল্বের মধ্যে নাইট্রোজেন, এবং **আর্গন** (argon) বলিয়া আর একটি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় গ্যাসের, মিশ্রণ থাকে বলিয়া তাপে ধাতুর তারটি পুড়িয়া যাইতে পারে না। আর্গন বাতাসের একটি অকিঞ্চিৎকর উপাদান, ইহার পরিমাণ মাত্র শতকরা ০'৮ ভাগ। ইহা বাতাস হইতে বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় পৃথক করিয়া প্রস্তুত করা হয়। এখানে একটি আধুনিক ধরণের বৈদ্যুতিক বাল্বের (bulb) চিত্রে উহার বিভিন্ন অংশগুলি চিহ্নিত করিয়া দেখানো হইল। **সর্বপ্রথম উদ্ভাবিত বৈদ্যুতিক আলোয়** একটি বায়ুশূন্য বাল্বের মধ্যে একটি কার্বনের তৈয়ারী সূক্ষ্ম তারের
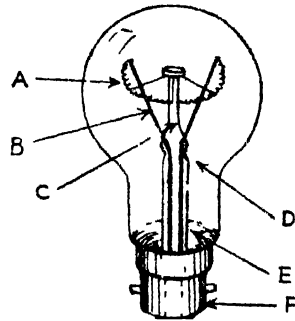
চিত্র নং ২১৬ : বিজলি বাতির আধুনিক বাল্ব ; A—কুণ্ডলী-করা টাঙ্গষ্টেন তার (filament); B—বিদ্যুৎ-প্রবেশক তার (lead-in), C—কাচের দণ্ড, D—গ্যাস-ভরা অভ্যন্তর, E—সিমেণ্ট (টুপি আঁটিবার জন্য), F—ধাতুর টুপি (cap)

(filament) মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করা হইত। ইহার দীপ্তি আধুনিক বিজলি বাতির তুলনায় অনেক কম ছিল। তাহা সত্ত্বেও পরীক্ষা করিয়া জানা গিয়াছে যে আধুনিক বাল্বে বৈদ্যুতিক শক্তির শতকরা **মাত্র ১০ ভাগ আলোক সৃষ্টিতে ব্যয়িত হয়,** বাকী ৯০ ভাগের সবটাই **তাপ সৃষ্টিতে অপচয় হয়।** অপচয়ই বলিতে হইবে, কারণ বিজলি বাতির উদ্দেশ্য তাপ সৃষ্টি নহে, তাপ এখানে কোনও প্রয়োজনে আসিতেছে না বরং অসুবিধারই কারণ হইয়া থাকে। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়া রাখ প্রকৃতিতে একমাত্র **জোনাকীর আলোকই প্রায় তাপশূন্য।**

আলোক ও তাপ

কিন্তু সৌভাগ্যের কথা—বিজলি বাতির ক্রমবিকাশের ইতিহাস এখানেই শেষ নয়। ইহার একটি আধুনিক রূপ—অতি সাদা (কিঞ্চিৎ নীলাভ), স্নিগ্ধ দীপ্তি-সম্পন্ন এক প্রকার আলো—**প্রতিপ্রভ আলো** (fluorescent light)—আজ আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সাথী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহাতে বাল্বের পরিবর্তে একটি দীর্ঘ, প্রায়-বায়ুশূন্য কাচের নল (tube) ব্যবহৃত হয় এবং উহার দুই প্রান্তে দুইটি বিদ্যুৎ **প্রবেশ-দ্বারের** (electrode) সাহায্যে ঐ পাতলা বায়ুস্তরের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা হয়। তখন নলের ভিতরকার সমস্ত স্থানটি, এমন কি উহার গাত্র পর্যন্ত (ভিতরের গাত্রে প্রতিপ্রভ পদার্থের সামান্য আস্তরণ থাকে) প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। এই আলোকে সচরাচর **টিউব লাইট** (tube-light) বলা হইয়া থাকে। সমান বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ করিয়া সাধারণ বাল্বের আলোর তুলনায় ইহাতে দ্বিগুণেরও অধিক পরিমাণ আলোক পাওয়া যায় কারণ ইহাতে তাপ সৃষ্টি অনেক কম হয়। সুতরাং এই আলোর জ্বালানী খরচা সাধারণ বিজলি বাতির অর্ধেকেরও কম।

প্রতিপ্রভ আলো

বিদ্যুৎশক্তির পরিমাপ

বিদ্যুৎকে **শক্তি** হিসাবে ব্যবহার করার আলোচনা হইতেছে। শক্তি কাহাকে বলে? বিজ্ঞানে শক্তির অর্থ **কাজ করিবার ক্ষমতা** (৩১ পৃষ্ঠা

দেখ)। আলোক, উত্তাপ, গতি প্রভৃতির কাজ করিবার ক্ষমতা আছে। পূর্বে বিদ্যুৎপ্রবাহের বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে কতকগুলি **এককের** নাম করা হইযাছে। যেমন—

বিদ্যুৎপ্রবাহের **চাপ**→ভোল্ট (volt),

বিদ্যুৎপ্রবাহের **হার**→আম্পিয়র (ampere),

বিদ্যুৎপ্রবাহের **রোধ**→ওম (ohm)।

তেমনি বিদ্যুৎপ্রবাহের **শক্তি** অর্থাৎ কাজ করিবার ক্ষমতার এককের নাম হইল **ওয়াট** (watt) (ষ্টীম ইঞ্জিনের আবিষ্কারক বিখ্যাত **জেমস্ ওয়াটের** নামানুসারে)। ইহার হিসাব হইল—এক ভোল্ট চাপে, এক আম্পিয়র প্রবাহ, এক সেকেণ্ড চলিলে যে পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি পাওয়া যায়। জলের প্রবাহের উপমাটি পুনরায় প্রয়োগ করিয়া বলা যায়—যত **বৃহৎ ও দ্রুত প্রবাহের** (আম্পিয়র) জল, যত **উঁচু** আধার (ভোল্ট) হইতে, যত **দীর্ঘ সময়** নীচে প্রবাহিত হইবে উহার কাজ করিবার **ক্ষমতা** (যেমন জলস্রোতের ঠেলায় **টারবাইন**—turbine—ঘোরাইবার প্রক্রিয়া) ততই বেশী হইবে। এইভাবে আমাদের বাড়ীর প্রত্যেকটি ইলেকট্রিক আলো, ষ্টোভ, ইস্ত্রা প্রভৃতি যন্ত্রে যে যে পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি খরচ হয তাহার মোটামুটি হিসাব আছে, যেমন উজ্জ্বলতা অনুযায়ী কোনও বাতি ৪০ ওয়াট, কোনও বাতি ১০০ ওয়াট বা আরও বেশী, ষ্টোভ, ইস্ত্রী সাধারণতঃ ৭৫০ হইতে ১২০০ ওয়াট, পাখা সাধারণতঃ ৬০ হইতে ৮০ ওয়াট ইত্যাদি ; অর্থাৎ ইহাদের চালাইতে ঐ সব পরিমাণ শক্তি ব্যয়িত হয়। বাড়ীর সমস্ত আলো, পাখা, ষ্টোভ ইত্যাদির **ওয়াটের পরিমাণ** যোগ করিয়া এবং উহারা **যত ঘণ্টা** চলিতেছে তাহার হিসাব লইয়া এই উভয়ের সংখ্যা গুণ করিলে **ওয়াট-ঘণ্টা** (watt-hour)-এর পরিমাণ পাওয়া যাইবে। ওয়াট-ঘণ্টাকে ১০০০ দিয়া ভাগ করিলে **কিলোওয়াট-ঘণ্টা** (kilowatt-hour) এককে পরিণত হইবে। বাড়ীর ইলেকট্রিক বিলে মাসে কত পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি খরচ হইয়াছে তাহা এই কিলোওয়াট-ঘণ্টায় প্রকাশ করিয়া দেখানো হয়। ১ কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎশক্তির মূল্য

বাড়ীর ইলেকট্রিক বিল

কলিকাতায় মোটামুটি ২০ নয়া পয়সা এবং কলিকাতার বাহিরে ৪০ নয়া পয়সা।

ইলেকট্রিক মোটর (electric motors)

বিভিন্ন ব্যবহার—এইবার ইলেকট্রিক মোটরের কথা বলা যাক। এই মোটরগুলি আমাদের নিত্যদিনের জীবনে ও শিল্পজগতে কত কাজে কত রকমে যে ব্যবহৃত হইতেছে তাহার তুলনা নাই। আমাদের দেশে গৃহস্থালীর কাজে এখনও মোটরের ব্যবহার খুব বেশী দেখা যায় না। এখানে ইহার সর্বাপেক্ষা পরিচিত ও ব্যাপক ব্যবহার বোধ হয় ইলেকট্রিক পাখায়। ইহার পর—ঘর জল-তোলা পাম্পে, মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন ষ্টার্ট দিতে (২২৬ পৃষ্ঠা), **হিমায়কে** বা বরফের আলমারিতে (refrigerator) মোটরের ব্যবহারের সহিত আমরা পরিচিত। এ ছাড়া ইলেকট্রিক ট্রাম ও ট্রেনে, উঁচু ফ্ল্যাট বাড়ার লিফটে (lift) এবং কারখানায় নানা কলকব্জা চালাইতে ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার সচরাচর নজরে পড়ে। আমেরিকায় মধ্যবিত্ত পরিবারেও সেলাই-এর কল, কাপড়-ধোয়া কল, দাড়ি-কামানো ক্ষুর, **ভাকুয়ম ক্লিনার** (vacuum cleaner) (ইহা এক প্রকার বৈদ্যুতিক ঘর-ঝাঁট-দেওয়া কল) প্রভৃতি যন্ত্রে ইলেকট্রিক মোটরের ব্যবহার দেখা যায়। ছেলেদের খেলনা চালাইবার প্রয়োজনে ক্ষুদে মোটর হইতে আরম্ভ করিয়া কারখানার কাজে দৈত্যের ন্যায় বিরাট মোটর প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গঠনভঙ্গী ও কার্যপ্রণালী—ইলেকট্রিক মোটরের মূলনীতি হইল—একটি **চাকাজাতীয় বস্তুকে ঘোরানো**। এই ঘূর্ণনের গতিকে তারপর (১) রবারের **বেল্ট** বা (২) পিষ্টন (৯৪নং চিত্র) বা (৩) **দাঁতওয়ালা চাকার** সাহায্যে—নানাভাবে, প্রয়োজনমত যে কোনও প্রকার গতিতে পরিবর্তিত করিয়া যে কোনও স্থানে বিভিন্ন কাজে লাগানো যাইতে পারে। দৃষ্টান্তক্রমে চাকার সেলাই-এর কলে **বৃত্তাকার গতি** কৌশলে কিরূপে, কিছু দূরে, **ছুঁচের ওঠা-নামা গতিতে** এবং দেওয়াল ঘড়িতে একই গতি কিরূপ **দোলকের দোলনার গতিতে** পরিণত হয় তাহা আমরা

দেখিয়াছি। ইহাই হইল মোটরের সাহায্যে কাজ করাইয়া লওয়ার কৌশল। এখন বিদ্যুৎশক্তির যে যে বিভিন্ন ক্রিয়ার বা ফলের সহিত আমাদের পরিচয় হইয়াছে তাহাদের সাহায্যে কোনও চাকাজাতীয় বস্তুকে কিরূপে ঘোরানো যায় চিন্তা করিয়া দেখা যাক—

এ সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই বোধ হয় **বার্লোচক্রের** (২১৮ পৃষ্ঠা) কারণ দৃষ্টান্তের কথা মনে আসিবে, সেখানে বিদ্যুৎ ও চৌম্বক-শক্তির পরস্পর ক্রিয়ায় একটি ধাতুর চাকাকে কিরূপে একটানা ঘোরানো যায় দেখিয়াছি **বিদ্যুতের সাহায্যে কোনও বস্তুকে চলমান করার ইহাই হইল মূল নীতি**। এ সম্বন্ধে কিছু বিস্তারিত আলোচনার জন্য আমরা ডায়নামোর প্রসঙ্গে পুনরায় ফিরিয়া আসিতেছি।

সেখানে দেখিয়াছি (২২২ পৃষ্ঠা) যে, দুইটি শক্তিশালী স্থায়ী চুম্বকের বিপরীত মেরুদ্বয়ের মধ্যে যদি একটি **তারের ফাঁসকে** (loop) দ্রুতগতিতে ঘোরানো যায় তাহা হইতে উহার মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইবে। এই শক্তিশালী চুম্বক দুইটিকে **ভৌম চুম্বক** (field magnet) বলে, কারণ ইহাদের দ্বারা উৎপন্ন চৌম্বকক্ষেত্রের (magnetic field) **পটভূমিতেই** অন্য সকল ক্রিয়াগুলি ঘটিতেছে। লক্ষ্য করিলে বুঝা যায় একবার সম্পূর্ণ ঘূর্ণনে ফাঁসটির যে কোনও একটি পার্শ্ব (ধর বাম পার্শ্ব) **অর্ধেকবার** চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে **নীচের দিকে** এবং অর্ধেকবার **উপরের দিকে** ঘুরিবে।

ডায়নামোর মূল নীতি
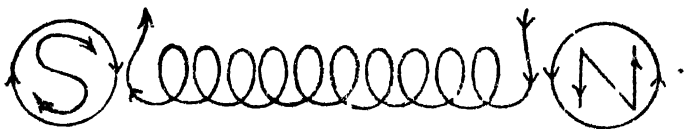
চিত্র নং ২১৭ : সলিনয়েড—এইভাবে তারের স্প্রিংএর মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে উহার এক প্রান্ত উঃ মেরু, এক প্রান্ত দঃ মেরু হইবে (কোনটী কোন মেরু ?)

সুতরাং ২২২ পৃষ্ঠায় বর্ণিত পরীক্ষা অনুযায়ী বিদ্যুৎপ্রবাহ ফাঁসটির মধ্য দিয়া, ঘূর্ণনের অর্ধেকবার এক মুখে এবং অপর অর্ধেকবার অন্য মুখে প্রবাহিত

হইয়া **পরিবর্তী প্রবাহ** (alternating current বা A. C.) সৃষ্টি হইবে —তাহাও বলা হইয়াছে। ইহা হইল প্রথম কথা। এইবার ঘূর্ণনশীল ফাঁসটির সম্বন্ধে অন্য আর একদিক হইতে বিচার করা যাক :

পূর্ববর্তী চিত্রটি দেখ—একটি তারকে পাকাইয়া স্প্রিং-এ পরিণত করা হইয়াছে। এখন যদি উহার মধ্য দিয়া তীর-নির্দেশিত পথে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করা যায় তাহা হইলে উহা একটি **চুম্বকে পরিণত হইবে** এবং উহার মেরু দুইটি চিত্রে যেমন চিহ্নিত করা হইয়াছে সেইরূপ হইবে। কোন দিক কোন মেরু হইবে ইহা স্মরণ রাখিবার নিয়ম হইল —স্প্রিংটিকে লম্বালম্বি চোখের সামনে ধরিয়া যে প্রান্তের দিকে তাকাইলে বিদ্যুৎপ্রবাহ **ঘড়ির কাঁটার গতির বিপরীত দিকে** চলিতেছে দেখায় সেই প্রান্ত হইল **উত্তর** মেরু এবং যে প্রান্তে প্রবাহ **ঘড়ির কাঁটার গতির দিকে** চলিতেছে দেখা যাইবে সেই প্রান্ত **দক্ষিণ** মেরু হইবে। একটি কম্পাসেরকাঁটা ঐ স্প্রিংটির দুই প্রান্তে ধরিয়া
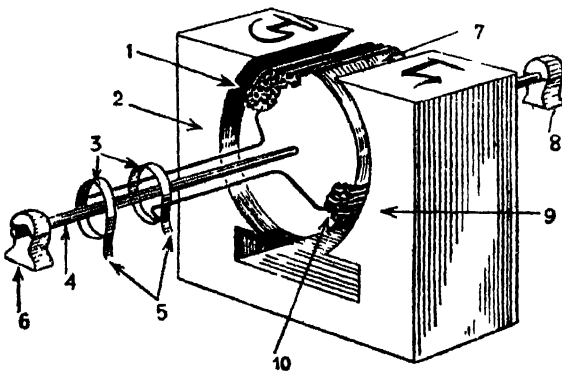
সলিনয়েডে
(solenoid)
উঃ ও দঃ মেরু

চিত্র নং ২১৮ : অল্‌টারনেটর ; 1,10—আর্মেচারের কুণ্ডলী ; 2, 9—চুম্বক , 3—স্লিপ রিং , 4—অক্ষ ; 5—ব্রাশ ; 6, 8—বেয়ারিং (যাহার ভিতর অক্ষটি ঘোরে) ; 7—সমগ্র আর্মেচার

ইহা পরীক্ষা করা শক্ত হইবে না। এই প্রকার বিদ্যুৎবাহী স্প্রিংকে বিজ্ঞানের ভাষায় **সলিনয়েড** (solenoid) বলে। সলিনয়েডের অনেক পাকের বদলে যদি পূর্বের ন্যায় তারের একটিমাত্র ফাঁস (loop) লইয়া উহার মধ্য

দিয়া বিদ্যুৎ চালিত করা যায় তাহা হইলেও একই নিয়মে উহার **এক পার্শ্ব** বা পিঠ উত্তর মেরু ও **অপর পার্শ্ব** বা পিঠ দক্ষিণ মেরু হইবে।

এইবার ২১৮ নং চিত্রে প্রদর্শিত যন্ত্রটিকে দেখ, ইহার নাম পরে বলিতেছি। চুম্বকের দুইটি মেরুর মধ্যে এইপ্রকার একটি তারের ফাঁসকে একটি অক্ষের (4) (axis) উপর বসাইয়া ঘোরাইবার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। অক্ষ-সহ এই প্রকার ঘূর্ণনশীল তারের ফাঁস বা **কুণ্ডলীকে** (অর্থাৎ অনেকবার ঘোরানো দীর্ঘ তারের ফাঁস) **আর্মেচার** (armature) বলে। আরও লক্ষ্য কর— তারের দুই খোলা মুখ **দুইটি ধাতুর আংটার** (3) ভিতরের গাত্র স্পর্শ করিয়া আছে যাহাতে আর্মেচারটি ঘুরিলে প্রান্ত দুইটিও আংটার ভিতরের **গা ঘসিয়া ঘুরিতে থাকিবে**। আংটা দুইটিকে ইংরাজীতে
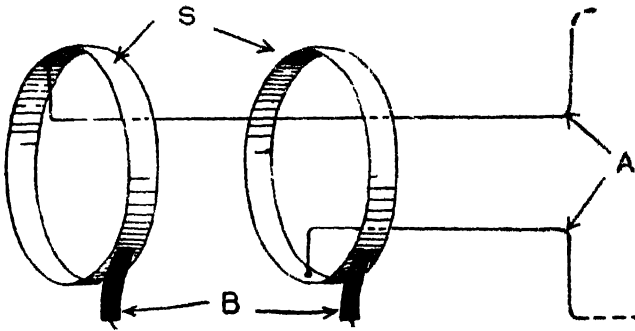
চিত্র নং ২১৯ : অল্টারনেটরের স্লিপ রিং (S) (বড় করিয়া দেখানো), আর্মেচারের প্রান্ত দুইটি (A) কেমন স্লিপ রিং-এর ভিতরের গায়ে চাপিয়া রহিয়াছে দেখ ; B—ব্রাশ

স্লিপ রিং (slip ring) বলে, কারণ তারের মুখ দুইটি আংটার ভিতরের গায়ে যেন স্লিপ করিয়া অর্থাৎ **পিছলাইয়া** ঘুরিতেছে, নচেৎ মুখ দুইটি আটকানো থাকিলে স্পষ্টই **তারে পাক খাইয়া যাইত**। আরও দেখ আংটা দুইটির বাহিরের গায়ে দুইটি ধাতুর **ব্রাশ** (5) (brush) স্প্রিং-এর জোরে চাপিয়া রহিয়াছে।

এখন মনে কর **আর্মেচারটির অক্ষে একটি চাকা আঁটিয়া বেল্টের সাহায্যে ঘোরাইবার** ব্যবস্থা করা হইল। তাহা হইলে উল্লিখিত নীতি অনুযায়ী তারের মধ্য দিয়া পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ

(alternating current) সৃষ্টি হইবে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহ **ব্রাশ দুইটির সহিত দুইটি তার** (২১৯ চিত্রে B) যোজন করিয়া উহার মধ্য দিয়া যে কোনও স্থানে বাহিত করিয়া লওয়া যায় এবং সেখানে প্রয়োজন মত বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা যাইতে পারে। ইহাই হইল **বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্রের** (dynamo বা generator) মূলনীতি এবং আলোচ্য যন্ত্রটিতে পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ অর্থাৎ alternating current উৎপন্ন হয় বলিয়া ইহার বিশেষ নাম **অল্টারনেটর** (alternator)। পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহের ব্যবহার নানা ক্ষেত্রে অসুবিধাজনক বলিয়া **একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহ** (direct current বা D. C.) সৃষ্টির ব্যবস্থা হইয়াছে। ঐ একই প্রকার যন্ত্রের সাহায্যে একমুখী প্রবাহ কিরূপে উৎপন্ন করা যায় চিন্তা করিয়া দেখা যাক :—

উৎপন্ন পরিবর্তী বিদ্যুৎ প্রবাহকে বাহিরে লইয়া যাওয়ার কৌশল—স্লিপ রিং
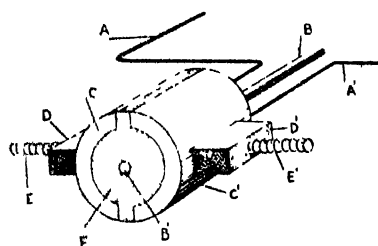
চিত্র নং ২২০ : D C. ডায়নামোর কমিউটেটর, AA'—তারের ফাঁস, BB'—অক্ষ, CC'—অর্ধ-সিলিণ্ডার, DD'—ব্রাশ, EE'—স্প্রিং, F—কার্বনের ড্রাম

পার্শ্বের চিত্রটি দেখ এবং উহাকে পূর্ববর্তী ২১৮ নং চিত্রের সহিত তুলনা কর। এখানে আর্মেচারের তারের দুই প্রান্ত পূর্বের ন্যায় দুইটি **গোলাকার আংটার মধ্যে আলগাভাবে লাগানো** না থাকিয়া চিত্রের ন্যায় দুইটি ধাতুর **অর্ধ-সিলিণ্ডারের** সহিত **যুক্ত** (fixed) **থাকে**। ধাতুর অর্ধ-সিলিণ্ডার দুইটি একটি কার্বনের ড্রামের উপর আঁটিয়া বসানো আছে, কিন্তু সিলিণ্ডার দুইটির মধ্যে কোনও **ধাতব সংযোগ নাই**—মধ্যে উভয় পার্শ্বে কিছু ফাঁক আছে এবং ঐ ফাঁক ড্রামের কার্বনের (অপরিবাহী পদার্থ) দ্বারা সিলিণ্ডার দুইটির উপরিতলের সহিত মসৃণ করিয়া ভরাট করা, যাহাতে ড্রামটি ঘুরিতে অসুবিধা না হয়, কেননা এখানেও পূর্বের ন্যায় দুইটি ধাতুর ব্রাশ (brush) স্প্রিংএর সাহায্যে সিলিণ্ডার দুইটির উপর চাপিয়া রহিয়াছে। এখন অক্ষ-সহ আর্মেচারটি ঘুরিলে ধাতুর অর্ধ-

সিলিণ্ডার-যুক্ত সমগ্র ড্রামটিও সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতে থাকিবে। এখন

পরিবর্তী বিদ্যুৎ-প্রবাহকে একমুখী করার কৌশল—কমিউটেটর

বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক সম্বন্ধে চিন্তা কর। বুঝিবার সুবিধার জন্য দুইটি ব্রাশের কথা একসঙ্গে না ভাবিয়া যে কোনও দিকের **একটি ব্রাশের উপর লক্ষ্য রাখ,** ধর ডানদিকের ব্রাশ। এই ব্রাশটি আর্মেচারের ঘূর্ণনের সময় যখনই যে অর্ধ-সিলিণ্ডারটিকে স্পর্শ করিবে তাহার মধ্য দিয়া সব সময় একই দিকে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিবে, কারণ ঐ পার্শ্বে আর্মেচারের তারটি—যাহার সহিত উপরোক্ত অর্ধ-সিলিণ্ডারটির যোগ আছে—সব সময় একই ভঙ্গীতে অর্থাৎ **উপর হইতে নীচের দিকে** অর্ধ-ঘূর্ণিত হইতেছে। লক্ষ্য কর—**অলটারনেটরের ন্যায় এখানে কোনও একটি ব্রাশ সব সময় আর্মেচারের ফাঁসের একই অর্ধের সহিত যুক্ত নাই, সম্পূর্ণ ঘূর্ণনের মধ্যে, সংশ্লিষ্ট অর্ধ-সিলিণ্ডারের ভিতর দিয়া একবার এক অর্ধের তার ও আর একবার অপর অর্ধের তার হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিতেছে** এবং সেই জন্যই বিদ্যুৎপ্রবাহ একমুখে চলিতেছে। এই **একমুখা বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টির যন্ত্রটিকেই সাধারণত ডায়নামো** (dynamo) বলে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে ডায়নামো ও অলটারনেটরের মধ্যে মূল গঠনে কোনও প্রভেদ নাই, প্রভেদ শুধু **আর্মেচারের তারে উৎপন্ন বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাহিরের বর্তনীতে** (external circuit) **লইয়া যাওয়ার কৌশলের মধ্যে।** কার্বনের ড্রাম ও উহার উপরের ধাতুর অর্ধ-সিলিণ্ডারের আবরণ সহ সমগ্র অংশটিকে **কমিউটেটর** (commutator) বলে। Commutator মানে পরিবর্তনকারী—এই নাম কেন হইল একটু পরে বুঝিতে পারিবে।

আর একবার অন্যদিক দিয়া এই যন্ত্রটির প্রতি মনোযোগ দিব। মনে করা যাক আর্মেচারটিকে না ঘুরাইয়া উহার তারের মধ্য দিয়া বাহিরের

ডায়নামো ও মোটরের সম্পর্ক

কোনও উৎস হইতে বিদ্যুৎ প্রবাহিত করা হইতেছে। তাহা হইলে ঠিক বিপরীতক্রমে, কিন্তু একই নীতিতে, **আর্মেচারটি নিজেই ঘুরিতে থাকিবে।** ঠিক কি

জন্য, কিসের শক্তিতে ঘুরিবে আর একটু বিশ্লেষণ করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক—

তাহা হইলে সলিনয়েডের কথা পুনরায় মনে কর (২৩৮ পৃষ্ঠা)। সেই প্রসঙ্গে বলা হইয়াছিল সলিনয়েডের ন্যায় একটি আর্মেচারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ প্রবাহিত করিলে উহার এক পিঠ উত্তর মেরু ও অপর পিঠ দক্ষিণ মেরু হয়। এইবার চিত্রগুলির সাহায্যে তারটির ঘূর্ণনের সময় পর পর উহার কয়েকটি বিশেষ অবস্থানের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে :
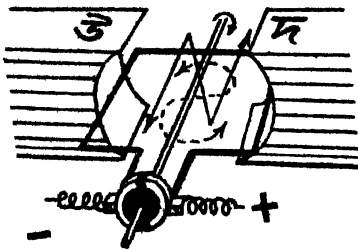
চিত্র নং ২২১ : মোটরে আর্মেচার ঘুরাইবার কৌশল (১) ; আর্মেচারের উপর পিঠ উঃ মেরু

মোটরে আর্মেচার কেন ঘোরে—২২১ নং চিত্রে দেখ। আর্মেচারের মধ্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক অনুযায়ী উহার উপরের পিঠ উত্তর মেরু ও নীচের পিঠ দক্ষিণ মেরু হইয়াছে। (সলিনয়েডের উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরু বিচারের নিয়ম স্মরণ কর)। স্থতরাং চুম্বকের মেরুদ্বয়ের মধ্যে পরস্পর আকর্ষণ-বিকর্ষণের নিয়মে আর্মেচারের উত্তর মেরুর পার্শ্ব ঘুরিয়া ভৌমচুম্বকের (field-magnet) উত্তর মেরু হইতে দূরে চলিয়া যাইবে। ২২৩ নং চিত্রে দেখ —আর্মেচারের উত্তর মেরুর পিঠ এই **দূরতম অবস্থানে** আসিয়াছে। এই অবস্থানে **আর্মেচারটির আর ঘূর্ণনের কোনও প্রবণতা থাকিবে না**। স্থতরাং আমরা ইহাকে **উদাসীন** (neutral) অবস্থা বলিতে পারি। আর্মেচারের মধ্যে বিদ্যুৎ-

চিত্র নং ২২২ : মোটরে আর্মেচার ঘোরাইবার কৌশল (২) , আর্মেচারের উঃ মেরু ভৌম চুম্বকের উঃ মেরু হইতে দূরে ঘুরিয়া যাইতেছে
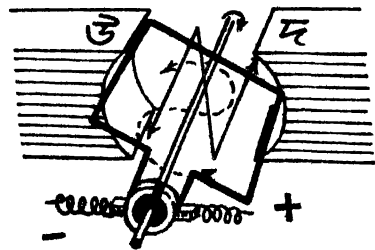
প্রবাহ যদি বরাবর একই দিকে চলিত তাহা হইলে এই অবস্থানে আসিয়া আর্মেচারটি স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যাইত।

এইবার আর্মেচারের মুখের দিকে **কমিউটেটর** অংশটির কথা ভাব, যাহার মধ্য দিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ আর্মেচারের তারে প্রবেশ করিতেছে। লক্ষ্য কর এই অবস্থানে কমিউটেটরের **ব্রাশ দুইটি** (২২৩ নং চিত্র) অর্ধ-সিলিণ্ডারদ্বয়ের মধ্যস্থ ফাঁকের **কার্বনের (অপরিবাহী) স্তরের উপর আসিয়া পড়িয়াছে**। ফলে আর্মেচারের তারের মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ পরিচলনও সাময়িকভাবে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু **ঘূর্ণনের গতি-জাড্যের জন্য** (৭ পৃষ্ঠা) আর্মেচারটি ঐ অবস্থায় একেবারে না থামিয়া গিয়া আরও কিছু বেশী ঘুরিয়া গিয়াছে। (২২৪ নং চিত্র) সুতরাং এইবার কমিউটেটরের ব্রাশ দুইটির প্রত্যেকটি **অপর পার্শ্বের অর্ধ-সিলিণ্ডারের** সহিত যুক্ত হইয়াছে ও আবার **বিদ্যুৎ প্রবাহ শুরু হইয়াছে**।

চিত্র নং ২২৩ : মোটরে আর্মেচার ঘোরাইবার কৌশল (৩) ; আর্মেচারের উঃ মেরু দূরতম অবস্থানে আসিয়াছে

চিত্র নং ২২৪ : মোটরে আর্মেচার ঘোরাইবার কৌশল (৪) ; গতি-জাড্যের জন্য আর্মেচারের উঃ মেরু কিছু বেশী ঘুরিয়া গিয়াছে
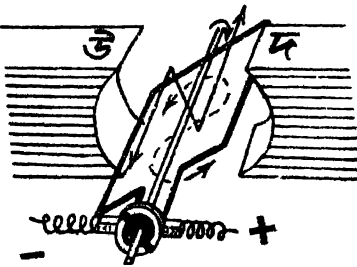
এইবার ছবির সাহায্যে একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝিতে পারিবে এই দ্বিতীয় বারের বিদ্যুৎপ্রবাহে **আর্মেচারের ভিতর উহার দিক পরিবর্তিত হইয়া গিয়াছে** (কেন, বুঝাইয়া বলিতে চেষ্টা কর)। সুতরাং এই অবস্থায় **তারের** যে পার্শ্ব ভৌম চুম্বকের উত্তর মেরুর নিকট

আসিল তাহাও **পুনরায় উত্তর মেরু হওয়ায়** পূর্বের ন্যায় ঘুরিয়া দূরে চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিবে।

এইভাবে কমিউটেটরের সাহায্যে আর্মেচারের তারের মধ্য দিয়া একটি **পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ** (alternating current) **সৃষ্টি হইয়া আর্মেচারটিকে একটানা একই দিকে** ঘুরাইয়া চলিবে। ইহাই **হইল বৈদ্যুতিক মোটরের** (electric motor) মূল নীতি। বর্ণনায় কিছু জটিল মনে হইলেও ছবির সাহায্যে একটু চিন্তা করিলে আসলে নীতিটি যে খুবই সহজ বুঝিতে পারিবে। ডায়নামো প্রসঙ্গে **commutator** অর্থাৎ **পরিবর্তনকারী** নামটির তাৎপর্য স্পষ্ট না হইলেও এখন নিশ্চয় উহার অর্থ বেশ বুঝা যাইতেছে।

সুতরাং দেখা গেল বিদ্যুৎ-উৎপাদক যন্ত্র (generator) ও বৈদ্যুতিক মোটরের (electricmotor) মধ্যে মূলতঃ কোনই পার্থক্য নাই, **একই যন্ত্রে**—

(ক) কখনও **আর্মেচার ঘুরাইয়া** আর্মেচারের তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করা যায় (generator),

(খ) কখনও **আর্মেচারের তারে বিদ্যুৎপ্রবাহ সৃষ্টি করিয়া** আর্মেচারকে ঘুরানো যায় (motor)।

এইজন্য এই উভয়বিধ উদ্দেশ্য-সাধক যন্ত্রটিকে **ডায়নামো-মোটর** (dynamo-motor) বা **মোটর-জেনারেটর** (motor generator) বলে এবং **মোটরকে** reverse dynamo অর্থাৎ **উল্টানো ডায়নামো** বলে।

নিম্নের চিত্রে দেখ একটি ইলেকট্রিক ট্রেন (ক) উঁচু পথে উঠিবার সময় মাথার উপরের বিদ্যুৎপরিবাহী তার হইতে বিদ্যুৎ সংগ্রহ করিয়া উহার
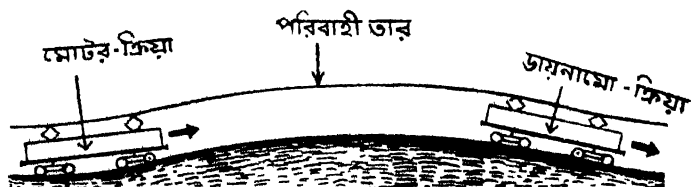
চিত্র নং ২২৫ : উঁচু-নীচু পথে এই ভাবে বিদ্যুৎশক্তির অপচয় নিবারণ করা যায়

ডায়নামো-মোটরটিকে **মোটর হিসাবে** ব্যবহার করিতেছে। আবার অপর পার্শ্বে ঢালু পথ বাহিয়া গড়াইয়া নামিবার সময় বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করিয়া ঐ যন্ত্রটিকেই **ডায়নামো রূপে** ব্যবহার করিয়া, অর্থাৎ বিদ্যুৎ সৃষ্টি করিয়া, বৈদ্যুতিক সরবরাহ-তারে বিদ্যুৎ ফিরাইয়া দিতেছে, সুতরাং এইভাবে উঁচু-নীচু পথে **বিদ্যুৎশক্তির অপচয় নিবারণ** করা যায়।

পরিবর্তী-প্রবাহ মোটর (A. C. Motor)—উপরোক্ত মোটরটিতে একমুখী বিদ্যুৎপ্রবাহের (D. C) ব্যবহার দেখানো হইয়াছে অর্থাৎ উহা হইল **D C. মোটর**। সেইরূপ পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহ ব্যবহার করিয়া **A. C মোটরও** সহজেই উদ্ভাবন করা যাইতে পারে এবং তাহা ঐ D C. মোটরের মধ্যেই সামান্য পরিবর্তন করিয়া করা যায়। ইহার একটি পরিকল্পনা হইল এইরূপ :

মনে কর **স্থায়ী** চুম্বক দুইটির স্থলে দুইটি **বৈদ্যুতিক চুম্বক** ব্যবহার করা হইয়াছে এবং অলটারনেটর হইতে আগত পরিবর্তী বিদ্যুৎপ্রবাহকে **আর্মেচারে প্রবেশ করাইবার পূর্বে** বৈদ্যুতিক চুম্বকের কুণ্ডলীর ভিতর দিয়া ঘুরাইয়া আনা হইতেছে। একটু চিন্তা করিলেই বুঝা যাইবে, পূর্বের ন্যায় এখন আর্মেচারের তারের মধ্যে **বিদ্যুৎপ্রবাহের দিক পরিবর্তিত না হইয়া** উহা একমুখীই থাকিবে কিন্তু প্রতি অর্ধ-ঘূর্ণনে, ছন্দে ছন্দে, বৈদ্যুতিক চুম্বকের **প্রত্যেকটি মেরুর পর্যায়ক্রমে পরিবর্তন ঘটিবে** অর্থাৎ উহা একবার উঃ মেরু, একবার দঃ মেরু হইবে এবং ইহার ফল একই দাঁড়াইবে অর্থাৎ আর্মেচারটি একই দিকে ক্রমাগত ঘুরিয়া চলিবে।

ব্যবহারিক মোটর বা ডায়নামো—বুঝিবার সুবিধার জন্য উপরে মোটরের (বা ডায়নামোর) যে চিত্র ও বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে তাহা অত্যন্ত সরল কিন্তু আসল যন্ত্রে খুঁটিনাটি অনেক ব্যাপারে তাহার সহিত প্রচুর প্রভেদ আছে। এখানে (২৪৬ পৃষ্ঠা) একটি D. C. ডায়নামোর আর্মেচার ও কমিউটেটরের আর একটু জটিল চিত্র দেওয়া হইল। ইহাতে লক্ষ্য কর—উৎপন্ন বৈদ্যুতিক শক্তিকে জোরালো করিবার উদ্দেশ্যে **একটি তারের ফাঁসের পরিবর্তে,** একটি সিলিণ্ডারকে বেষ্টন করিয়া এরূপ **অনেকগুলি** বিশুদ্ধ তামার **তার** বা **বার** (bar) লাগানো হইয়াছে

এবং অনুরূপভাবে কমিউটেটরের গায়ে **আর্মেচারটির সঙ্গে মিলাইয়া** পর্যায়ক্রমে ধাতুর বার (bar) ও কার্বন বার দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু একটু মনোযোগের সহিত লক্ষ্য করিলে ডায়নামোর সরল রূপটির সহিত ইহার এই অপেক্ষাকৃত জটিল রূপটির মূল সাদৃশ্য খুঁজিয়া বাহির করা ও ইহার কার্যপ্রণালী বোঝা কঠিন হইবে না।
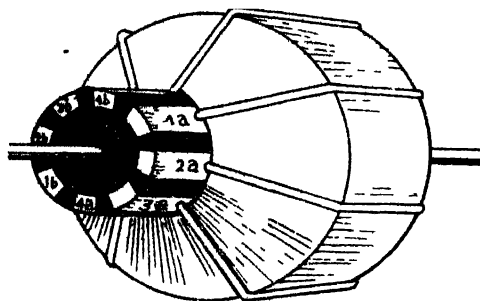
চিত্র নং ২২৬ : D. C. ডায়নামো (বা মোটর)-এর আর্মেচারের অপেক্ষাকৃত জটিল রূপ, 1a-1b, 2a-2b ইত্যাদি এক একটি তারের ফাঁস সহ সিলিণ্ডারের অংশ

ইলেকট্রিক ট্রাম বা ট্রেনে কিরূপে বৈদ্যুতিক মোটরের সাহায্যে গাড়ীর চাকা ঘোরানো হয় এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিবে। মাথার উপরে বিদ্যুৎবাহী তার হইতে গাড়ী বা ইঞ্জিনের ছাদে লাগানো কোনও পরিবাহকের (conductor) সাহায্যে বিদ্যুৎশক্তিকে গাড়ীর নীচে বসানো মোটরে সঞ্চালিত করিয়া মোটরটিকে ঘোরানো হয় এবং এই ঘূর্ণনগতিকে গাড়ীর চাকার অক্ষের (axle) সহিত যুক্ত করিয়া চাকাটিকে ঘোরানো হয়—এইভাবে গাড়ী চলমান হয়। চাকার মধ্য দিয়া, রেল লাইন হইয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ বিদ্যুৎ-উৎপাদক ষ্টেশনে ফিরিয়া আসে ও এইভাবে বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ হয়। ড্রাইভারের হাতে একটি **প্রবাহ-নিয়ন্ত্রকের** (regulator) সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি কম-বেশী করিয়া মোটরের ঘূর্ণন-বেগ কম-বেশী করা হয় এবং এইভাবে গাড়ীর গতিবেগ নিয়ন্ত্রণ করা যায়। এই প্রবাহ-নিয়ন্ত্রক (regulator) যন্ত্রটির কথা এবার বলা হইতেছে।

বৈদ্যুতিক পাথার রেগুলেটর—আমরা সুবিধার জন্য একটি বৈদ্যুতিক পাথার রেগুলেটরের গঠন পরীক্ষা করিব, কিন্তু ইহার মূলনীতি সর্বত্রই এক। যে কোনও মোটরে প্রথমেই হঠাৎ বেশী পরিমাণ বিদ্যুৎশক্তি

সরবরাহ হইলে উহা জখম হইবার বিশেষ সম্ভাবনা। তাই ধীরে ধীরে বিদ্যুৎপ্রবাহ জোরালো করিবার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। পার্শ্বের চিত্রে এরূপ একটি প্রবাহ-নিয়ন্ত্রকের গঠন-কৌশল সহজেই বুঝিতে পারিবে। নিয়ন্ত্রকটি **একটি রোধের** (resistance) **তার-ভর্তি বাক্স-বিশেষ**। একটি হাতল শূন্য অবস্থান হইতে পর্যায়ক্রমে 1, 2, 3,...ইত্যাদি অবস্থানের মধ্য দিয়া লইয়া আসা হয় ও এইভাবে মোটরের মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবেশের পথে **রোধের পরিমাণ ক্রমশঃ বেশী হইতে কম করা হয়**। লক্ষ্য কর 1 **অবস্থানে বিদ্যুৎপ্রবাহকে বাক্সের সব কয়টি রোধ-তারের দৈর্ঘ্য অতিক্রম করিয়া** মোটরে আসিতে হইতেছে, 2 অবস্থানে 1 নং রোধ-তারের দৈর্ঘ্য সমগ্র পথ হইতে **বাদ পড়িয়াছে,** 3 অবস্থানে 1 নং ও 2 নং তারের দৈর্ঘ্য ও এইভাবে শেষ অবস্থানে (ON) বিদ্যুৎপ্রবাহ সরাসরি, অর্থাৎ রোধ-তারগুলির সব কয়টিকে লঙ্ঘন করিয়া, A হইতে (হাতলের তার বাহিয়া) একেবারে B পথে মোটরে প্রবেশ করিতেছে, সুতরাং বিদ্যুৎপ্রবাহের পূর্ণ শক্তি তখন মোটরে প্রযুক্ত হইয়া উহাকে দ্রুততম গতিতে চালাইবে।

চিত্র নং ২২৭। বৈদ্যুতিক পাখার রেগুলেটর। হাতলের ৬ নং অবস্থানে বিদ্যুৎপ্রবাহ A হইতে একেবারে ৬টি নং রোধ তারের মধ্য দিয়া B হইয়া মোটরের ভিতর যাইতেছে

সংবাদ আদান-প্রদানে বিদ্যুৎশক্তি

টেলিগ্রাফ (Telegraph)

বৈদ্যুতিক ঘণ্টার কথা পূর্বে আলোচনা করা হইয়াছে। ইহাকেও সংবাদ প্রেরণের এক প্রকার সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা বলিয়া মনে করা যায় কারণ ইহার সাহায্যে বহিরাগত কোনও ব্যক্তি বাড়ীর ভিতরের লোকজনদের তাহার

আগমন-বার্তা জানাইতে পারে। আবার অনেক সময় ইহার সাহায্যে বিপদের সঙ্কেতও (যেমন আগুন-লাগা) প্রয়োজনীয় স্থানে ঘোষিত হইয়া থাকে। কিন্তু **দুই পক্ষে বিধিবদ্ধভাবে সংবাদ আদান-প্রদানের** কিরূপ সুষ্ঠু ব্যবস্থা বিদ্যুতের সাহায্যে হইতে পারে—এবারে তাহারই আলোচনা করা যাইতেছে।

টেলিগ্রাফের মূল নীতি—এই সম্পর্কে সর্বপ্রথমেই **টেলিগ্রাফের** (telegraph) কথা মনে পড়ে, কারণ দূর পথে, সহজে সংবাদ প্রেরণ করিবার ইহা অপেক্ষা আর কি সুন্দর ব্যবস্থা হইতে পারে? ইহার মূল নীতিটি অতীব সহজ। পূর্বে যে **সরল বৈদ্যুতিক ঘণ্টার** আলোচনা করা হইয়াছে, (১৯৩ নং চিত্র) যাহাতে সুইচ টিপিয়া ও ছাড়িয়া ঘণ্টার এক একটি শব্দ পৃথকভাবে সৃষ্টি করার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, এই ঘণ্টাধ্বনির ভঙ্গী নানারকম করিয়া বর্ণমালার এক একটি অক্ষর নির্দেশ করা যায় এবং এইভাবে দূরে **সঙ্কেতে** সংবাদ পাঠানো যাইতে পারে। এই ব্যবস্থারই কিছু পরিবর্তিত রূপ হইল টেলিগ্রাফ। টেলিগ্রাফে অবশ্য ঘণ্টা বাজাইবার রীতি নাই, শুধু হাতুড়ীর দণ্ড তড়িচ্চুম্বকের গায়ে লাগিয়া যে 'টক্' 'টক' শব্দ করিবে—তাহারই ইঙ্গিতে বাক্যবিন্যাস করিয়া সংবাদ প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়। **'Tele' অর্থ দূরে**, 'graph' অর্থ লেখা—অর্থাৎ **দূর হইতে** লেখার ব্যবস্থা। তোমরা অবশ্য জানো টেলিগ্রাফে ঠিক সরাসরি কোনও লেখা এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে পাঠানো হয় না: এ সম্বন্ধে পরে আবার আলোচনা করা হইবে। যাহা হউক এখন এই যন্ত্রটির গঠন ও কার্যপ্রণালী একটু ভাল করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করা যাক :—

শব্দের সঙ্কেতে অক্ষর সৃষ্টি—প্রথমে 'টক'-'টক' জাতীয় কতকগুলি অর্থহীন আওয়াজের সাহায্যে কেমন করিয়া শব্দ রচনা করা যায় বিবেচনা করা যাক। আমরা জানি ১ হইতে ৯ ও অতিরিক্ত আর একটিচিহ্ন O—মাত্র এই দশটি অঙ্ক (digit) বিভিন্ন ভঙ্গীতে সাজাইয়া কেমন সব রকমের সংখ্যা নির্দেশ করা যায়। তেমনি মাত্র দুই রকম আওয়াজ—একটি **হ্রস্ব "টক"** ও আর একটি **দীর্ঘ "টক"**—ইহাদের নানাভাবে বিন্যাস করিয়া ইংরাজী বর্ণমালার ২৬টি অক্ষর, কমা (comma), ফুলষ্টপ (full stop)

প্রভৃতি যতিচিহ্নগুলি, অংক (digit)—সব নির্দেশ করা যায়। সুইচে একটি ছোট টিপ দিলে "হ্রস্ব টক" বোঝায়, আর লম্বা টিপ দিলে "দীর্ঘ টক" জ্ঞাপন করে। ইংরাজীতে ইহাদের যথাক্রমে DOT ও DASH বলে, আমরা বাংলায় ইহাদের 'টরে' ও 'টক্কা' নাম দিতে পারি। এইবার নীচের চার্টে এই সংকেতে কয়েকটি অক্ষর গঠনের নমুনা দেখিলে বুঝা যাইবে DOT ও DASH এই দুইটি চিহ্নের সাহায্যে কেমন করিয়া বিভিন্ন অক্ষর ও অংক নির্দেশ করা যাইতে পারে :—

চিত্র নং ২২৮ : মর্স পদ্ধতিতে (Morse Code) টরে টক্কা ধ্বনির সাহায্যে ইংরাজী অক্ষর, অংক প্রভৃতি জ্ঞাপন করিবার সংকেত, A—টরে টক্কা, B—টক্কা টরে টরে-টরে ইত্যাদি।

শব্দ প্রেরণের ব্যবস্থা—এইবার শব্দ প্রেরণের কৌশলটি আলোচনা করা যাক। নীচের চিত্র দুইটি দেখ। **প্রেরক প্রান্তে** (transmitting station) একটি **চাবী** (K) টিপিবার সঙ্গে সঙ্গে তীর-চিহ্নিত পথ বাহিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ একটি বর্তনী (circuit) সম্পূর্ণ করিতেছে। এই বর্তনীতে **গ্রাহক প্রান্তে** (receiving station) একটি তড়িচ্চুম্বক বসিয়াছে।
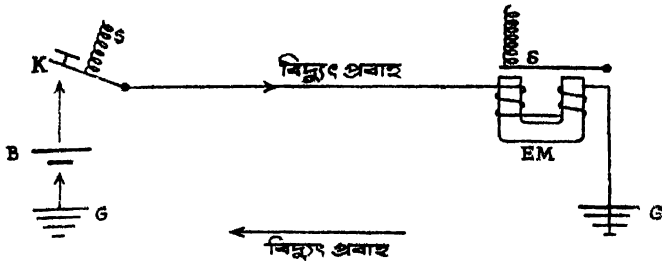
চিত্র নং ২২৯ : টেলিগ্রাফের সরল নকশা ; B—ব্যাটারি, K—চাবি (প্রেরক প্রান্তে), S—চাবির স্প্রিং ; LM—তড়িচ্চুম্বক (গ্রাহক প্রান্তে)—সম্মুখে হাতুড়ীর দণ্ড (S)-সহ ; G-G—মাটির মধ্য দিয়া বর্তনী সম্পূর্ণ হইতেছে

সুতরাং বর্তনী সম্পূর্ণ হইবামাত্র তড়িচ্চুম্বকটি সামনের স্প্রিংওয়ালা **হাতুড়ীর দণ্ডটিকে** (S) আকর্ষণ করিবে ও প্রেরক প্রান্তের আওয়াজের অনুরূপ গ্রাহক প্রান্তে 'টরে' কিংবা টক্কা' আওয়াজ হইবে। চাবিটি ছাড়িয়া দিলে -বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ হইবে এবং হাতুড়ীর দণ্ডটি তড়িচ্চুম্বকের স্পর্শ ছাড়িয়া পূর্বের স্থানে ফিরিয়া আসিবে। সুতরাং প্রেরকপ্রান্তে প্রয়োজনমত সুইচের টিপ দিয়া গ্রাহক প্রান্তে যে কোনও বাক্য, সংখ্যা ইত্যাদি জ্ঞাপন করা যাইতে পারে ও এইভাবে সংবাদ পাঠানো যায়।

এখানে লক্ষ্য কর বিদ্যুৎবর্তনীতে একটি তার প্রেরক স্টেশন হইতে গ্রাহক স্টেশন পর্যন্ত গিয়াছে কিন্তু প্রেরক প্রান্তে আবার ফিরিয়া আসে নাই। সুতরাং **বিদ্যুৎবর্তনী সম্পূর্ণ হইল কি করিয়া?** টেলিগ্রাফ আবিষ্কারের প্রথম দিকে অবশ্য বিদ্যুৎপ্রবাহ ফিরিয়া আসিবার জন্য দ্বিতীয় আর একটি তার ব্যবহার করা হইত। কিন্তু পরে দেখা গেল উহার প্রয়োজন নাই। প্রেরক তারটির দুই প্রান্তে দুইটি ধাতুর পাত জুড়িয়া যদি উহাদের গভীরভাবে মাটির মধ্যে প্রোথিত করিয়া দেওয়া যায় তাহা হইলে মাটিই সুন্দর বাহকের কাজ করিয়া বর্তনীটি সম্পূর্ণ করিবে।
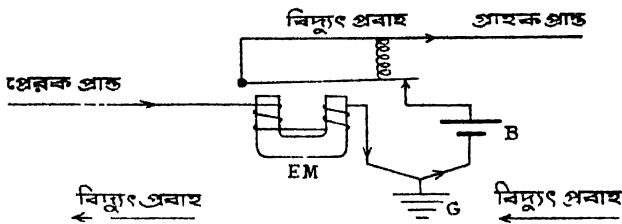
চিত্র নং ২৩০ : টেলিগ্রাফে রিলে পদ্ধতির নকশা ; EM—তড়িচ্চুম্বক, B—ব্যাটারি, G—মাটি ; রিলের বর্তনী কিরূপে সম্পূর্ণ হয় লক্ষ্য কর

দ্বিতীয় কথা—ব্যবহারিক ক্ষেত্রে দেখা গেল এভাবে দীর্ঘ পথ বাহিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ চলিবার পর উহা এত ক্ষীণ হইয়া পড়ে যে অপর প্রান্তে পৌঁছিয়া উহার আর তড়িচ্চুম্বকের হাতুড়ী টানিবার ক্ষমতা থাকে না। তাই **রিলে পদ্ধতির** (relay system) ব্যবস্থা হইয়াছে। (অনেকটা তোমাদের স্পোর্টসএর relay race এর মত)। চিত্রটি দেখিলেই ব্যবস্থাটির

বিদ্যুৎপ্রবাহ জোরালো করা—রিলে (relay)

কৌশল বুঝিতে পারিবে। লক্ষ্য কর—প্রেরকপ্রান্তে চাবি টিপিবার সহিত রিলের তড়িচ্চুম্বকের (EM) তারে বিদ্যুৎ সরবরাহ হইয়া চুম্বকটি সক্রিয় হইয়া উঠিবে এবং সম্মুখস্থ লোহার দণ্ডকে আকর্ষণ করিবে। দণ্ডটি চুম্বককে স্পর্শ করিবামাত্র **রিলের বর্তনী সম্পূর্ণ হইয়া** (ছবিতে লক্ষ্য কর) রিলের ব্যাটারি (B) হইতে বিদ্যুৎপ্রবাহ শুরু হইবে এবং মূল প্রবাহকে শক্তিশালী করিবে। তাই মধ্যে মধ্যে এরূপ রিলে স্থাপন করিলে বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি ক্ষীণ হইতে পারিবে না।
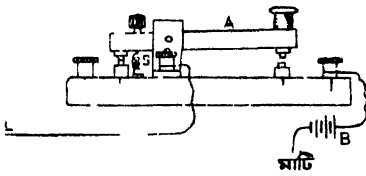
চিত্র নং ২৩১ প্রেরক যন্ত্র : চাবির হাতল (A) চাপলে ব্যাটারির বর্তনী সম্পূর্ণ হইয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ গ্রাহক প্রান্তে তড়িচ্চুম্বক চালায়
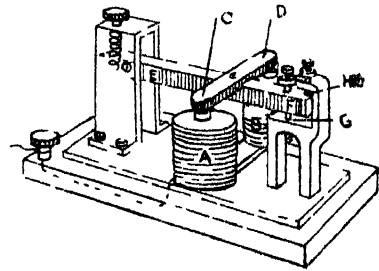
চিত্র নং ২৩২ : গ্রাহক যন্ত্র ; A-B তড়িচ্চুম্বক সক্রিয় হইয়া CD দণ্ডটিকে আকর্ষণ করিলে উহার টানে EF হাতলটি নামিয়া G বিন্দুতে আঘাত করে এবং 'টরে' বা 'টক্কা' আওয়াজ হয়

উপরে একটি আসল টেলিগ্রাফের **প্রেরক যন্ত্র** (transmitter) ও একটি **গ্রাহক যন্ত্রের** (receiver) ছবি দেওয়া হইল। তোমরা পোষ্ট ও টেলিগ্রাফ অফিসে টেলিগ্রাফ বিভাগে টেবিলে নিশ্চয় এই প্রকার দুইটি যন্ত্র দেখিয়াছ। একটু লক্ষ্য করিলে ইহাদের কার্যপ্রণালী বুঝিতে অসুবিধা হইবে না।

টেলিপ্রিণ্টার (teleprinter)—পূর্বেই বলা হইয়াছে 'টেলিগ্রাফ'—ইহার নামের অর্থ অনুযায়ী ঠিক '**দূর হইতে লেখা**'র ব্যবস্থা নহে। কিন্তু এরূপ ব্যবস্থাও সম্ভব এবং সংবাদপত্রের অফিসে আজকাল এই প্রকার যন্ত্রের ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এই মজার যন্ত্রটির নাম **টেলিপ্রিণ্টার**। ইহাতে প্রেরক প্রান্তে ঠিক টেলিগ্রাফের নীতিতে একটি **টাইপ রাইটার** (type-writer) যন্ত্রের চাবি টিপিয়া গ্রাহক প্রান্তে আর একটি টাইপ-রাইটার

তড়িচ্চুম্বকের প্রক্রিয়ায় চালানো হয় এবং উহাতে তখন সংবাদটি **সরাসরি সাধারণ ভাষায় কাগজের উপর ছাপা হইয়া** বাহির হইয়া আসে।

টেলিফোন (T on)

কিন্তু যতই কাজের ও সুবিধার হউক না কেন টেলিগ্রাফ প্রাণহীন অক্ষরের সংবাদ মাত্র। তা ছাড়া টেলিগ্রাফের "টরে-টক্কা" আওয়াজকে সাধারণ ভাষায় রূপান্তরিত করার জন্য বিশেষ শিক্ষাপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন, নচেৎ তোমার-আমার কাছে এই আওয়াজ ও কাঠ-ঠোকরার আওয়াজে বিশেষ কোনও প্রভেদ নাই। দূর প্রবাসে, আমার চক্ষুর অন্তরালে যে বন্ধু বা আত্মীয় রহিয়াছেন তাঁহার পরিচিত প্রীতিপূর্ণ জীবন্ত কণ্ঠস্বরে সংবাদটি শুনিলে মন আনন্দে ভরিয়া উঠে। সত্যই এই প্রেরণার বশেই একদিন স্কটল্যাণ্ডের এক বৈজ্ঞানিক—তাঁহার নাম গ্রেহাম বেল (Graham Bell)—পণ করিয়াছিলেন যে **বিদ্যুৎকে কথা বলাইতে হইবে,** আর তাহারই ফল ঘরে ঘরে আজিকার দিনের **টেলিফোন**। এইবার এই অপূর্ব যন্ত্রটির গঠন-কৌশল বুঝিতে চেষ্টা করা যাক।

স্বাভাবিকভাবে আমরা যখন শব্দ শুনি তখন শব্দায়মান বস্তুটির কম্পন বাতাসে তরঙ্গের আকারে বাহিত হইয়া আমাদের কানের পর্দায় আঘাত করে। কিন্তু সাধারণ শব্দের এই কম্পন পাঁচশ হাজার মাইল কেন, এক মাইল দূরত্বেই ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আর কানে পৌঁছিবে না, তাই বিদ্যুতের শরণ লইতে হয়। **শব্দ বাতাসে তরঙ্গ না তুলিয়া যদি বিদ্যুৎ-প্রবাহে অনুরূপ তরঙ্গ** সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাকে দূর পথে পাঠাইতে অসুবিধা নাই, কারণ বিদ্যুৎপ্রবাহের তরঙ্গ ইচ্ছামত শক্তিশালী করা যায়। দ্বিতীয়, **বিদ্যুৎপ্রবাহের গতিও কল্পনাতীত দ্রুত।** বাতাসে শব্দের তরঙ্গ হইল—পর্যায়ক্রমে সঙ্কোচন ও প্রসারণের ঢেউ। বিদ্যুৎস্রোতে অনুরূপ তরঙ্গ করিতে হইলে উহার মধ্যে শব্দটির ভঙ্গীতে প্রবল ও মৃদু স্রোতের একটা ছন্দ সৃষ্টি করিতে হইবে। কি করিয়া ইহা সম্ভব?

আমরা জানি **বিদ্যুৎস্রোতে রোধ** (resistance)-**এর পরিমাণ অনুযায়ী স্রোত কখনও প্রবল, কখনও মৃদু হয়।** এখন

মনে কর—তুমি একটি কার্বনের পাতলা পর্দার (diaphragm) সম্মুখে কথা বলিতেছ; পর্দাটির চারিপাশ আঁটা আছে, সুতরাং উহাও শব্দের কম্পনে কাঁপিতেছে—অর্থাৎ **একবার আগাইয়া, একবার পিছাইয়া** যাইতেছে। আরও মনে কর—পর্দার পিছনটি একটি বাক্স-আকারের এবং উহাতে **কার্বনের দানা** (carbon grannules) ভর্তি আছে। তাহা হইলে পর্দাটি কাঁপিবার সময় যখন পিছাইয়া যাইবে তখন কার্বনের দানাগুলিকে কিছু ঠাসিয়া ধরিবে অর্থাৎ দানাগুলি আরও কাছাকাছি আসিবে, এবং পর্দাটি আগাইয়া আসিলে দানাগুলি বাক্সে বেশী জায়গা পাইয়া কিছু ছড়াইয়া পড়িবে অর্থাৎ উহাদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবধান বেশী হইবে। সহজেই বুঝা যায় দানাগুলি কাছাকাছি আসিলে উহাদের মধ্যে সংযোগ ভাল হইবে, কাজেই বিদ্যুৎ-প্রবাহে রোধ কম হইয়া প্রবাহ কিছু প্রবল হইবে। বিপরীত অবস্থায় বিপরীত ফল হইবে, অর্থাৎ রোধ বাড়িয়া বিদ্যুৎপ্রবাহের শক্তি কমিয়া যাইবে। বিদ্যুৎস্রোতে পর্যায়ক্রমে, এইরূপ **মুহূর্তস্থায়ী জোয়ার ও ভাটার সৃষ্টি হইতে** থাকিবে। আমরা কল্পনা করিতে পারি—এইভাবে **বিদ্যুৎস্রোতে তোমার কথার শব্দ-তরঙ্গের একটা ছাপ** পড়িয়া যাইবে।

শব্দতরঙ্গ হইতে অনুরূপ বিদ্যুৎতরঙ্গ সৃষ্টি
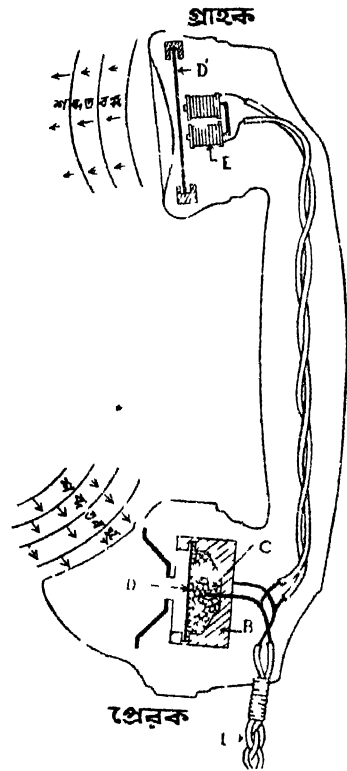
চিত্র নং ২৩৩: টেলিফোনের গ্রাহক-ও প্রেরক যন্ত্র; D'-ইস্পাতের পর্দা; E-তড়িচ্চুম্বক; D-কার্বনের পর্দা; C-কার্বনের দানা; B ধাতুর আবরণ; L-পরিবাহী তার

এখন **অপর প্রান্তে কি হইবে** দেখ। শব্দের তরঙ্গ-ভরা এই বিদ্যুৎ-প্রবাহকে যদি গ্রাহক প্রান্তে একটি তড়িচ্চুম্বকের তারের কুণ্ডলীর মধ্য দিয়া লইয়া যাওয়া হয় এবং ঐ চুম্বকের সম্মুখে একটি পাতলা ইস্পাতের পর্দা থাকে তাহা হইলে তড়িচ্চুম্বকের তারে বিদ্যুৎ-প্রবাহের জোয়ার-ভাটার সহিত চুম্বকটির শক্তিও কম-বেশী হইবে, এবং তদনুযায়ী উহা সম্মুখের কার্বনের পর্দাটিকেও কম-বেশী আকর্ষণ করিবে অর্থাৎ উহাতে স্পন্দন সৃষ্টি হইবে। এই স্পন্দনের ভঙ্গী হইবে অবিকল প্রেরক প্রান্তে তোমার কণ্ঠস্বর কার্বনের পর্দায় যে কম্পন তুলিয়াছিল তাহার প্রতিচ্ছবি। ইহার অর্থ হইল—**গ্রাহক প্রান্তে প্রেরক প্রান্ত হইতে উচ্চারিত শব্দের পুনরুৎপাদন** (reproduction) হইবে। (ইহার সহিত ১৯০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত গ্রামোফোনে শব্দের পুনরুৎপাদন পদ্ধতির তুলনা কর)। ইহাই হইল টেলিফোনের মূল বৈজ্ঞানিক নীতি এবং এইভাবেই গ্রেহাম বেল বিদ্যুৎকে কথা বলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

বিদ্যুৎতরঙ্গ হইতে শব্দ-তরঙ্গের পুনরুৎপাদন

বর্ণনায় টেলিফোনের তত্ত্বটি যেমন সহজ মনে হইল, কার্যক্ষেত্রে কিন্তু টেলিফোনে কথা পাঠানো ততটা সহজে সম্ভব হয় নাই। নানা ব্যবহারিক বাধা আসিয়া দেখা দেয় এবং সেগুলি কৌশলে যান্ত্রিক নানা খুঁটিনাটির উন্নতিবিধানের দ্বারা দূর করিয়া আজিকার সর্বাঙ্গসুন্দর টেলিফোন ব্যবস্থা সম্ভব হইয়াছে। টেলিফোনের তার আজ পর্বতের শিখরে, সমুদ্রের তলদেশে—সর্বত্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া দূরকে নিকট, পরকে আপন করিয়াছে, **পৃথিবী ইহার দৌলতে আজ একটি বিশ্ব-পরিবারে পরিণত হইয়াছে।**

অনুশীলনী

১। নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দাও :—

(ক) লেক্লান্সে সেল মোটর গাড়ীর ব্যাটারির উদ্দেশ্যে সুবিধাজনক নহে।

(খ) সঞ্চায়ক সেলে ঝাঁঝরা সিসার পাত ব্যবহৃত হয়।

(গ) গ্যালভ্যানির পরীক্ষায় সদ্যোমৃত ব্যাঙের পা ধাতুর সংস্পর্শে লাফাইয়া উঠিয়াছিল।

(ঘ) ইলেকট্রিক ষ্টোভে ও বিজলি বাতিতে কুণ্ডলীকৃত তার ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) ডেনিয়েল সেলে ছদন ঘটিতে পারে না।

২। নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :—

(ক) বৈদ্যুতিক মোটরের অন্য কি নাম দেওয়া যাইতে পারে ?

(খ) লেক্লান্সে সেল ও ড্রাই সেলের মধ্যে প্রভেদ কি ?

(গ) (i) ইলেকট্রিক স্টোভে, (ii) ইলেকট্রিক কেটলিতে কি কি প্রক্রিয়ায় তাপ সঞ্চালিত হয় ?

(ঘ) উন্নত ধরণের বিজলি বাতিতে মোটামুটি কি কি পরিমাণ বৈদ্যুতিক শক্তি (i) আলোক সৃষ্টিতে, (ii) তাপ সৃষ্টিতে ব্যয়িত হয় ?

(ঙ) ভোল্ট, অ্যাম্পিয়র, ওম, ওয়াট—এই এককগুলি বিদ্যুৎ প্রবাহের কি কি ধর্ম মাপিবার জন্য ব্যবহৃত হয় ?

৩। নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির কয়েকটি সত্য, বাকীগুলি সত্য নহে; কোনগুলি সত্য বল :—

(ক) সঞ্চায়কের সাধারণ নাম গ্রাহী সেল।

(খ) ইলেকট্রিক ফিউজ মোটা, দৃঢ় তারে প্রস্তুত হওয়া প্রয়োজন।

(গ) ইলেকট্রোপ্লেটিং এ পুরাতন ধাতুর বস্তুটিকে ভল্টামিটারের ক্যাথোড করা হয়।

(ঘ) যে মেরুর মধ্য দিয়া বিদ্যুৎ-প্রবাহ সেলের মধ্যে প্রবেশ করে উহাকে পজিটিভ মেরু বলে।

(ঙ) বৈদ্যুতিক ঘণ্টা ও টেলিগ্রাফ মূলতঃ একই বৈজ্ঞানিক নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত।

৪। নক্সার সাহায্যে সংক্ষেপে (ক) টেলিফোন, (খ) অলটারনেটরের মূল নীতি বুঝাইয়া দাও।

তৃতীয় অধ্যায়

ধাতু ও সংকর ধাতু
(Metals and Alloys)

পৃথিবীর মৌলিক পদার্থগুলিকে ধাতু ও অধাতু—এই দুই বিভাগে ভাগ করা যায় দেখিয়াছি এবং ইহাদের সহিত রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যৌগ পদার্থগুলির সম্বন্ধেও সাধারণভাবে আলোচনা করা হইয়াছে (১১০ পৃষ্ঠা)। ধাতুগুলি সাধারণত দ্যুতিমান (lustrous), ঘাতসহ (malleable), প্রসারণশীল (ductile) এবং উত্তম উত্তাপ ও বিদ্যুৎ পরিবাহক এবং অধাতুগুলির এই সকল গুণ নাই। উভয় ক্ষেত্রেই অবশ্য কিছু কিছু ব্যতিক্রম দেখা যায়। এখানে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় ধাতু ও সংকর ধাতু সম্বন্ধে আলোচনা করিব।

বর্তমান বৈজ্ঞানিক যুগে ধাতুর প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। আমাদের নিত্যদিনের জীবনের কাজকর্মের একটু হিসাব লইলেই দেখা যায় আমরা ইহাদের কত বিচিত্র প্রয়োজনে ব্যবহার করিতেছি। ধাতুগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অন্য ধাতু বা অধাতুর সহিত মিশ্রিত অবস্থায় ব্যবহৃত হয়, কারণ **সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ অবস্থায় ইহারা সাধারণতঃ কিছু নরম থাকে,** কাজে কাজেই ইহাদের দ্বারা নির্মিত বস্তু তেমন দৃঢ় বা মজবুত হয় না। তা ছাড়া এই মিশ্রণের ফলে ধাতুগুলির গুণেরও অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে যাহা ইহাদের প্রয়োজনীয়তা বহুগুণে বাড়াইয়া দেয়।

সংকর ধাতুর সাধারণ গুণ

স্বর্ণ এবং আরও অল্প কয়েকটি ধাতু প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় পাওয়া যাইলেও অধিকাংশ ধাতুই যৌগিক অবস্থায় দেখা যায়। প্রকৃতিতে ধাতুগুলি যে যৌগিকরূপে বর্তমান তাহাদের **ধাতু-প্রস্তর** (ores) বলে। এজন্য ধাতুগুলিকে আমাদের প্রয়োজনে লাগাইতে হইলে প্রথমে উহাদিগকে কিরূপে ইহাদের ধাতুপ্রস্তর হইতে **নিষ্কাশন** (extraction) করা যায় তাহা জানিতে হইবে।

লৌহ

প্রকৃতিতে লৌহের স্থান পরিমাণের দিক হইতে দ্বিতীয়, **প্রথম** স্থানের গৌরব অধিকার করিয়াছে—অ্যালুমিনিয়ম। কিন্তু পৃথিবীতে **উৎপাদনের পরিমাণ** বিচার করিলে লৌহের স্থান হয় প্রথম, অ্যালুমিনিয়মের দ্বিতীয়। স্বর্ণ, রৌপ্য তাহাদের সৌন্দর্যের জন্য অলঙ্কার ও সৌখীন দ্রব্যাদি নির্মাণে ব্যবহার হয়, **স্বর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যবসায়-জগতে মূল্যের** একমাত্র **মানদণ্ড**, কিন্তু বর্তমান সভ্যতায় কি শান্তিকালীন, কি যুদ্ধকালীন প্রয়োজনে লৌহের কাছাকাছি আসিতে পারে এমন কোনও ধাতু নাই। আমরা **এখনও 'লৌহযুগে' বাস করিতেছি**—বলিলে বোধ হয় ভুল বলা হয় না।

প্রকৃতিতে কি ভাবে থাকে—ভূত্বকের ওজনের শতকরা প্রায় পাঁচ ভাগ লৌহ। কিন্তু স্বাভাবিক অবস্থায় মৌলরূপে লৌহকে বিশেষ দেখা যায় না—একমাত্র বোধ হয় উল্কাপিণ্ডের মধ্যে ইহাকে ধাতুরূপে সামান্য পরিমাণে থাকিতে দেখা যায়। সুতরাং সমস্ত লৌহই প্রায় যৌগ আকারে—সাধারণতঃ অক্সিজেন ও গন্ধকের সহিত মিলিতভাবে—বর্তমান। ইহাদের মধ্যে নিম্নলিখিত ধাতু-প্রস্তরগুলি প্রধান :—

ক। **অক্সাইড**—(১) হিমাটাইট (haematite)

(২) ম্যাগনেটাইট (magnetite) বা চুম্বক-পাথর। এই পাথর চুম্বক দ্বারা আকৃষ্ট হয় বলিয়া এই নাম।

খ। **সালফাইড**—লৌহ-মাক্ষিক (iron pyrites) নামে এই দ্রব্যটি দেখিতে পিতলের ন্যায় বলিয়া ইহাকে অনেক সময় 'নির্বোধের স্বর্ণ' ('fool's gold') বলা হইয়া থাকে।

সাধারণতঃ হিমাটাইট হইতে লৌহ নিষ্কাশিত করা হয়। লৌহ-মাক্ষিক কখনও এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয় না, ইহা সম্পূর্ণভাবে সালফিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে উড়িষ্যার উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে লৌহের খনি আছে, তাই কাছাকাছি বিহারের টাটানগরে বিখ্যাত লৌহের কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে।

লৌহ নিষ্কাশন—অক্সাইড হইতে লৌহ নিষ্কাশন-পদ্ধতির মূলনীতি হইল জলন্ত কয়লার সাহায্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইডরূপে যুক্ত অক্সিজেনকে দূরীভূত করা, আর কাদা বালি যাহা ধাতু-প্রস্তরের সহিত মিশ্রিত থাকে, উহাদের চুনের সহযোগে তরল পদার্থে পরিণত করিয়া সরাইয়া দেওয়া। বিরাট **মারুত-চুল্লীর** (blast furnace) মধ্যে ধাতুপ্রস্তর, কয়লা ও চুন একত্রে ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং কয়লায় অগ্নি-সংযোগ করিয়া প্রবল বেগে উহার মধ্যে উত্তপ্ত বাতাস চালিত করা হয়। (এই জন্যই **blast furnace** নাম)। প্রচণ্ড আগুনে পূর্বোক্ত রাসায়নিক ক্রিয়াগুলি চলিতে থাকে এবং গলিত ধাতব লৌহ চুল্লীর তলদেশের নির্গম-নল দিয়া তরল আগুনের ন্যায় বাহির হইয়া উপযুক্ত পাত্রে সংগৃহীত হয় অথবা সম্মুখে উন্মুক্ত স্থানে বালির উপর ঘরকাটা ছাঁচে জমে এবং পরে শীতল ও কঠিন হইয়া লম্বা লম্বা পিণ্ডে পরিণত হয়। কাদা, বালির সহিত চুনের সংযোগে যে **ধাতুমল** (slag) উৎপন্ন হয় উহা **হালকা** বলিয়া তরল লৌহের স্তরের উপর ভাসিয়া উঠে এবং কিছু উপরের আর একটি নির্গম-নল দিয়া বাহির করিয়া লওয়া হয়। তোমরা টাটানগরে বেড়াইতে যাইলে দূর হইতে আকাশের গায়ে দৈত্যের ন্যায় বিরাট, দীর্ঘাকৃতি এই সব মারুত চুল্লী নিশ্চয় তোমাদের নজরে পড়িবে।
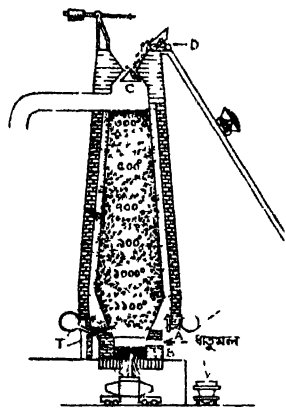
চিত্র নং ২৩৪ : মারুত চুল্লী, D—চুল্লীর মুখে গাড়ী কাৎ করিয়া ধাতু-প্রস্তর ঢালিয়া দেওয়া হইতেছে, আর একটি গাড়ী রেল বাহিয়া উপরে উঠিতেছে; T—উত্তপ্ত বাতাসের প্রবেশ-পথ

বিভিন্ন ধরণের লৌহ ও উহাদের গুণ—আমরা সাধারণতঃ যে সব লৌহের জিনিসপত্র দেখি উহারা বিশুদ্ধ লৌহের তৈয়ারি নহে। প্রায় সকল ক্ষেত্রেই লৌহের সহিত সামান্য পরিমাণ কার্বন ও অন্যান্য মৌল পদার্থ মিশ্রিত থাকে। **লৌহের গুণ সাধারণতঃ মিশ্রিত**

কার্বনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে। এইভাবে লৌহকে তিনটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে—

১। **ঢালা লোহা** (cast iron)—ইহাতে কার্বনের পরিমাণ ২-৫% হয়।

২। **ইস্পাত** (steel)—ইহাতে কার্বনের পরিমাণ ১-২% হয়।

৩। **পেটা লোহা** (wrought iron)—ইহা প্রায় বিশুদ্ধ লৌহ।

ঢালা লোহা—মারুত চুল্লী হইতে যে লৌহ প্রস্তুত হয় উহা অবিশুদ্ধ ঢালা লোহা। উহাকে পুনবায় গলাইয়া, বিশেষ করিয়া কার্বন, এবং ফসফরস প্রভৃতি আরও দুই একটি পদার্থের নির্দিষ্ট পরিমাণ মিশাইয়া, বিভিন্ন প্রয়োজনের উপযোগী ঢালা লোহা প্রস্তুত করা হয়। রাস্তার ড্রেনের পাইপ, ছাদের বৃষ্টির জলের পাইপ, ইলেকট্রিক বা গ্যাস-ষ্টোভের বিভিন্ন অংশ, রান্নার কড়াই, ভেন্টিলেটার, রেলিং প্রভৃতি নানা বস্তু এই ঢালা লোহায় প্রস্তুত হয়। ১২-১৯% **সিলিকন** (silicon—ইহা বালির প্রধান উপাদান) মিশ্রিত করিয়া দিলে ঢালা লোহা এরূপ মজবুত হয় যে ঘন অ্যাসিডেও উহার কোনও ক্ষতি করতে পারে না। **'ঢালা** লোহা' বা ইংরাজীতে **cast** iron নাম দেওয়া হইয়াছে এজন্য ইহা সহজেই উত্তাপে গলিয়া যায় এবং এই কারণে **cast** অর্থাৎ **ছাঁচে ঢালিয়া** ইহা হইতে বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়।
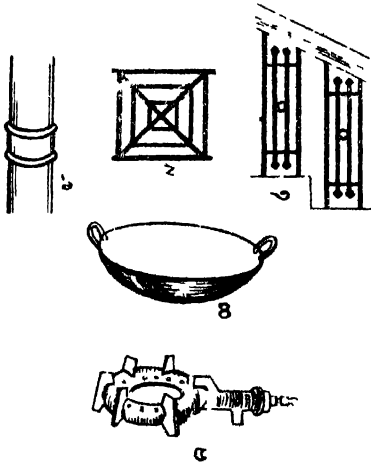
চিত্র নং ২৩৫ : ঢালা লোহায় প্রস্তুত কয়েকটি প্রয়োজনীয় বস্তু, ১—বৃষ্টির জলের পাইপ, ২—ভেন্টিলেটার, ৩—রেলিং, ৪—সাধারণ কড়াই, ৫—গ্যাস ষ্টোভ

ইস্পাত—ইস্পাত শিল্পজগতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী অধিপতি। ইস্পাত বলিতে যে একটি কোনও নির্দিষ্ট রকমের লোহা বোঝায় তাহা নহে, কারণ

কত যে বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত আছে তাহার শেষ নাই। এইগুলি কার্বন ব্যতীত আরও নানা মৌল পদার্থের মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। ক্রোমিয়ম (chromium), নিকেল, ম্যাঙ্গানীজ (manganese), কোবাল্ট (cobalt) প্রভৃতি পদার্থগুলি **এককভাবে** বা **মিশ্রিত করিয়া** বিভিন্ন প্রকার ইস্পাত প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয় এবং ইহারা **লৌহের এক এক গুণ আশ্চর্য রকম বাড়াইয়া দিয়া ও দোষগুলি দূর করিয়া** ইস্পাতকে শিল্পজগতের যাদুকরে পরিণত করিয়াছে।

ভিজা বাতাসে লৌহে মরিচা পড়ে। তাই ঘরের ছাদ প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে লোহার পাতকে গলিত (তাপ প্রয়োগে) দস্তার মধ্যে ডুবাইয়া উহার উপর দস্তার প্রলেপ দেওয়া হয়। ইহাকে **গ্যালভানাইজ** (galvanise) করা বলে। আমরা যে **ঢেউ-খেলানো 'টিন'** (corrugated tin) ব্যবহার করি উহা আসলে 'টিন' নহে, মরিচা পড়া নিবারণের উদ্দেশ্যে এই **দস্তার প্রলেপ-দেওয়া লোহার পাত**।

বিস্কুট, জরদা, ওভালটিন, বার্লি প্রভৃতি দ্রব্যের জন্য যে 'টিনে'র আধার ব্যবহৃত হয় সেগুলিও আসলে টিন নহে, **টিনের প্রলেপ-দেওয়া লোহার পাত** মাত্র। এখানে জানিয়া রাখ সিগারেট, চকোলেট, টফি প্রভৃতি দ্রব্য যে রৌপ্যের ন্যায় ঝকঝকে পাতের আবরণে মুড়িয়া বিক্রয় হয় উহাই হইল আসল ধাতব টিন (২৬৬ পৃষ্ঠা দেখ)।

এখানে মাত্র চারি প্রকার ইস্পাতের বিবরণ দেওয়া হইল—

১। **ম্যাঙ্গানীজ-ইস্পাত**—অসম্ভব রকম কঠিন; তাই পাথর-ভাঙ্গা যন্ত্র, রেলের লাইনের 'পয়েন্ট' (point), লোহার সিন্দুক প্রভৃতি দ্রব্য প্রস্তুতে ব্যবহার হয়।

২। **নিকেল-ইস্পাত**—এই ইস্পাতের তাপে বৃদ্ধির হার কাচের সমান বলিয়া যেখানে কাচের মধ্যে ইস্পাতের তার জুড়িয়া দেওয়া প্রয়োজন, যেমন ইলেকট্রিক বাল্বের প্রবেশক-তার (২৩৩ পৃষ্ঠা), সেই সব ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

৩। **ক্রোমিয়ম-ইস্পাত**—লবণ, জল, অম্ল প্রভৃতির সংস্পর্শে ইহাতে মরিচা ধরে না, সুতরাং উপরিভাগ বরাবর রৌপ্যের ন্যায় উজ্জ্বল থাকে।

'মরিচা-বিহীন ইস্পাত' (stainless steel) নামে ইহার প্রস্তুত থালা-বাসন, ছুরি, চামচ এখন ঘরে ঘরে ব্যবহার হইতেছে।

৪। **নিকেল-কার্বন ইস্পাত**—ইহার স্থিতি-স্থাপকতা (elasticity) উষ্ণতার তারতম্যে বিশেষ পরিবর্তিত হয় না। তাই ঘড়ির ব্যালেন্স স্প্রিং (balance spring), মাপিবার স্কেল প্রভৃতি প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়।

চিত্র নং ২৩৬ : ইস্পাতে তৈয়ারী কয়েকটি পরিচিত দ্রব্য, ১—রেল লাইন ২—ছুরি, ৩-নিব, ৪—থালা, গেলাস, ৫ ছুঁচ, ৬— আলপিন

স্থিতি-স্থাপকতা, ঘাত-সহনশীলতা, প্রসার্যতা, অনুরণনশীলতা (sonorosity) (ষ্টেশনে ট্রেণ-ছাড়ার ঘণ্টার আওয়াজের কথা মনে কর)—প্রভৃতি ধাতুর সকল গুণগুলিই লোহের মধ্যে কম বেশী পরিমাণে বর্তমান। ইস্পাতের এক ধর্ম যে একটি বিশেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যে ইহাকে প্রয়োজনমত কঠিন বা নমনীয় করা যায়। এই প্রক্রিয়ায় ইস্পাতকে নির্দিষ্ট উষ্ণতায় উত্তপ্ত করিয়া তেল বা জলের মধ্যে ডুবাইয়া ঠাণ্ডা করা হয়। **উষ্ণতার মাত্রা ও কত দ্রুত ঠাণ্ডা করা** হয় তাহার উপর ইস্পাতের প্রকৃতি নির্ভর করে। এই প্রক্রিয়ার নাম **পান দেওয়া**। এই প্রক্রিয়ার সাহায্যে ঘড়ির **স্প্রিং** এর ন্যায় অতীব নমনীয় (elastic) ইস্পাত হইতে ক্ষুরের ন্যায় সুকঠিন—সকল প্রকার প্রয়োজনের ইস্পাত প্রস্তুত করা হয়।

পান দেওয়া (tempering)

পেটা লোহা—বিশুদ্ধ বলিয়া ইহা বেশ নরম এবং আগুনে উত্তপ্ত করিয়া লাল অবস্থায় **পিটাইয়া** নানারকম ব্যবহার্য দ্রব্যে পরিণত করা যায়—এইজন্য **পেটা** লোহা নাম। কামারের দোকানে এই কাজ তোমরা নিশ্চয় দেখিয়া থাকিবে। হাতা, খুন্তি, সাঁড়াশী, দরজার কড়া, ডাল রান্নার কড়াই (ইহা ঢালা লোহারও হয়) প্রভৃতি গৃহস্থালীর অনেক দ্রব্য পেটা

লোহায় প্রস্তুত হয় পেটা লোহায় প্রস্তুত দ্রব্যাদির মধ্যে দিল্লীর নিকট চন্দ্ররাজের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ লোহ-স্তম্ভ (২৬৫ পৃষ্ঠা) বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উহা বিজ্ঞানের দিক হইতে এক বিস্ময়কর সৃষ্টি! কারণ ঐ যুগে (৪০০ শতাব্দী) এরূপ একটি বিরাট সমগ্র লৌহখণ্ডকে কিরূপে চুল্লীতে উত্তপ্ত করিয়া ও পিটাইয়া তাহার বিশেষ আকার ও কারুকার্য রচিত হইয়াছিল তাহার সদুত্তর পাওয়া যায় নাই।
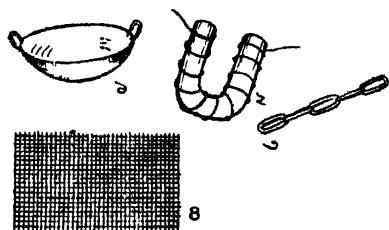
চিত্র নং ২৩৭ : পেটা লোহায় প্রস্তুত কয়েকটি ব্যবহার্য দ্রব্য ; ১—কড়াই, ২—তড়িচ্চুম্বকের লৌহ, ৩—শিকল, ৪—তারের জাল

তাম্র (copper)

তাম্রের সহিত মানুষের পরিচয় আদিম কালের। ইহা প্রায় স্বর্ণের সমসাময়িক। টিনের সহিত মিশ্রিত হইয়া **ব্রোঞ্জ** (bronze) নামে ইহা প্রাচীন যুগ হইতে মানুষের প্রয়োজনের নানা দ্রব্য নির্মাণে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে।

তাম্র যথেষ্ট পরিমাণে প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় পাওয়া যায়। তা ছাড়া অধিকাংশ তাম্রই উহার **সালফাইড** যৌগরূপে এবং কিছু অক্সাইড ও কার্বনেট যৌগরূপে বর্তমান। ভারতবর্ষে বিহারের সিংভূম জেলায় কিছু **তাম্র সালফাইডের** (copper pyrites) খনি আছে। কাছাকাছি ঘাটশীলায় এই ধাতু-প্রস্তর হইতে তাম্র প্রস্তুত করা হয়।

নিষ্কাশন—ক। **অক্সাইড** বা **কার্বনেট** হইতে—ইহার প্রক্রিয়া খুবই সহজ। বিচূর্ণ ধাতু-প্রস্তরের সহিত কার্বন মিশ্রিত করিয়া চুল্লীতে অগ্নিসংযোগ করিলে অক্সিজেন (কার্বন-ডাই-অক্সাইড আকারে) বা কার্বন-ডাই-অক্সাইড (উত্তাপের ফলে) দূরীভূত হইয়া ধাতব তাম্র বাহির হইয়া আসে।

খ। **তাম্র সালফাইড** হইতে—ইহার প্রক্রিয়া কিছু জটিল, কারণ এই ধাতু-প্রস্তরে কিছু লৌহও মিশ্রিত থাকে এবং উহাকে দূর করিতে যথেষ্ট বেগ পাইতে হয়। বেশ কয়েকটি ধাপে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন করিতে হয়।

গুণ ও ব্যবহার—তাম্রের প্রধান ব্যবহার হইল বিদ্যুৎ পরিবহনের তার নির্মাণে, কারণ ইহার **পরিবাহিতা অতি উৎকৃষ্ট,** একমাত্র রৌপ্যের পরেই। কিন্তু ইহার জন্য প্রয়োজন **বিশুদ্ধ** তাম্র, নচেৎ সামান্য পরিমাণ অন্য পদার্থের মিশ্রণে ইহার পরিবাহিতা বিশেষ রকম হ্রাস পায়। এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত বিশুদ্ধ তাম্র **বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায়** (electrolytic process) প্রস্তুত করা হয়। ইহার মূল নীতি ২ ০ ও ২১১ পৃষ্ঠায় বর্ণিত হইয়াছে। এই প্রক্রিয়ায় উৎপন্ন তাম্রের বিশুদ্ধতা ৯৯'৯৯%। **দীর্ঘ পথ বাহিয়া বিদ্যুৎ পরিবহনের জন্য** যখন তামার তার ব্যবহৃত হয় তখন ইহাকে নিজের ভার ও উন্মুক্ত পরিবেশে ঝড়-বাত্যার প্রচণ্ড আঘাত সহ্য করিবার জন্য বিশেষ সুদৃঢ় করিবার প্রয়োজন হয় এবং এই উদ্দেশ্যে তাম্রের সহিত '৯% **ক্যাডমিয়ম** (cadmium) ধাতু মিশ্রিত করা হয়। ইহাতে ইহার পরিবহন-ক্ষমতা ১০% কমিলেও দৃঢ়তা ৫০% বাড়ানো যায়।

সংকর ধাতু—তাম্রের বিভিন্ন সংকর ধাতুগুলির মধ্যে **পিতলের** নাম সর্বাপেক্ষা সুপরিচিত। পিতল হইল তাম্রের সহিত দস্তার মিশ্রণ। দস্তার পরিমাণ কমাইয়া বাড়াইয়া নানা শ্রেণীর পিতল প্রস্তুত করা হয়। বাসন-পত্র, মুদ্রা, বন্দুকের কার্তুজের (cartridge) খাপ প্রভৃতি নানা দ্রব্য নির্মাণে ইহা ব্যবহৃত হয়। ৪০% দস্তা-যুক্ত পিতল উৎকৃষ্ট মরিচা-প্রতিরোধক বলিয়া **জাহাজের তলদেশের আবরণ** নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

তাম্র হইতে প্রস্তুত সংকর ধাতুর সংখ্যা বোধ হয় অন্য যে কোনও ধাতুর সংকর হইতে অধিক। নীচে পিতল ব্যতীত তাম্রের অন্য কয়েকটি সংকর ধাতুর বিবরণ দেওয়া হইল :—

১। **ব্রোঞ্জ** (bronze)—তাম্র ও টিন বিভিন্ন অনুপাতে মিশ্রিত করিয়া বিভিন্ন প্রকার ব্রোঞ্জ প্রস্তুত হয়। অনেক সময় ইহাদের সহিত কিছু দস্তাও (zinc) মিশ্রিত থাকে।

তাম্রের সহিত ৭% অ্যালুমিনিয়মের মিশ্রণে **অ্যালুমিনিয়ম-ব্রোঞ্জ** প্রস্তুত হয়। ইহার স্বর্ণের ন্যায় প্রভা ইংরাজীর বিখ্যাত প্রবচনটি স্মরণ করাইয়া

দেয়—all that glitters is not gold। সিগারেট কেস (cigarette case) গহনা-পত্র ও নানা সৌখীন দ্রব্য ইহার সাহায্যে প্রস্তুত হয়।

২। **কাঁসা** (bell metal)—ইহাতে ১২—২৪% টিন মিশ্রিত থাকে। কাঁসা আমাদের গৃহস্থালীতে অতি পরিচিত ধাতু। কাঁসর-ঘণ্টা ও বাসন-পত্র প্রস্তুতে ইহার ব্যাপক ব্যবহার হয়।

৩। **জার্মান-সিলভার** (German silver)—ইহা তাম্রের সহিত নিকেল ও দস্তার মিশ্রণে প্রস্তুত হয়। এই সংকর ধাতুর আধুনিক নাম **নিকেল-সিলভার**। ইহার উপর বৈদ্যুতিক বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় রৌপ্যের আস্তরণ ফেলিয়া EPNS বলিয়া বিখ্যাত সংকর ধাতুটি প্রস্তুত হয় ; পূর্বে ইহার কথা বলা হইয়াছে (২০৯ পৃষ্ঠা)।

অ্যালুমিনিয়ম

পূর্বেই বলা হইয়াছে প্রকৃতিতে অ্যালুমিনিয়মের ভাণ্ডার সকল ধাতুর মধ্যে পরিমাণে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছে—যদিও ইহার সবটাই যৌগ আকারে বর্তমান। ইহার পরিমাণের এই বিপুলতার কারণ এই যে ভূপৃষ্ঠের মৃত্তিকা ও শিলার একটি প্রধান উপাদান হইল অ্যালুমিনিয়ম সিলিকেট (ইহা লবণ শ্রেণীতে পড়ে)। কিন্তু অ্যালুমিনিয়মের যৌগ হইতে ধাতব অ্যালুমিনিয়ম পৃথক করা অত্যন্ত দুরূহ ও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার। তাই বহুদিন পর্যন্ত অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার আমাদের নিকট অজ্ঞাত ছিল।

গুণ ও ব্যবহার—বর্তমান জগতে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার লৌহের পরেই। আমরা নিশ্চয় লক্ষ্য করিতেছি যে **এই দুইটি ধাতুর মধ্যে** বিভিন্ন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য **যেন একটা প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতেছে।** আধুনিক যুগে কত বিচিত্র প্রয়োজনে যে মানুষ এই ধাতুটিকে নিয়োগ করিতেছে—ভাবিলে বিস্ময় জাগে। নিম্নে এক একটি করিয়া ইহার বিভিন্ন ধর্ম ও তৎসম্পর্কিত ব্যবহারগুলির আলোচনা করা যাইতেছে। এখানে প্রথমেই বলা যায়—অ্যালুমিনিয়ম শুভ্র, উজ্জ্বল প্রভা-সম্পন্ন ধাতু, সুতরাং দেখিতে সুন্দর বলিয়াও ইহার ব্যবহারে যথেষ্ট আকর্ষণ আছে :

ক। অ্যালুমিনিয়মের **মরিচা-প্রতিরোধক শক্তি** অসীম—বড় বড় সহরের শিল্পাঞ্চলের দূষিত বাতাস পর্যন্ত ইহার গায়ে কলঙ্ক স্পর্শ করিতে

পারে না। ইহার কারণ, বাতাসের সংস্পর্শে প্রথমেই ইহার উপরিভাগে অ্যালুমিনিয়ম-অক্সাইডের একটি সূক্ষ্ম আবরণ পড়ে এবং পরে এই আবরণই ভিতরের ধাতুর স্তরকে মরিচা-পড়ার হাত হইতে রক্ষা করে। এজন্য **ধাতুর মূর্তি নির্মাণে** অ্যালুমিনিয়মের যথেষ্ট ব্যবহার হয়। **লণ্ডনের Piccadilly Circus-এর বিখ্যাত দ্যুতিমান ধাতু-মূর্তিটি** অ্যালুমিনিয়মে প্রস্তুত।
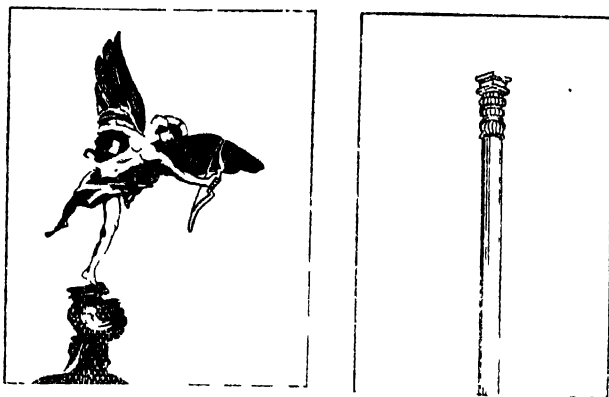
চিত্র নং ২৩৮ : বিশ্বের দুই রাজধানীতে ধাতুশিল্পের দুইটি শ্রেষ্ঠ নিদর্শন ; বামে—লণ্ডনের পিকাডিলী সার্কাসের বিখ্যাত অ্যালুমিনিয়ম মূর্তি ; ডাইনে—দিল্লীর চন্দ্ররাজের লৌহস্তম্ভ

খ। অ্যালুমিনিয়মের **বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা** অতি উৎকৃষ্ট, এমন কি **ওজনের অনুপাতে তাম্রের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ।** তাই ইস্পাতের তারের সাহায্যে টান রাখিয়া **অ্যালুমিনিয়মের কেব্‌ল** (cable অর্থাৎ বিদ্যুৎ-পরিবাহী তারের গুচ্ছ) আজকাল দূরপথে বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

গ। অ্যালুমিনিয়ম অতি উত্তম **আলোক-প্রতিফলক** (reflector)। সে কারণে মোটর গাড়ীর আলো ও নানা প্রকার আরশির **প্রতিফলক** হিসাবে **রৌপ্যের স্থলে** ইহার প্রচুর ব্যবহার হইতেছে।

ঘ। অ্যালুমিনিয়মকে **পিটাইয়া সূক্ষ্ম পাতে পরিণত করা যায়,** এজন্য বর্তমানে চকোলেট, সিগারেট প্রভৃতির **মোড়ক প্রস্তুত করিতে**

টিনের পরিবর্তে (২৬০ পৃষ্ঠা) অ্যালুমিনিয়ম বহুল পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে, কারণ ইহার মূল্য টিনের অপেক্ষা অনেক কম।

৬। অ্যালুমিনিয়ম বেশ **হালকা ধাতু**। যেখানে লৌহের ঘনত্ব ৭·৮, সেখানে অ্যালুমিনিয়মের ঘনত্ব মাত্র ২·৭। তাই **বাসন, আসবাব-পত্র** প্রভৃতি দ্রব্য নির্মাণে—যেখানে নাড়াচাড়া করার সুবিধার প্রয়োজন—সেই সব ক্ষেত্রে ইহার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়।

অ্যালুমিনিয়মের একমাত্র অসুবিধা হইল ইহা কিছু নরম এবং **টান রাখিবার ক্ষমতা** (tensile strength) **কম**। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে বিভিন্ন ধাতুর সহিত মিশ্রিত করিলে ইহার দৃঢ়তা বহুগুণে বাড়িয়া যায়। এইভাবে **ড্যুর‍্যালুমিনিয়ম** (duraluminium অর্থাৎ durable বা **মজবুত** অ্যালুমিনিয়ম) বলিয়া যে সংকর ধাতুটি আজ **আকাশযান নির্মাণে যুগান্তর আনিয়াছে** তাহার উপাদান হইল—৪% তাম্র, ০·৫% ম্যাগনেশিয়ম, ০·৫% ম্যাঙ্গানীজ ও অবশিষ্ট ৯৫ অংশ অ্যালুমিনিয়ম। ইহার দৃঢ়তা ইস্পাতের অপেক্ষাও অধিক, কিন্তু ঘনত্ব উহার মাত্র ১/৩ ভাগ। এরোপ্লেনের দেহের অধিকাংশ আজকাল ড্যুর‍্যালুমিনিয়মে প্রস্তুত হইতেছে।

ইহা ব্যতীত শিল্পজগতে, বিশেষ করিয়া বয়ন-শিল্পে ও দুগ্ধজাত-দ্রব্য উৎপাদন শিল্পে নানা প্রকার যন্ত্রপাতি নির্মাণে, মোটরগাড়ীর ইঞ্জিনের নানা অংশ গঠনে প্রভৃতি নানা ক্ষেত্রে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহার ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিয়াছে।

চিত্র নং২৩৯ : তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় অ্যালুমিনিয়ম নিষ্কাশন ; A—কার্বন অ্যানোড, BC—আধার D, E—কঠিন বক্সাইট, F—গলিত বক্সাইট, G—গলিত অ্যালুমিনিয়ম
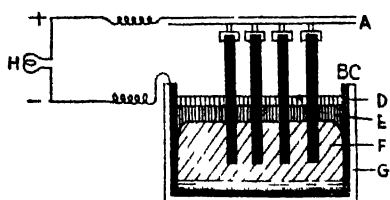
নিষ্কাশন—বিভিন্ন যৌগ পদার্থের, বিশেষ করিয়া লবণের, **দ্রবণে** বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত করিয়া উহাকে বিশ্লিষ্ট করা যায় দেখিয়াছি (২১১ পৃষ্ঠা)। কিন্তু পরে দেখা গেল ঐ সব পদার্থকে **উত্তাপে গলাইয়া** উহার মধ্যে বিদ্যুৎচালনা করিলেও উহারা বিশ্লিষ্ট হইয়া পড়ে। এইভাবে

মাত্র ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে **বক্সাইট** (bauxite) বলিয়া অ্যালুমিনিয়মের একটি বিখ্যাত অক্সাইড ধাতু-প্রস্তরকে **গলিত অবস্থায় তড়িদ্‌বিশ্লেষণ করিয়া** ধাতব অ্যালুমিনিয়ম প্রথম উৎপন্ন করা হয়। পৃথিবীর প্রয়োজনীয় অ্যালুমিনিয়মের সমগ্র পরিমাণ আজ এই একমাত্র পদ্ধতিতে উৎপাদিত হইতেছে।

থারমিট প্রক্রিয়া (**Thermit process**)—স্বাভাবিক অবস্থায় অ্যালুমিনিয়মের অক্সিজেনের প্রতি রাসায়নিক আসক্তি খুবই কম (যেমন সহজে মরিচা পড়ে না), কিন্তু অধিক উত্তাপে অ্যালুমিনিয়ম সহজেই **জারিত** অর্থাৎ অক্সিজেন যুক্ত (oxidised) হয়। ইহার এই ধর্মের সুযোগ লইয়া একটি অতি সুবিধাজনক প্রক্রিয়ায় জাহাজ, রেল-লাইন প্রভৃতির ভগ্ন অংশাদি, **উহাদের স্ব স্ব স্থান হইতে না নড়াইয়া** মেরামত করা হইয়া থাকে। ইহার প্রণালী অতি সহজ। একটি মাটির পাত্রে (মাটির কেন?) লৌহ-অক্সাইড (বা দরকার মত অন্য ধাতুর অক্সাইড) লইয়া উহার সহিত অ্যালুমিনিয়ম-চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ঐ মিশ্রণে ম্যাগনেশিয়ম তার (বাজী পোড়ানোতে যাহা "ইলেকট্রিক তার" বলিয়া পরিচিত) জ্বালাইয়া অগ্নিসংযোগ করিলে **প্রচণ্ড তাপ-নির্গম সহ** অ্যালুমিনিয়ম লৌহ-অক্সাইডের অক্সিজেনের সহিত **যুক্ত** হয় এবং গলিত ধাতব লৌহ (বা অন্য ধাতু) উৎপন্ন হইয়া ভগ্নস্থানে ছাঁচের মধ্যে পড়ে এবং এইভাবে উহাকে ইচ্ছামত মেরামত করা যায়।
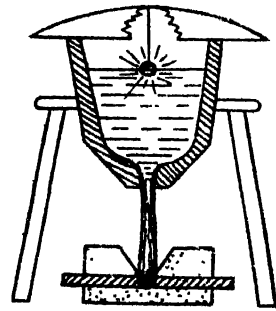
চিত্র নং ২৪০: থারমিট প্রক্রিয়া; গলিত লোহা রেলের ভগ্ন স্থানে (ছাঁচের মধ্যে) ঢালিয়া উহাকে মেরামত করা হইতেছে

অ্যালুমিনিয়ম-অক্সাইড—চুনি (ruby), **নীলা** (বা নীলকান্ত—sapphire) প্রভৃতি নামের যে সব মূল্যবান 'প্রস্তর' আমরা আংটিতে বা অন্য গহনায় ব্যবহার করি তাহারা আসলে অ্যালুমিনিয়ম-অক্সাইড—গলিত অবস্থায় সামান্য পরিমাণ **বিভিন্ন ধাতব-অক্সাইড মিশাইয়া বিভিন্ন**

বর্ণ করা হইয়াছে। এইগুলি অবশ্য কৃত্রিম প্রস্তর, কিন্তু পাকা জহুরী ভিন্ন ইহাদের সহিত আসল প্রস্তরগুলির প্রভেদ সাধারণতঃ কেহ ধরিতে পারে না। রিষ্ট্ ওয়াচের (wrist watch) গুণ বর্ণনায় যে '10-Jewel-ওয়ালা' "15-Jewel-ওয়ালা' প্রভৃতি বিজ্ঞাপন দেখা যায়, সেই 'জুয়েল'গুলি আর কিছুই নহে, এই কৃত্রিম চুনি প্রস্তর (ঘোর লালবর্ণের); অত্যন্ত কঠিন বলিয়া ঘর্ষণে সহজে ক্ষয় হয় না, তাই ঘড়ির চাকার বেয়ারিংএ (৬ পৃষ্ঠা) ব্যবহৃত হইলে চাকাগুলি সহজে আলগা হয় না, সুতরাং নির্ভুল হিসাব-মত ঘুরিতে থাকে বলিয়া ঘড়ির সময় ঠিক থাকে। **এমারি** (emery) কাগজ বলিয়া যে কালবর্ণের লোহা পালিশ করিবার কাগজ (সিরিশ কাগজের ন্যায়) লোহার জিনিসের দোকানে পাওয়া যায় উহাও একপ্রকার **অবিশুদ্ধ অ্যালুমিনিয়ম-অক্সাইড**-চূর্ণ মাখানো কাগজ।

দস্তা (Zinc)

দস্তাও প্রকৃতিতে কখনও মৌলাবস্থায় পাওয়া যায় না। ইহার ধাতু-প্রস্তরগুলির মধ্যে **জিঙ্ক ব্লেণ্ড** (zinc blende) প্রসিদ্ধ। ইহা দস্তা ও গন্ধকের যৌগ অর্থাৎ জিঙ্ক-সালফাইড। জিঙ্ক ব্লেণ্ড হইতেই ধাতব দস্তা উৎপাদিত হয়।

ধাতু নিষ্কাশনের উদ্দেশ্যে জিঙ্ক ব্লেণ্ডকে প্রথমে প্রয়োজনীয় উত্তাপে জারিত অর্থাৎ অক্সিজেন-যুক্ত করা হয়। পরে বিশেষ আকৃতির চুল্লীতে গুঁড়া কয়লার সহিত জিঙ্ক-অক্সাইডকে মিশ্রিত করিয়া প্রচণ্ড উত্তাপ প্রয়োগ করা হয়। তখন জিঙ্ক-অক্সাইডের অক্সিজেন কয়লার কার্বনের সহিত যুক্ত হইয়া কার্বন-ডাই-অক্সাইড আকারে বাহির হইয়া যায় এবং ধাতব দস্তা **উত্তাপে বাষ্পীভূত হইয়া** চুল্লীর সহিত সংযুক্ত **শীতকের** (condenser) গায়ে গুঁড়া গুঁড়া আকারে জমা হয়।

দস্তা ঈষৎ নীলাভ সাদা ধাতু। সুপরিচিত ধাতুগুলির মধ্যে ইহার স্ফুটনাঙ্ক (৯০ পৃষ্ঠা) সর্বাপেক্ষা কম, মাত্র ৯০৫° সেঃ। ইহা পিতল প্রস্তুত করিতে ও গ্যালভানাইজ-করা লোহার পাত (galvanised sheet) প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়—পূর্বেই বলা হইয়াছে। তা ছাড়া লেক্লান্সে

সেল ও শুষ্ক সেল (dry cell) নির্মাণে ইহার ব্যবহারেরও উল্লেখ করা হইয়াছে (২২৫ পৃষ্ঠা)। ৪% অ্যালুমিনিয়মের সহিত মিশ্রণে দস্তার যে সংকর ধাতু প্রস্তুত হয় উহা নানাপ্রকার খেলনা, দরজার হাতল, মোটর গাড়ীর রেডিয়েটর (radiator—ইঞ্জিনে জল রাখার পাত্র) ও ইঞ্জিনের অন্যান্য কিছুকিছু অংশ নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।
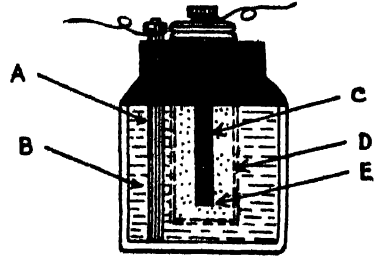
চিত্র নং ২৪১ : লেক্লান্সে সেল (২২৫ পৃষ্ঠা দেখ) ; A—দস্তার দণ্ড ; B—অ্যামোনিয়ম ক্লোরাইডের দ্রবণ ; C—কার্বন দণ্ড ; D—বহুরন্ধ্র পাত্র; E—ম্যাঙ্গানীজ-ডাই-অক্সাইড ইত্যাদি

জিঙ্ক হোয়াইট (zinc white) নামে দস্তার অক্সাইড ক্ষতস্থানে ব্যবহারের পাউডার ও মলম হিসাবে এবং জিনিসপত্র সাদা রং করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

দস্তার অন্যান্য সংকর ধাতুর আলোচনা অন্য ধাতুগুলির প্রসঙ্গে পূর্বেই করা হইয়াছে।

অনুশীলনী

১। কল্পনা কর লৌহ ও অ্যালুমিনিয়মের মধ্যে কে বড় এই লইয়া তর্ক বাধিয়াছে ; উহারা প্রত্যেকে নিজেকে শ্রেষ্ঠ ও অপরকে হীন প্রমাণ করিবার জন্য যে যে যুক্তির আশ্রয় লইবে তাহার উপর ভিত্তি করিয়া একটি কথোপকথন রচনা কর।

২। উপযুক্ত ধাতুর নামের সাহায্যে নিম্নলিখিত বিবৃতিগুলির শূন্যস্থান শুদ্ধভাবে পূরণ কর :—

ক। —প্রকৃতিতে অবস্থিতির (occurrence) পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

খ। —পৃথিবীতে উৎপাদনের পরিমাণ সর্বাপেক্ষা অধিক।

গ। —প্রকৃতিতে মৌল অবস্থায় সাধারণতঃ পাওয়া যায় না।

ঘ। --অন্য ধাতুর সহিত মিশ্রিত হইয়া বহুবিধ সংকর ধাতু প্রস্তুতে ব্যবহৃত হয়।

ঙ। —বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ওজনের অনুপাতে সর্বাপেক্ষা বেশী।

চ। —ধাতুগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা হালকা।

ছ। ধাতুগুলির মধ্যে—স্ফুটনাঙ্ক সর্বাপেক্ষা কম।

৩। নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া বল :—

(১) গ্যালভ্যানাইজড্ লৌহ, (২) বিস্কুটের টিন, (৩) চকোলেটের মোড়ক, (৪) সাধারণ বাসন, (৪) ভেণ্টিলেটার, (৬) উৎকৃষ্ট শ্রেণীর রাঁধিবার কড়াই, (৭) রেল লাইন, (৮) কৃত্রিম চুনি, (৯) মোটর ইঞ্জিনের রেডিয়েটার, (১০) এয়োপ্লেনের দেহ।

৪। প্রায় সকল ধাতুই মিশ্রিত আকারে, সংকর ধাতু রূপে জিনিসপত্র প্রস্তুত করিতে ব্যবহৃত হয়—ইহার কারণ কি বল। অন্য ধাতু বা অধাতুর মিশ্রণে লৌহ ও অ্যালুমিনিয়মের গুণের কিরূপ পার্থক্য হয় কয়েকটি দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দাও।

৫। থারমিট (Thermit) প্রক্রিয়াটি বর্ণনা কর। ইহার বিশেষ উপযোগিতা কি? ইহার মধ্যে অ্যালুমিনিয়মের কি একটি বিশেষ গুণের পরিচয় পাওয়া যায়?

৬। ধাতুগুলিকে উহাদের (ক) গন্ধক, (খ) অক্সিজেন, (গ) কার্বনেট যৌগ হইতে নিষ্কাশন করিবার সাধারণ নীতি বর্ণনা কর। লৌহের নিষ্কাশন ও দস্তার নিষ্কাশন পদ্ধতিতে উৎপন্ন ধাতুকে সংগ্রহ করিবার জন্য যথাক্রমে বালির পাত্র ও শীতক (condenser) ব্যবহার করা হয় কেন?

১। নিম্নলিখিত তথ্যগুলির বৈজ্ঞানিক কারণ ব্যাখ্যা কর :—

ক। অ্যালুমিনিয়মের তার ইস্পাতের রজ্জুর সাহায্যে টান করিয়া বিদ্যুৎ-পরিবাহী কেব্‌ল (cable) হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

খ। রৌপ্যের পরিবর্তে অ্যালুমিনিয়ম আরশির প্রতিফলক হিসাবে ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হইতেছে।

গ। অ্যালুমিনিয়মে সহজে মরিচা ধরে না।

ঘ। নিত্যদিনের প্রয়োজনে অ্যালুমিনিয়মের ব্যবহারের সহিত আমাদের পরিচয় বেশ অল্পকালের।

ঙ। বিজলি বাতির বাল্বের প্রবেশক-তার (lead-in) নিকেল-ইস্পাতে প্রস্তুত হয়।

চ। লোহার পাতের উপর সাধারণতঃ দস্তা বা টিনের প্রলেপ দিয়া উহাকে বিভিন্ন প্রয়োজনে লাগানো হয়।

ছ। কৃত্রিম চুনি পাথর ঘড়ির 'জুয়েল' হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

জ। তাম্রকে তড়িদ্‌বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বিশুদ্ধ করিয়া বিদ্যুৎ পরিবহনের কাজে ব্যবহার করা হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

জীববিদ্যা

কয়েকটি নিম্ন শ্রেণীর জীবের সাধারণ পরিচয়

জীবজগতের বৈচিত্র্য

মঙ্গল গ্রহ হইতে হঠাৎ যদি কোনও মানুষ-জাতীয় জীব এই পৃথিবীতে আসিয়া উপস্থিত হয় তাহা হইলে প্রথমেই সে এখানে জীবজগতের বৈচিত্র্য দেখিয়া যে বিস্ময়-বিমূঢ় হইয়া যাইবে কোনও সন্দেহ নাই। যেমন প্রাণি-জগতের মধ্যে, তেমনি উদ্ভিদজগতের মধ্যে এই বিচিত্রতা। অনেক সময় আবার **কোনটিকে প্রাণী বলিব, কোনটিকেই বা উদ্ভিদ বলিব—ইহাই মহা সমস্যার বিষয় হইয়া পড়ে**—নিম্নতম স্তরে উভয় শ্রেণীর জীবের মধ্যে এতই আশ্চর্য মিল। বিদ্যালযে অনেক ছাত্রছাত্রী আসে—তাহাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করিতে হইলে আগে শ্রেণীবিভাগ করিয়া, নাম অনুযায়ী রেজিস্টারে সাজাইয়া পরে সব কিছু করিতে হয়। তেমনি পৃথিবীর এই **বিচিত্র জীবরাজিরও সুষ্ঠু আলোচনা করিতে হইলে তাহাদের এক রকম রোল কলের** (roll call) ব্যবস্থা থাকা প্রয়োজন, নচেৎ এই বৈচিত্র্যের মধ্যে পথ হারাইয়া দিশাহারা হইতে হইবে। তাই জীববিদ্যার পণ্ডিতেরা পৃথিবীর জীবরাজিকে প্রাণী ও উদ্ভিদ—এই দুই বৃহৎ বিভাগে ভাগ করিয়া পরে প্রত্যেক বিভাগের একটি সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন।

জীবের শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা

ইহাতে জীবের দৈহিক গঠনের কতকগুলি সাদৃশ্য ধরিয়া উহাদের ধাপে ধাপে ক্ষুদ্র হইতে বৃহৎ কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করিয়া সাজানো হইয়াছে। এই ব্যবস্থার সুবিধা হইল—একটি শ্রেণীভুক্ত কোনও জীবের আলোচনা করিলে সেই শ্রেণীভুক্ত সকল জীবগুলির একটি মোটামুটি পরিচয় লাভ সম্ভব হয়। দৃষ্টান্তক্রমে **বিড়ালের** আলোচনা করিলে বিড়াল শ্রেণীর সকল প্রকার জীব, যেমন **বাঘ, পুমা, জাগুয়ার** প্রভৃতি সকলের একটা সাধারণ

পরিচয় লাভ হইয়া যায়। এখানে আমরা প্রাণি-ও উদ্ভিদ-জগতের **অন্তর্ভুক্ত বিশেষ বিশেষ কয়েকটি জীবের** পরিচয় লাভের চেষ্টা করিব। নবম শ্রেণীতে তোমরা বেঙ ও মাছ—এই দুইটি সুপরিচিত জীবের বৈজ্ঞানিক পরিচয় লাভ করিয়াছ। ইহারা উভয়েই মেরুদণ্ডী গোষ্ঠীভুক্ত উচ্চ শ্রেণীর প্রাণী এবং সেজন্য ইহাদের মধ্যে কতকগুলি সাধারণ দৈহিক লক্ষণ বর্তমান—নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ।

জীববিদ্যায় নিম্নশ্রেণীর জীবের গুরুত্ব

কিন্তু এখানে আমরা যাহাদের কথা বলিব তাহারা সকলেই অতি নিম্ন-শ্রেণীর জীব এবং আকারেও অতীব ক্ষুদ্র, কিন্তু তাই বলিয়া জীববিদ্যার দিক দিয়া মোটেই নগণ্য নহে, উপরন্তু বিশেষ মূল্যবান। কারণ ইহাদের সংক্ষিপ্ত, সরল জীবনযাত্রার প্রক্রিয়াদি পর্যবেক্ষণ করিয়া আমরা জীবন ও জৈবিক প্রক্রিয়ার মূল স্বরূপ সম্বন্ধে একটা ধারণা করিতে পারি, যাহা বৃহৎ জীবের জটিল জীবনযাত্রা প্রণালীর মধ্যে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইয়া পড়ে। এই জন্যই জীববিদ্যার আলোচনায় এইসব সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, সরল দেহ-বিশিষ্ট জীবের এত গুরুত্ব। প্রথমেই আমরা **প্রাণী** বিভাগের **অ্যামিবা** (amoeba) বলিয়া একটি **অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু অতি গুরুত্বপূর্ণ** জীবের আলোচনা করিব। পরের অধ্যায়ে **অভিব্যক্তির** (evolution) আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা জীবের শ্রেণীবিভাগ, উচ্চশ্রেণী, নিম্নশ্রেণীর জীব বলিতে কি বুঝায় ইত্যাদি বিষয়গুলির বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য আরও ভাল করিয়া বুঝিতে পারিব।

অ্যামিবা (amoeba)

জীবদেহের একক—কোষ

পৃথিবীর সমস্ত বস্তু যেমন অণুর সমাবেশে গঠিত, **জীবের দেহ** তেমনি **কোষের পর কোষ** একত্র হইয়া গঠিত হইয়াছে। দেহকে একটি বাড়ীর সহিত তুলনা করিলে আমরা কোষগুলিকে ইষ্টকের সহিত তুলনা করিতে পারি, অর্থাৎ ইহারাই হইল দেহের ক্ষুদ্রতম, সম্পূর্ণ জীবিত অংশ বা **একক** **(unit)**। একখণ্ড মাংসপেশীর একটি ক্ষুদ্র অংশকে অণুবীক্ষণে পরীক্ষা

করিলে দেখা যাইবে যে উহা অসংখ্য পেশীকোষের সমষ্টি। তেমনি একটি উদ্ভিদের দেহের যে কোনও অংশ অণুবীক্ষণে পরীক্ষা করিলেও ঐরূপ অগণিত কোষের সমাবেশ দৃষ্ট হইবে। একটি উচ্চশ্রেণীর জীবের সমগ্র দেহ তাহা হইলে কিরূপ অসংখ্য কোষের বিরাট সমাবেশে গঠিত কল্পনা করিতে পারি। জীবদেহের এই গঠনভঙ্গী হইতে সহজেই বুঝা যায় যে **এই সকল কোষের মিলিত জীবনই হইল সমগ্র জীবটির জীবন।** তাহার পাশে এই অ্যামিবা প্রাণীটির কথা ভাবিয়া দেখ। মাত্র **একটি কোষে গঠিত উহার দেহ** এবং সেই একটি কোষ সম্বল করিয়াই ইহা জীবনের বিচিত্র কারবার চালাইতেছে: সেই একটি কোষেই ইহার চলন-ব্যবস্থা, ইহার আহার-গ্রহণ, পরিপাক ক্রিয়া, শ্বসন, অনুভব, বংশবৃদ্ধি—সব কিছু, যাহার জন্য উচ্চ শ্রেণীর জীবে কত প্রকারের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও যন্ত্রবাজির ব্যবস্থা হইয়াছে। ভাবিলে যেমন হাসি পায়, সঙ্গে সঙ্গে পরম বিস্ময় জাগে।

তাহা হইলেও জানিয়া রাখ যে ছোট বড় **প্রত্যেক জীবেরই জন্ম সর্বপ্রথম এক-কোষ আকারে** এবং ক্রমান্বয়ে বিভক্ত হইয়া ইহাদের এক-কোষ দেহ পরিণামে ইহাদের বহু-কোষ-সম্পন্ন বিশেষ বিশেষ আকার পায়। আজ যে পূর্ণাঙ্গ শিশুটি পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হইল ভাবিয়া দেখিতে হইবে প্রায় দশমাস পূর্বে একটি অতি সূক্ষ্ম এক কোষ দেহ লইয়া মাতৃজঠরে উহার প্রকৃত জন্ম হইয়াছিল।

অ্যামিবার সরল গঠন ও জীবনযাত্রা

প্রাণীর শ্রেণীবিভাগে অ্যামিবা যে বৃহত্তম বিভাগটির মধ্যে পড়ে তাহার নাম—**প্রোটোজোয়া** (protozoa)। proto অর্থ প্রথম, এবং zoon অর্থ প্রাণী, অর্থাৎ **প্রথম প্রাণী,** কারণ পরে অভিব্যক্তির অধ্যায়ে দেখিব যে এই শ্রেণীর জীবেরাই সর্বপ্রথম পৃথিবীতে আবির্ভূত হইয়াছিল। এই বিভাগের অন্তর্গত প্রাণীরা সকলেই একোষ-দেহী, সুতরাং অতীব ক্ষুদ্রাকৃতি, প্রায়ই অণুবীক্ষণের সাহায্য ব্যতীত দৃষ্টিগোচর হয় না। অ্যামিবাকে সাধারণতঃ জলের তলায় পুকুরের পাঁকে, কিংবা কোনও জলজ উদ্ভিদের নিমজ্জিত পাতায় বাস করিতে দেখা যায়। খালি চোখে

বেশ কিছুক্ষণ লক্ষ্য করিলে সূক্ষ্ম কণিকার আকারে ইহাকে দেখা যাইতে পারে। ইহারা দৈর্ঘ্যে ১/৫০ ইঞ্চি পর্যন্ত হয়। অ্যামিবার সহিত মানুষের একটি অশুভ সম্পর্ক রহিয়াছে কারণ এক জাতীয় আমাশয় আমাদের দেহে এই প্রাণীটির আক্রমণে ঘটিয়া থাকে। উহাকে ডাক্তারী শাস্ত্রে **amoebic dysentery** বলে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এই রোগের বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে।

পরিবর্তনশীলতা—অ্যামিবা কথাটির মূল অর্থ হইল **পরিবর্তন।** সত্যিই এরূপ পরিবর্তনশীল জীব বোধ হয় জগতে বিরল। অণুবীক্ষণে লক্ষ্য করিলে অ্যামিবার দেহটিকে মুহূর্তে মুহূর্তে পরিবর্তিত হইতে দেখা যাইবে। আশ্চর্য নহে, কারণ জেলীর ন্যায় থলথলে একটি পদার্থের এতটুকু কণিকাকে যেন একটি অতি সূক্ষ্ম প্লাষ্টিকের ব্যাগে ধরিয়া রাখা হইয়াছে—ইহাই হইল অ্যামিবার সরল দেহের পরিচয় এরূপ দেহ যে পদ্মপাতায় এক বিন্দু জলের ন্যায় ক্রমাগত রূপ পরিবর্তন করিবে—সহজেই কল্পনা করা যায়। এই থলথলে পদার্থটিই হইল **প্রোটোপ্লাজম** (protoplasm)—**জীবদেহের মূল উপাদান,** অর্থাৎ **অ্যামিবা যেন জীবনের একটুকু কণিকা।** পর পৃষ্ঠার ছবিতে ইহার দেহের একটি মোটামুটি পরিচয় পাইবে।

প্রোটোপ্লাজমের কণিকাটি এলোমেলো ভাবে আঙ্গুলের ন্যায় শাখা-প্রশাখা ছড়াইয়া রহিয়াছে এবং এইগুলি ক্রমাগত নানাভাবে প্রসারিত, সংকুচিত, পরিবর্তিত হইতেছে। দেহবস্তুর প্রোটোপ্লাজম চারিধারে কিনারার কাছে প্রায় স্বচ্ছ। এই অংশের নাম **এক্টোপ্লাজম** (ectoplasm)। ভিতরের অংশের বর্ণ ধূসর এবং ইহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণিকায় পূর্ণ। ইহার নাম **এণ্ডোপ্লাজম** (endoplasm)। আঙ্গুলের ন্যায় প্রসারিত অঙ্গগুলিকে **ক্ষণপাদ** (pseudopodia) বলে, কারণ উহারাই অ্যামিবার একপ্রকার ক্ষণস্থায়ী পায়ের কাজ করে।

নিউক্লিয়স—এণ্ডোপ্লাজমের সবটাই একপ্রকার পদার্থ নহে কারণ মধ্যস্থলে কিছু অংশ গাঢ়বর্ণের—উহাকে **নিউক্লিয়স** (nucleus) বলে। কয়েক প্রকার রং আছে যাহা ব্যবহার করিলে এই অংশটি বেশ স্পষ্ট দেখা যায় তাহার কারণ এই অংশ রংটিকে যেমন শুষিয়া লইতে পারে

এণ্ডোপ্লাজমের অন্য অংশ তাহা পারে না। ইহা হইতেই বোঝা যায় নিউক্লিয়সটি কোষের মধ্যে একটি স্বতন্ত্র পদার্থ। তা ছাড়া ইহার চারিদিকে একটি অতি সূক্ষ্ম আবরণ ইহাকে কোষবস্তু হইতে পৃথক করিয়া রাখিয়াছে।

চিত্র নং ২৪২ : A—অ্যামিবা—সাধারণ অবস্থা; B—অ্যামিবার বংশ বিস্তার—পর পর চারটি অবস্থা লক্ষ্য কর, C—অ্যামিবার চলন

এই নিউক্লিয়সই হইল কোষের সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় অংশ। ইহাই কোষটির প্রাণের কেন্দ্র এবং কোষের সমস্ত কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। সুতরাং কোষের কোনও অংশকে নিউক্লিয়স হইতে বিচ্ছিন্ন করিলে অংশটি কিছুক্ষণ মাত্র কোনও রকমে পঙ্গু অবস্থায় জীবিত থাকিতে পারে। সকল কোষেই একটি করিয়া নিউক্লিয়স থাকিবে নতুবা তাহার জীবন অসম্ভব।
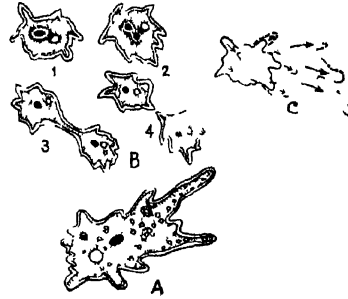
অ্যামিবার চলন (movement)—গতি জীবনের প্রধান লক্ষণ, তাই অ্যামিবার কণিকামাত্র দেহে সেই গতিই প্রকট হইয়া দেখা দেয়: এক্টোপ্লাজমের কণিকাগুলি তাহাদের তরল মাধ্যমে ক্রমাগত ছোটাছুটি করিতেছে, ক্ষণপাদগুলি অবিরাম প্রসারিত ও সংকুচিত হইয়া যেন কিসের সন্ধান করিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে উহাদের সাহায্যে এক অপূর্ব ভঙ্গীতে গড়াইয়া গড়াইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। অ্যামিবার এই চলন-ভঙ্গীটি লক্ষ্য করিবার বিষয়: প্রথমে একদিকের ক্ষণপাদগুলির উপরের স্তর অর্থাৎ এক্টোপ্লাজম লম্বা হইয়া সম্মুখে বিস্তৃত হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে বিপরীতদিকের পদগুলি গুটাইয়া জড় হইয়া দেহবস্তুর উপর চাপ দেয়, ফলে উহা গড়াইয়া সম্মুখদিকের বিস্তৃত পদগুলির ভিতরে চলিয়া আসে, অর্থাৎ সমগ্র দেহটি আগাইয়া যায়।

অ্যামিবার শ্বসন (respiration)

পূর্বেই বলা হইয়াছে অ্যামিবার দেহে বিশেষ বিশেষ কার্যের উদ্দেশ্যে

বিশেষ বিশেষ যন্ত্রের উদ্ভব হয় নাই, সুতরাং স্বতন্ত্র শ্বাসযন্ত্রও নাই—জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন এক্টোপ্লাজম দিয়া শোষণ করিয়া সমগ্র দেহবস্তুতে ছড়াইয়া দেয় এবং শ্বাসক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন কার্বন-ডাই-অক্সাইড একইভাবে ভিতর-হইতে বাহিরের দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পরে আবেষ্টনীর জলে নির্গত হইয়া যায়।

অ্যামিবার রেচন (excretion)

লক্ষ্য করিলে অ্যামিবার দেহের মধ্যে পরিষ্কার তরলে ভরা একটি গোলাকার বুদ্‌বুদ দেখা যাইবে। এইটি মধ্যে মধ্যে বড় হইয়া দেহের কিনারার দিকে সরিয়া ফাটিয়া যায় এবং উহাদের মধ্যস্থ তরল পদার্থ আবেষ্টনীর জলে বাহির হইয়া যায়। আবার ঐ স্থানে ধীরে ধীরে আর একটি বুদ্‌বুদ গড়িয়া উঠে। এইটি হইল অ্যামিবার দেহের দূষিত পদার্থ নিষ্কাশনের সংক্ষিপ্ত ব্যবস্থা। ইউরিয়া (urea), কার্বন-ডাই-অক্সাইড প্রভৃতি দূষিত পদার্থগুলি দেহবস্তু হইতে অতিরিক্ত জল টানিয়া লইয়া ও উহাতে মিশ্রিত হইয়া এই বুদ্‌বুদগুলি সৃষ্টি করে এবং উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় দেহ হইতে নিষ্কাশিত হইয়া যায়।

অ্যামিবার ভোজন

অ্যামিবার খাদ্যগ্রহণ ও আত্মীকরণ প্রণালীও একটি বিচিত্র ব্যাপার। এই সূক্ষ্মদেহী জীব অবশ্যই ততোধিক সূক্ষ্ম বস্তু আহার্যরূপে গ্রহণ করিবে সন্দেহ নাই। এরূপ কয়েক প্রকার অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে। ইহাদের মধ্যে **ডায়াটম** (diatom) বলিয়া একপ্রকার শৈবাল-জাতীয় উদ্ভিদ অ্যামিবার প্রিয় খাদ্য। এইগুলি, এবং সাধারণ উদ্ভিদের পচনশীল দেহবস্তু অ্যামিবা ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। খাদ্যবস্তু সম্মুখে আসিলে অ্যামিবা উহার চারিধারে ক্ষণপাদগুলি বিস্তৃত করিয়া উহাকে এক কণিকা জল-সহ দেহের মধ্যে বন্দী করিয়া ফেলে। পরে এই জলের মধ্যে দেহ হইতে নিঃসৃত জারক রস আসিয়া মিশিতে থাকে এবং খাদ্যবস্তু ঐ জারক রসে জীর্ণ হইয়া দেহে শোষিত হয়। খাদ্য-কণিকাপূর্ণ জলকণাটিকে আমরা অ্যামিবার দেহের ক্ষণপাদের ন্যায় **ক্ষণস্থায়ী পাকস্থলী** বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি।

অ্যামিবার বেদন (sensation)

অ্যামিবার **দেহের কোনও জ্ঞানেন্দ্রিয়** (sense organs) **নাই।** তাই সমগ্র দেহ দিয়াই অ্যামিবা সকল প্রকার অনুভূতি গ্রহণ করিয়া থাকে। এক কণিকা জলে অ্যামিবাকে রাখিয়া উহাকে সূক্ষ্ম সূচ দিয়া স্পর্শ কর বা উহার সমুখে একটি বালুকণা খাদ্যবস্তু রূপে স্থাপন কর—দেখিবে সঙ্গে সঙ্গে অ্যামিবা দেহকে সরাইয়া লইতেছে অথবা ক্ষণপাদগুলিকে দেহে গুটাইয়া লইয়া একটি পিণ্ডের আকার ধারণ করিতেছে এবং এইভাবে তোমাকে উহার মনের অস্বস্তি বা অপ্রীতিকর অনুভূতি জ্ঞাপন করিতেছে।

অ্যামিবার জনন (reproduction)

অ্যামিবার জনন-প্রক্রিয়াও এক আশ্চর্য ব্যাপার। খাদ্য গ্রহণ ও আত্মীকরণ করিবার পর অ্যামিবার দেহ বেশ পরিপুষ্ট ও দীর্ঘ হইয়া উঠে। এইবার উহার **এক হইতে দুই** হইবার সময় আসিয়াছে। ইহার পদ্ধতি হইল এইরূপ (২৪২ নং চিত্র—B) : সমগ্র দেহটি ধীরে ধীরে বিস্তৃত হইয়া ডাম্বেলের আকার ধারণ করে এবং সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয়সটিও এই ভাবে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত দ্রুতগতিতে, লম্বা হইয়া ছিঁড়িয়া দুইটি অংশে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এখন দেহের মধ্যভাগের সেতুর ন্যায় অংশ সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর হইয়া বিচ্ছিন্ন হইয়া যায় এবং এক একটি অংশে একটি করিয়া নিউক্লিয়স লইয়া **অ্যামিবার একটি দেহ দুইটি হয় অর্থাৎ দুইটি স্বতন্ত্র প্রাণী সৃষ্টি হয়।** ইহা হইতে সরল জনন-ব্যবস্থা বোধ হয় কল্পনা করা যায় না—শুধু দেহটিকে টানিয়া ছিঁড়িয়া একটি প্রাণীকে দুইটি করা।

এক ভাবে দেখিতে গেলে অ্যামিবার মৃত্যু নাই—কারণ ইহা ক্রমাগতই এক হইতে দুই হইয়া বারে বারে নূতন হইতেছে এবং এইভাবে ইহার জীবনের ধারায় কোনও বিচ্ছেদ ঘটিতে দিতেছে না, যেমন উচ্চতর জীবের জীবনে ঘটে। অবশ্য যদি অপর কোনও ইহার অপেক্ষা বলবান প্রাণী আসিয়া ইহাকে মারিয়া বা খাইয়া ফেলে তাহা হইলে অন্য কথা, কিন্তু **স্বাভাবিকভাবে যে অ্যামিবার মৃত্যু নাই**—ইহা অতি সত্য কথা।

স্পাইরোজিরা (Spirogyra)

উদ্ভিদজগতে শ্রেণীবিভাগ

এইবার আমরা যে তিনটি শ্রেণীর জীবের আলোচনা করিব তাহারা সকলেই উদ্ভিদ শ্রেণীভুক্ত। প্রথমটির নাম হইল **স্পাইরোজিরা**।

প্রাণিজগতে যেমন, উদ্ভিদজগতেও তেমনি অবশ্য শ্রেণীবিভাগ আছে। ইহাদের মধ্যে যে বৃহৎ শ্রেণীটির সহিত আমরা বিশেষ সুপরিচিত তাহা হইল—**সপুষ্পক শ্রেণী**। ইহাদের মধ্যে ছোট বড, নানা জাতীয় বিচিত্র উদ্ভিদ রহিয়াছে। আর একটি বৃহৎ শ্রেণী হইল—**থ্যালোফাইটা** (thallophyta) ; ইহারাই হইল উদ্ভিদজগতে নিম্নতম শ্রেণী। এই শ্রেণীর উদ্ভিদের দেহে শিকড, কাণ্ড, পত্র—এই তিনটি স্বতন্ত্র অংশ নাই, ইহাদের দেহ দেখিতে আগাগোডা সমান। ইহাদের এই সরল, সমাঙ্গ দেহকে **থ্যালস** (thallus) বলে, আর phyton অর্থ উদ্ভিদ ; সেইজন্যই এই শ্রেণীর উদ্ভিদের এই নাম। Thallophyta—এই বৃহৎ শ্রেণীটিকে আবার কয়েকটি ক্ষুদ্রতর ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে : তাহাদের একটি হইল—**শেওলা** (algae—অ্যালজী) ; আর একটি হইল **ছত্রাক**(fungus) এবং তৃতীয় আর একটি সুপরিচিত বিভাগ হইল—**ব্যাক্‌টিরিয়া** (bacteria) ; ব্যাক্‌টিরিয়ার কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে (১১৯ পৃষ্ঠা) এবং শেষ অধ্যায়ে রোগের কারণ সম্পর্কে আবার বলা হইবে। আমাদের বর্তমান আলোচ্য উদ্ভিদটি অর্থাৎ স্পাইরোজিরা, শেওলার শ্রেণীতে পড়ে। আর **ঈস্ট** (yeast)—যাহার আলোচনা আমরা ইহার পরেই করিব—তাহা ছত্রাকের শ্রেণীতে পড়ে। **ফার্ণ** হইল পৃথক আর একটি বৃহৎ শ্রেণী, সপুষ্পক ও থ্যালোফাইটার ন্যায়। ইহার আলোচনা আমরা ঈস্টের পরেই করিব।

স্পাইরোজিরার গঠন

স্পাইরোজিরাকে সাধারণতঃ পুকুরের বদ্ধ জলে সবুজ ফেনার আকারে ভাসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এখানে কয়েকটি বিভিন্ন শ্রেণীর স্পাইরোজিরার চিত্র দেওয়া হইল। দেহগুলি যেন এক একটি সোজা, লম্বা সবুজ সুতার টুকরা ; আঙুলে টিপিলে শেওলারই ন্যায় পিচ্ছিল বোধ হয়। ইহাদের এই

দেহ মালার ন্যায় কতকগুলি কোষ পর পর জুড়িয়া গঠিত। এক একটি সূত্র কয়েক ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ হয়। খালি চোখে সামান্য কতকগুলি সবুজ কণিকার গুচ্ছ মনে হইলেও অণুবীক্ষণে ইহার দেহের অপূর্ব কারুকার্য-পূর্ণ সৌন্দর্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। আণুবীক্ষণিক উদ্ভিদরাজির মধ্যে স্পাইরোজিরা সত্যই সুন্দরতমের পর্যায়ে পড়ে। সবুজদেহী উদ্ভিদ বলিয়া স্পাইরোজিরার দেহে ক্লোরোফিল আছে। এই ক্লোরোফিলই একটি বিচিত্রিত ফিতার ন্যায় কোষগুলির দেহবস্তুর মধ্য দিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমরা ঘোরানো লোহার সিঁড়ি দেখিয়াছ, উহাকে ইংরাজীতে স্পাইরাল (spiral) বলে। উদ্ভিদটির স্পাইরোজিরা নাম কেন হইল এখন বোধ হয় বুঝিতে পারিতেছ। অ্যামিবার মধ্যে প্রাণিকোষের গঠন ও জীবন-যাত্রা প্রণালীর একটা সাধারণ পরিচয় তোমরা পাইয়াছ। স্পাইরোজিরার মধ্যেও তেমনি একটি উদ্ভিদকোষের ঐ সব দৃষ্টান্ত পাওয়া যাইবে।

চিত্র নং ২৪৩ : কয়েক শ্রেণীর স্পাইরোজিরা (৭৫ গুণ বড করিয়া দেখানো) ; বিচিত্রিত ক্লোরোফিলের ফিতার পাক লক্ষ্য কর

এখানেও প্রাণিকোষের ন্যায় সেই প্রোটোপ্লাজম, সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয়স, ভ্যাকুয়োল প্রভৃতি রহিয়াছে। অতিরিক্তের মধ্যে—(১) ক্লোরোফিল. (২) কোষের উপরিভাগে সেলুলোজের (cellulose) (১৭৪ পৃষ্ঠা দেখ) প্রাচীর (cell wall)। উদ্ভিদকোষকে ঘিরিয়া এই যে আবরণ, যাহা প্রাণীর কোষে নাই, ইহার জন্যই হয়তো উদ্ভিদের গতিশক্তি অপেক্ষাকৃত সীমাবদ্ধ।

জনন (reproduction)

ক। অযৌন জনন—স্পাইরোজিরার কোষগুলি বিভক্ত হইয়া স্পাইরোজিরা দৈর্ঘ্যের দিকে বাড়িয়া চলে। সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী একটি

কোষ বিভক্ত হইবার সময় নিউক্লিয়সটিও ভাগ হইয়া প্রত্যেক অংশে চলিয়া আসে এবং কোষটির বিভাগের লাইন বরাবর একটি কোষ-প্রাচীর সৃষ্টি হইয়া দুইটি অংশ এক একটি সম্পূর্ণ, স্বতন্ত্র কোষ হইয়া উঠে।

খ। যৌন জনন—উপরোক্ত পদ্ধতি ব্যতীত মধ্যে মধ্যে স্পাইরোজিরা আর একপ্রকার পদ্ধতিতে বংশ-বৃদ্ধি করে। এই পদ্ধতিতে **দুইটি করিয়া কোষ** অংশ গ্রহণ করে। এই উদ্দেশ্যে কোষ দুইটি পাশাপাশি আসিয়া দাঁড়ায় এবং উহাদের দেহপ্রাচীর একস্থানে স্ফীত হইয়া এইস্থানে উভয়ের দেহে সেতুর ন্যায় যোগ স্থাপিত হয়। পরে সংযোগস্থলে কোষপ্রাচীর গলিয়া যায় এবং একটি ক্ষুদ্র নালিকার সৃষ্টি হয়; এই
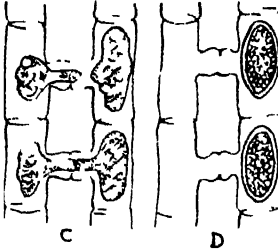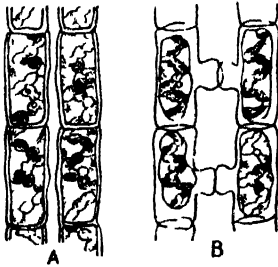
চিত্র নং ২৪৪ : স্পাইরোজিরার যৌন জননের চারিটি পর্যায় দেখানো হইয়াছে (৭৫ গুণ বড়)
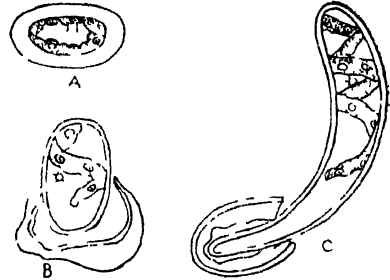
চিত্র নং ২৪৫ : A—জাইগোস্পোর B—জাইগোস্পোর বিদীর্ণ হইয়া অঙ্কুরিত হইতেছে ; C—শিশু স্পাইরোজিরা বাহির হইয়া আসিয়াছে

নালিকার মধ্য দিয়া একটি কোষের সমস্ত দেহবস্তু পাশের কোষের মধ্যে গড়াইয়া প্রবেশ করে এবং এইভাবে একটি মিলিত কোষ উৎপন্ন হয়। এই মিলিত কোষের নাম **জাইগোস্পোর** (zygospore)। জাইগোস্পোর যথাসময়ে বিদীর্ণ হইয়া একটি শিশু স্পাইরোজিরা উৎপন্ন হয় এবং উহা হইতে আর একটি নূতন স্পাইরোজিরা উপনিবেশ সৃষ্টি হয়।

স্পাইরোজিরা প্রকৃতপক্ষে এক **কোষ-দেহী,** না বহু **কোষ-দেহী**

জীব—নিশ্চয় তোমাদের মনে প্রশ্ন জাগিতেছে। দুই-ই সত্য। আমরা ইহার এক একটি সূত্রকে এক কোষ-দেহী কতকগুলি উদ্ভিদের এক একটি পরিবার বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি—এক পরিবারভুক্ত প্রাণীর ন্যায় উহারা **একটি যৌথ জীবন যাপন করে।**

ঈস্ট (Yeast)

ঈস্টের জীবনধারণ-পদ্ধতি ও উপযোগিতা—আমরা সকলেই পাঁউরুটি খাইয়াছি। পাঁউরুটির ভিতরটি কেমন ঝাঁঝরা অর্থাৎ ছোট ছোট ছিদ্রে ভরা হয় নিশ্চয় লক্ষ্য করিয়াছ। গ্রামাঞ্চলে বাস হইলে অনেকে শীতকালে **খেজুর রসও** খাইয়া থাকিবে। এই খেজুর রস গাছ হইতে সংগ্রহ করিয়া বেশীক্ষণ রাখিয়া দিলে **গাঁজিয়া** যায় (ferment) অর্থাৎ উহাতে ফেনা ওঠে এবং খাইতে বিস্বাদ হইয়া যায়। উপরোক্ত উভয় প্রক্রিয়াই এক প্রকার এককোষ-দেহী উদ্ভিদের সাহায্যে সংঘটিত হয়, তাহার খবর আমরা বোধ হয় অনেকেই রাখি না। এই উদ্ভিদই হইল **ঈস্ট**। **বেশী পাকা যে কোনও ফলের রসে** এবং খেজুর বা তালের রসে ইহারা স্বাভাবিকভাবে জন্মে। পাঁউরুটি, বাজার-চলন স্পিরিট ও নানা-প্রকার মদ্য প্রস্তুত করিবার জন্য বিশেষ প্রক্রিয়ায় ঈস্টের চাষও করা হয়—বেশী পরিমাণে উৎপন্ন করিবার উদ্দেশ্যে।

ব্যবসায়-ক্ষেত্রে ঈস্টের এই উপযোগিতা নির্ভর করে উহার বিশেষ জৈবিক প্রক্রিয়ার উপর: ঈস্টের দেহে ক্লোরোফিল নাই, তাই ইহারা নিজেদের খাদ্য প্রস্তুত করিতে পারে না। ইহাদের জীবনধারণের প্রক্রিয়া হইল শর্করা-যুক্ত বিভিন্ন তরল পদার্থ হইতে শর্করা আত্মকরণ করা।

ঈস্টের শ্বসন-পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য—বাতাস-বিহীন শ্বসন

আর ইহাদের **শ্বসনের প্রক্রিয়ায় বেশ অভিনবত্ব আছে।** শ্বসন বলিতে সাধারণতঃ দেহবস্তুর সহিত অক্সিজেনের সংযোগ অর্থাৎ মৃদু দহন বুঝাইলেও মনে রাখিতে হইবে শ্বসনের আসল উদ্দেশ্য হইল শক্তি উৎপাদন। সুতরাং **দহন না হইয়া অন্য কোনও রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় যদি এই শক্তি উৎপাদন করা যায়, তাহা হইলে তাহাও শ্বসনেরই**

কাজ করিবে, যদিও এই প্রক্রিয়ার সহিত অক্সিজেনের কোনও সম্পর্ক থাকিবে না। ঈস্ট তাহাই করে: শর্করাকে ইহারা দেহজাত একপ্রকার **এনজাইমের** (enzyme) সাহায্যে (১৬৪ পৃষ্ঠা) **কোহল** (alcohol) ও **কার্বন-ডাই-অক্সাইড**-এ পরিণত করে। এই প্রক্রিয়ায় যে শক্তি নির্গত হয় তাহাতেই তাহার শ্বসনের কাজ চলে। এই কার্বন-ডাই-অক্সাইড গ্যাসই পাঁউরুটিকে ঝাঁঝরা করিয়াছিল এবং তাল বা খেজুর রসে 'গাঁজন' সৃষ্টি করিয়াছিল। এই প্রক্রিয়াটির বিশেষ নাম হইল **সন্ধান** (fermentation)।

ঈস্টের জনন (reproduction)

ঈস্টের জনন-পদ্ধতিতেও কিছু অভিনবত্ব আছে। অ্যামিবার ন্যায় একটি কোষ ঠিক দুইটি ভাগে বিভক্ত না হইয়া উহার গায়ে প্রথমে একটি ছোট **মুকুল** (bud) সৃষ্টি হয়। ইহা ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে, নিউক্লিয়সটিও দুইটি ভাগে বিভক্ত হইয়া একটি অংশ এই মুকুলে চলিয়া আসে এবং মুকুলটি পৃথক হইয়া একটি স্বতন্ত্র ঈস্ট কোষে পরিণত হয়। এই জনন-পদ্ধতিকে **মুকুলোদ্গম** (budding) বলে। অনেক সময় এই মুকুলোদ্গম এত দ্রুতগতিতে চলে যে প্রথম মুকুলটি মূল কোষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইবার পূর্বেই উহার আবার মুকুলোদ্গম শুরু হয়। এইভাবে একটির পর একটি, মালার আকারে শিশু কোষগুলি মাতৃ-কোষের গায়ে কেমন লাগিয়া থাকে চিত্রে দেখ।
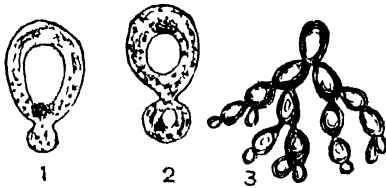
চিত্র নং ২৪৬: ঈস্টের মুকুলোদ্গমের তিনটি অবস্থা; ৩ নং চিত্রে দেখ অবিচ্ছিন্ন মুকুলোদ্গমের ফলে মাতৃকোষ ও শিশুকোষ চেনা দায়

পরিবেশ জীবনধারণের অনুকূল না হইলে (মনে কর কয়েকটি ঈস্ট কোষকে ফলের রসের পরিবর্তে খানিকটা গঙ্গামাটির উপর রাখিয়া দিয়াছ) উহারা দেহের মধ্যে **পুরু দেওয়াল-বিশিষ্ট** চারিটি করিয়া অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র **স্পোর** (spore) (spore এর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইল বীজ) উৎপন্ন করে। তারপর মাতৃকোষটি খাদ্যাভাবে যখন মরিয়া যায় তখন এই স্পোরগুলি

বাহির হইয়া হাওয়ায় ভাসিয়া বেড়ায় এবং উপযুক্ত খাদ্যপূর্ণ পরিবেশে পড়িলে পুনরায় সাধারণ এক একটি ঈস্ট কোষে পরিণত হয়।

স্পোরগুলি দৃঢ় আবরণে সুরক্ষিত থাকে বলিয়া রোদে বৃষ্টিতে ইহাদের কোনও ক্ষতি করিতে পারে না। বন্ধ জানালার ক্ষুদ্র ছিদ্র দিয়া যখন সূর্যালোকের একটি রশ্মিরেখা তোমার ঘরে প্রবেশ করে তখন সেই আলোকে **হাওয়ায় ভাসমান** যে সূক্ষ্ম কণিকাগুলি তোমার চোখে পড়ে তাহাতে কত যে **এইপ্রকার ঈস্ট স্পোর নাচিয়া বেড়াইতেছে** কে জানে?

ফার্ণ (Ferns)

ফার্ণ অপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদ পূর্বেই বলা হইয়াছে। অপুষ্পক হইলেও ইহাদের দেহের গঠন সপুষ্পক শ্রেণীর উদ্ভিদের ন্যায় অর্থাৎ দেহ শিকড়, কাণ্ড ও পাতায় বিভক্ত। সাধারণতঃ আর্দ্র ও ছায়াময় স্থানেই ইহারা জন্মে। **অতি ক্ষুদ্র আকৃতি হইতে ৬০ ফুট পর্যন্ত দীর্ঘ ফার্ণও** দেখা যায়। ফার্ণের জনন-পদ্ধতিতে বিস্ময়কর অনেক কিছু লক্ষ্য করা যায়। এখানে বিশেষ করিয়া তাহারই কথা আলোচনা করা যাইবে।

ফার্ণের গঠন ও জনন-প্রক্রিয়া

একটি পাতার তলার দিক উল্টাইয়া পরীক্ষা করিলে অনেকগুলি উঁচুনীচু জিনিস নজরে পড়িবে। কচি পাতায় এগুলি সবুজ বর্ণের থাকে, কিন্তু পরে ক্রমশঃ ইহারা বাদামী বর্ণ ধারণ করে। এখানে বলিয়া রাখি, ফার্ণের পাতাকে সাধারণ গাছের পাতা হইতে স্বতন্ত্র করিবার জন্য একটি বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে—**ফ্রণ্ড** (frond)। ঐ বাদামী বর্ণের এক একটি ঢিপিকে **সোরস** (sorus) বলে। ইহাদের মধ্যেই ফার্ণের বংশবিস্তারের ব্যবস্থা রহিয়াছে, কারণ আসলে এগুলি এক একটি ব্যাগ বিশেষ—ভিতরে অনেকটা ঈস্টের স্পোরের ন্যায়ই কতকগুলি **স্পোর** থাকে। পরিণত অবস্থায় সোরসের উপরের আবরণ শুকাইয়া স্পোরগুলি বাহির হইয়া মাটিতে পড়িলে **এক আশ্চর্য ব্যাপার লক্ষিত হয়**। কারণ এগুলি অঙ্কুরিত হইলে

পূর্বের পরিচিত ফার্ণ-শিশু না জন্মিয়া এক অদ্ভুত আকৃতির বস্তু বাহির হয়ঃ অনেকটা হরতনের টেক্কার আকৃতি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মোটা পাতার ন্যায় দেখিতে,—নীচের দিকে কতকগুলি শিকড়জাতীয় বস্তুর সাহায্যে মাটির সহিত আবদ্ধ রহিয়াছে। না-স্পোর, না-ফার্ণ এই জীবগুলিকে এক বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে—**প্রোথ্যালস** (prothallus)।
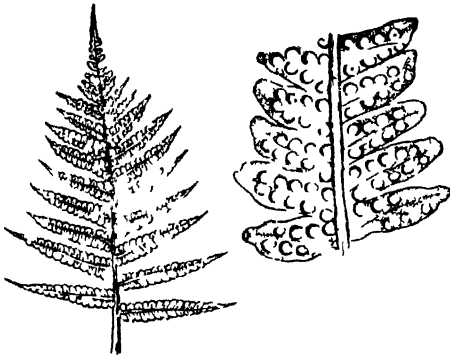
চিত্র নং ২৪৭ : ফার্ণের পাতা (ফ্রণ্ড), ডাইনে—পাতার তলার দিকের সোরসগুলি বড় করিয়া দেখানো

প্রোথ্যালসগুলি পরিণত হইলে আবার উহাদের তলার দিকে কতকগুলি কোষ সৃষ্টি হইতে দেখা যায়। কোষগুলি দুইপ্রকার। অনুবীক্ষণে কতকগুলির আকৃতি বলের ন্যায় ও কতকগুলির ফ্লাস্কের (flask) ন্যায় দেখায়। প্রথমগুলি হইল প্রোথ্যালসের **পুংধানী** (antheridium), দ্বিতীয়গুলি হইল **স্ত্রীধানী** (archegonium)। সাধারণ পরাগ-মিলনের নিয়ম—স্ত্রীধানীর জননকোষের সহিত পুংধানীর জননকোষের মিলন ঘটিলে নূতন বংশের উৎপত্তি হয়। কিন্তু এখানে এই মিলন ঘটাইবার উপায় কি ?
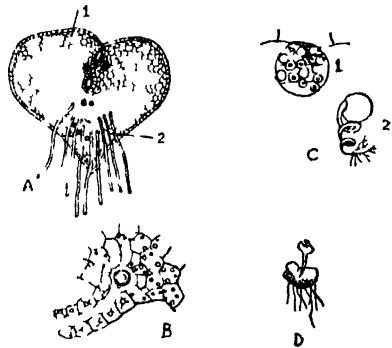
চিত্র নং ২৪৮ : A—প্রোথ্যালস , উপরের বিন্দুগুলি পুংধানী ও নীচেরগুলি (2) স্ত্রীধানী , B—স্ত্রীধানী ও উহার মধ্যে স্ত্রী জননকোষ, C (1)—স্ত্রী জননকোষ, C (2) —পুং জননকোষ ; D—শিশুফার্ণ—(B ও C ৫০ গুণ বড় করিয়া দেখানো)

কীটপতঙ্গের দ্বারা পরাগমিলনে যে সব ব্যবস্থার প্রয়োজন এখানে তাহার কিছুই নাই, সুতরাং অন্য উপায় দেখিতে হইবে। বৃষ্টির অভাব নাই। বৃষ্টির ফলে যখন প্রোথ্যালসের গায়ে জলের একটি সূক্ষ্ম আস্তরণের সৃষ্টি হয় তখন পুং জননকোষ উহার দেহের শুণ্ডের সাহায্যে ঐ জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া স্ত্রীধানীর মধ্যে স্ত্রী জননকোষের সহিত মিলিত হয় ও উহার গর্ভাধান (fertilization) ঘটায়। এইবার গর্ভাধান-জাত বীজ অঙ্কুরিত হইয়া কিছুদিন প্রোথ্যালস-মাতার বক্ষে **পরজীবী** (parasite) হইয়া জীবনধারণ করে। পরে মাটিতে শিকড় বিস্তার করিয়া যখন ক্রমশঃ একটি স্বতন্ত্র শিশু উদ্ভিদে পরিণত হয় তখন দেখা যায় **আমাদের সেই পরিচিত ফার্ণবংশ আবার ফিরিয়া আসিয়াছে।**

ফার্ণের বংশক্রমে এই যে বিচিত্র পর্যায়—**ফার্ণ হইতে প্রোথ্যালস এবং প্রোথ্যালস হইতে ফার্ণ**—ইহাকে **জনুঃক্রম** (alternation of generations) বলে।

অনুশীলনী

১। অ্যামিবা, প্রোটোজোয়া, স্পাইরোজিরা, থ্যালোফাইটা—এই জীবগুলির এই সকল নামকরণের কি তাৎপর্য আছে বুঝাইয়া বল। প্রাণিকোষ ও উদ্ভিদকোষের গঠনে দুইটি প্রধান পার্থক্য ও উহাদের কারণ বা ফল উল্লেখ কর।

২। অ্যামিবা, স্পাইরোজিরা, ঈস্ট ও ফার্ণের জীবনে যে যে বিষয়গুলি তোমার কাছে সবচেয়ে বিস্ময়কর মনে হইয়াছে তাহাদের বর্ণনা কর। জীবজগতে অ্যামিবার বিশেষ গুরুত্ব কি?

৩। উদ্ভিদজগতের শ্রেণীবিভাগের মূল কাঠামোটি বুঝাইয়া দাও। নিউক্লিয়স, ডায়াটম, ক্ষণপাদ, স্পাইরোগোস্পোর, ক্রণ, প্রোথ্যালস—এগুলি কি সংক্ষেপে বল।

পঞ্চম অধ্যায়

অভিব্যক্তিবাদ (Evolution)

অভিব্যক্তির ব্যাপক অর্থ

আমাদের মধ্যে এখনও কেহ কেহ জীবিত থাকিতে পারেন যাঁহার কলিকাতায় প্রথম মোটর গাড়ীর আবির্ভাবের কথা স্মরণ আছে। তখনকার দিনের সেই অদ্ভুত ধরণের (অবশ্য আমাদের চোখে) মোটরগাড়ীর সহিত ১৯৬২ সালের আধুনিকতম পরিকল্পনার (latest design) একটি গাড়ীর তুলনা করিলে নানা বিষয়ে যে শেষোক্ত গাড়ীটির উন্নতি লক্ষিত হইবে সন্দেহ নাই। ঐরূপ রেল-ইঞ্জিন, রেডিও, গ্রামোফোন প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্রগুলির ইতিহাসেই এই ক্রম-উন্নতির সুস্পষ্ট নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল ক্ষেত্রে আমরা বলিতে পারি যন্ত্রগুলি **ক্রমবিকাশ** বা **অভিব্যক্তির** (evolution) মধ্য দিয়া যাইতেছে।

জীবজগতে অভিব্যক্তি

ইহা হইল মনুষ্য-সৃষ্ট যন্ত্রের কথা। বিজ্ঞানীরা নানা পরীক্ষা ও প্রমাণের সাহায্যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে পৃথিবীর জীবরাজিও ঠিক উপরোক্ত যন্ত্রগুলির ন্যায় সরল দেহগঠন হইতে জীবন আরম্ভ করিয়া প্রায় একশ কোটি বৎসর ধরিয়া নানাভাবে ক্রম-পরিবর্তনের ফলে তাহাদের বর্তমান বিশেষ বিশেষ আকার প্রাপ্ত হইয়াছে। অবশ্য প্রভেদ এই যে, যন্ত্রগুলির উন্নতি মানুষের চেষ্টার ফল, কিন্তু জীবগুলির উন্নতি তাহাদের নিজ নিজ অন্তর্নিহিত শক্তিতে ঘটিয়াছে। যাহা হউক, এই হিসাবে আমরা আজ পৃথিবী-বক্ষে যে অসংখ্য প্রকার জীব দেখিতেছি তাহারা সৃষ্টির প্রথম হইতে তাহাদের বর্তমান আকারে ছিল না। যদি তাহাদের লক্ষ লক্ষ বৎসর পিছনের পূর্বপুরুষগুলির সন্ধান কোনও প্রকারে মিলিত তাহা হইলে দেখিতাম যে তাহারা তাহাদের বর্তমান বংশধরগুলি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ধরণের জীব ছিল। ইহা হইল প্রথম কথা।

কিন্তু ইহার পরও আর এক কথা আছে। যন্ত্রগুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাস—একটি হইতে অপরটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র—পরস্পরের মধ্যে কোনও যোগ নাই। কিন্তু জীবগুলির ক্রমবিকাশের ইতিহাসে এক বিশেষ সত্য হইল—**বর্তমানকালের বিভিন্ন জাতির জীবগুলির পূর্বপুরুষ সুদূর অতীতের কোনও না কোনও সময়ে একই ছিল** অর্থাৎ **পৃথিবীর যাবতীয় জীবের মধ্যে একটা রক্ত-সম্পর্ক রহিয়াছে।** তাহারা প্রকৃতই এক অতি অতি বৃহৎ পরিবার-গোষ্ঠীর অন্তর্ভূক্ত। ইহার একটি অতি সুন্দর প্রমাণ আমাদের চোখে পড়ে—তাহা হইল **জীবের শ্রেণী-বিভাগের সুপরিকল্পিত ভঙ্গী।** ইহার সমগ্র রূপটি এই প্রকার :—

জীবের শ্রেণীবিভাগের কাঠামো

পৃথিবীতে অগণিত প্রাণী। এক **এক প্রকার প্রাণী** লইয়া এক একটি জাতি ; যেমন গোরু জাতি, ঘোড়া জাতি, বাঘ জাতি ইত্যাদি। কতকগুলি এক **এক প্রকার জাতি** লইয়া এক একটি বৃহত্তর জাতি বা **গণ**। যেমন গোরু, ঘোড়া, হাতী ইত্যাদি জাতি লইয়া **ক্ষুর-বিশিষ্ট** একটি গণ ; খরগোস, কাঠবিড়াল, ইঁদুর প্রভৃতি জাতি লইয়া **তীক্ষ্ণদন্ত** আর একটি গণ ইত্যাদি। আবার ক্ষুর-বিশিষ্ট, তীক্ষ্ণদন্ত, মাংসাশী প্রভৃতি **গণ লইয়া স্তন্যপায়ী** একটি আরও বৃহৎ জাতি—**গোত্র।** আবার স্তন্যপায়ী, সরীসৃপ, পক্ষী ইত্যাদি **গোত্র লইয়া মেরুদণ্ডী** একটি **বর্গ** ইত্যাদি। **এই যে সমগ্র প্রাণিসমাজকে** (বা উদ্ভিদসমাজকে) **ধাপে ধাপে** সুসংবদ্ধভাবে এই প্রকারে **ছোট হইতে বড় কয়েকটি সুনির্দিষ্ট ভাগে বিভাগ করা সম্ভব হইতেছে ইহার কারণ পৃথিবীর সমস্ত প্রাণিরাজির মধ্যে একটা রক্ত-সম্পর্কের** অস্তিত্ব। ইহা না থাকিলে পৃথিবীর প্রত্যেকটি জীব অপরটি হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, অর্থাৎ সম্পর্ক-বিহীন হইয়া থাকিত এবং উহাদের উপরোক্ত প্রকারে বিধিবদ্ধভাবে শ্রেণীবিভাগ করা কিছুতেই সম্ভব হইত না।

জীবের এই **অভিব্যক্তিবাদ** আজ আর মস্তিষ্ক-সুলভ কল্পনা বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না (যদিও আমরা যে বানর-জাতীয় জীবের বংশধর

ইহা ভাবিতে এখনও অনেক বিদ্বান, বুদ্ধিমান লোকের সংস্কারে বাধে), ইহার পক্ষে এত সুস্পষ্ট নানা প্রকার প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে যে **ইহাকে একটি অভ্রান্ত সত্য বলিয়া না মানিয়া লইয়া উপায় নাই।** এইবার আমরা বিষয়টির একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিবার চেষ্টা করিব :—

অভিব্যক্তির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা

ক। **পরিবর্তন**—একটু চিন্তা করিলেই বোঝা যায় যে অভিব্যক্তিবাদের প্রথম কথা হইল—**পরিবর্তন** বা **নূতনের আবির্ভাব। যদি সন্তান উৎপাদনের ব্যাপার কারখানায় দ্রব্য নির্মাণের ন্যায় হইত** অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু অবিকল তাহার পূর্বেরটির প্রতিকৃতি, তাহা হইলে অনন্তকাল ধরিয়া বংশক্রম চলিলেও কোনও সময়েই এক প্রকার জীব হইতে অন্য প্রকার জীবের উদ্ভব সম্ভব হইত না। এই পরিবর্তন সামান্য হউক, গভীর হউক, দেহের সমগ্র গঠন বা কোনও বিশেষ অঙ্গের গঠন-সংক্রান্ত হউক, ইহাই অভিব্যক্তির আদি উপকরণ। কারণ এই নূতন বৈশিষ্ট্য ধরিয়াই নূতন এক বংশের উদ্ভব হইতে পারে। এখন প্রশ্ন—এই **পরিবর্তন কেন বা কি অবস্থায় ঘটে?**

পরিবর্তন দুই প্রকার। একটি হইল আবেষ্টনীর প্রভাব হইতে উদ্ভূত বা **লব্ধ** (acquired)। যেমন দেখা গিয়াছে কয়েক জাতীয় উদ্ভিদ সমুদ্রের তীরে জন্মাইলে উহাদের পাতা বিশেষ রকমের পুরু ও শাঁসালো হইয়া উঠে, যাহা তাহাদের স্বজাতীয়, স্বাভাবিক পরিবেশে উৎপন্ন উদ্ভিদগুলির পাতা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতির। একটি ঘোড়া যদি সারা জীবন ঘাড় লম্বা করিয়া উঁচু কোনও গাছের ডাল হইতে তাহার প্রিয় ফল বা পাতা খাইবার চেষ্টা করে তাহা হইলে হয়তো পরিণামে তাহার স্বজাতিদের অপেক্ষা তাহার ঘাড়টি কিছু লম্বা হইয়া উঠিতে পারে। কিন্তু তাই বলিয়া প্রথম ক্ষেত্রে ঐ বিশেষআকৃতির পাতা-বিশিষ্ট উদ্ভিদের শিশুগুলিও যে ঐ বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করিবে তাহা নহে। তাহারা নিজ জাতির সাধারণ পাতা-বিশিষ্ট উদ্ভিদই হইবে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রেও দীর্ঘতর ঘাড়-বিশিষ্ট

পরিবৃত্তি (variation)

ঘোড়াটির শাবক সাধারণ ঘাড় লইয়াই জন্মগ্রহণ করিবে। অভিব্যক্তিবাদের দিক হইতে এই জাতীয় পরিবর্তনকে **পরিবৃত্তি (variation)** বলে।

দ্বিতীয় প্রকারের পরিবর্তন সম্পূর্ণ অন্য প্রকৃতির। **বংশগতির (heredity) সাধারণ নিয়ম** হইল—**like begets like অর্থাৎ** এক জাতীয় জীব হইতে সেই জাতীয় জীবই উদ্ভূত হয়। গোরুর শাবক গোরুই হয়, শিয়াল হয় না। কিন্তু তাই বলিয়া গোরুর শাবক যদি **সব সময় অবিকল** তাহার পিতামাতার ন্যায়ই হইত তাহা হইলে জীবজগতে অভিব্যক্তি বলিয়া কিছু থাকিত না। কিন্তু তাহা হয় না। সুন্দর পিতামাতার সন্তান সব সময় সুন্দর হয় না, তেমনি অসুন্দর পিতামাতার সন্তানও যে সুন্দর হয় না তাহা নহে। আরও বিশেষভাবে—নাক, চোখ, ঠোঁট প্রভৃতি অঙ্গের গঠনেও পিতামাতার সহিত পুত্রকন্যার আকৃতিতে যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হয়। **জন্মগত এই যে পরিবর্তন ইহাই অভিব্যক্তির দিক হইতে প্রকৃত মূল্যবান।** ইহার নাম **পরিব্যক্তি** (mutation)।

পরিব্যক্তি (mutation)

খ। **প্রাকৃতিক নির্বাচন** —অভিব্যক্তিবাদের দ্বিতীয় কথা হইল—**প্রাকৃতিক নির্বাচন** (natural selection)। জীবের **বংশগতির বিশেষ নিয়মে** উপরোক্ত কত রকমের পরিবর্তন, অর্থাৎ পরিব্যক্তি, যে ঘটিতে পারে তাহার হিসাব-নিকাশ নাই। কিন্তু বংশগতির **সাধারণ নিয়মে** যদি জাতির জীবনে এই সকল প্রকার পরিবর্তন বা নূতনত্বই সন্তানের মধ্যে সংক্রমিত হয় তাহা হইলে এক জাতির মধ্যে পরিণামে অসংখ্য প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্যধারী জীবের উদ্ভব হইবে এবং **কোনও একটি নির্দিষ্ট বৈশিষ্ট্য ধরিয়া** ঐ জীবের উত্তরোত্তর পরিবর্তন বা বিকাশ সম্ভব হইবে না। তাই প্রয়োজন—একটি **নির্বাচন পদ্ধতি** যাহার দ্বারা **শুধু এক জাতীয় পরিব্যক্তিই গৃহীত** ও অন্যগুলি বর্জিত হইবে। কিরূপে ইহা সাধিত হয় তাহার বর্ণনা করা যাইতেছে :—

আমরা জানি বাগানের মালী ফুল বা ফলের গাছ হইতে **ইচ্ছানুযায়ী** অর্থাৎ যে গাছগুলিতে **মনোমত** কোনও বিশেষ বর্ণ, গন্ধ, আকৃতি বা আস্বাদ-বিশিষ্ট ফুল বা ফল উৎপন্ন হইল—সেইগুলি হইতেই বীজ বা কলম

রাখিয়া উন্নততর বংশের উদ্ভিদ সৃষ্টি করে। এখানে মানুষ হইল নির্বাচক এবং নির্বাচনটি হইল সেই কারণে **কৃত্রিম নির্বাচন**।

কৃত্রিম নির্বাচন

ঠিক এই ভাবে প্রাকৃতিক নিয়মে নির্বাচন সংসাধিত হইতে পারে। যেমন মনে করা যাক একটি **নির্দিষ্ট অঞ্চলে** কতকগুলি প্রাণী বসবাস করিতেছে। বংশবৃদ্ধির সহিত বাসস্থান ও খাদ্যের অভাব ঘটিল ও প্রাণীগুলির মধ্যে বিবাদ, হানাহানি বাধিল প্রাণধারণের তাগিদে। এরূপ অবস্থায় যদি হঠাৎ একটি শাবক বংশগতির বিচিত্র নিয়মে তাহার দেহে দ্রুত দৌড়াইবার পক্ষে সুবিধাজনক কোনও বৈশিষ্ট্য লইয়া জন্মগ্রহণ করে, যেমন সরু লম্বা পা, তাহা হইলে পরিণামে উহার সন্তানগুলির ঐ পরিমিত স্থান ও খাদ্যযুক্ত অঞ্চলে সাফল্যের সহিত বাঁচিয়া থাকিবার সম্ভাবনা তাহাদের সাধারণ জ্ঞাতি-ভাইদিগের অপেক্ষা অধিক হইবে। কারণ তাহারা **ছুটিয়া অন্য কোনও তৃণ-শস্যপূর্ণ স্থানে প্রথম পৌঁছিয়া** নিজেদের খাদ্যের সংস্থান করিয়া লইবে, হিংস্র বলবান পশুদের আক্রমণ হইতে সহজে আত্মরক্ষা করিতে পারিবে ইত্যাদি। এইভাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ফলে স্বাভাবিক আকৃতির জীবগুলির বংশ নির্মূল হইয়া ঐ **নূতন বৈশিষ্ট্যধারী এক নূতন জাতির উদ্ভব হইবে।**

চিত্র নং ২৪৯: জীবজগতে দুইটি বিচিত্র অভি-যোজনের দৃষ্টান্ত; একটি ফড়িং ও দুইটি প্রজাপতি গাছের মধ্যে ডাল-পাতার ভঙ্গীতে কেমন আত্মগোপন করিয়া আছে খুঁজিয়া বাহির কর।

সুতরাং **প্রাকৃতিক নির্বাচন** হইল প্রকৃতির হাতের এক প্রকার

চালনী-বিশেষ, যাহার মধ্য দিয়া শুধু **এক প্রকার বৈশিষ্ট্য-বিশিষ্ট** জীবগুলি উত্তীর্ণ হইয়া আসে—পৃথিবীতে **জীবনের** খেলায়। আর ঐ বৈশিষ্ট্যটি **হইল এমন, যাহা জীবন-সংগ্রামে** (struggle for existence) **জয়ী হইতে সাহায্য করে।** এই জীবন-সংগ্রামে জয়ী হইবার বৈশিষ্ট্য অর্জন, বা অন্যভাবে, **পরিবেশের সহিত সামঞ্জস্য-সাধনের প্রক্রিয়াকেই অভিযোজন** (adaptation) বলে।

জীবন-সংগ্রাম—অভিযোজন

সুতরাং পৃথিবীতে নূতন জীব সৃষ্টি বা **অভিব্যক্তির প্রক্রিয়ায়**—

ক। **প্রথম ধাপটি** হইল পরিবর্তন ও উহার ফলে জীবদেহে **নূতন বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ;**

খ। দ্বিতীয় প্রক্রিয়াটি হইল **প্রাকৃতিক নির্বাচন** অর্থাৎ নূতন বৈশিষ্ট্যগুলির **একটিকে** গ্রহণ ও উত্তরাধিকার-সূত্রে উহাকে জাতির জীবনে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

আর প্রাকৃতিক নির্বাচনের –

ক। মাপকাঠি বা **লক্ষ্য** হইল—পরিবেশের সহিত সুষ্ঠু অভিযোজন ;

খ। উপায় (means) হইল—**জীবন-সংগ্রাম** ; জীবন সংগ্রামের কারণ হইল—পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা।

প্রকৃতির বুকে নানা সময়ে, নানা কারণে এই সব প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি হইয়াছিল -শুধু আহার্য ও বাসস্থানের অপ্রাচুর্য্য নহে, জলবায়ুর তীব্রতা বৃদ্ধি, শত্রুবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা প্রকার অসুবিধা, এবং প্রকৃতি নির্মম হস্তে জীবন-সংগ্রামরূপ **পরীক্ষার** দ্বারা তাহার যোগ্যতম সন্তানদের বাছিয়া লইয়াছে পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিবার জন্য।

অভিব্যক্তির তত্ত্বটি বুঝা গেল। এইবার ঐ তত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীপৃষ্ঠে জীবনের আবির্ভাবের ধারাটি বুঝিতে চেষ্টা করা যাক :—

বিভিন্ন শ্রেণীর জীবের উৎপত্তি—জীব হইতেই জীবের উদ্ভব সম্ভব, অতএব আমাদের **পৃথিবীর জীবকুলের একটি আদি জন্মদাতার** অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

জীব-পরিবারের এই প্রথম পিতা—মনুষ্যজাতিরও বটে—দেখিতে কেমন ছিলেন? অবশ্য খুব সুন্দর নহে; অ্যামিবা বলিয়া যে প্রাণীটির কথা বলা হইয়াছে, তিনি ছিলেন তাহারই সগোত্র। ভাবিতে আনন্দ না হইবারই কথা!

পৃথিবীর তখন কৈশোর অবস্থা। স্থলের চিহ্নমাত্র নাই, চারিদিকে শুধু বিক্ষুব্ধ জলরাশির ফেনিল বিস্তার। সেই সলিলগর্ভে আবির্ভূত হইল পৃথিবীতে এই প্রথম প্রাণের স্পন্দন—এক কণিকা প্রোটোপ্লাজমের দেহধারী, না-প্রাণী, না-উদ্ভিদ এক বিচিত্র জীব। কালক্রমে ইহাদের মধ্যে কতকগুলি এক বৈশিষ্ট্য অর্জন করিল—সবুজবর্ণের এক প্রকার পদার্থ (ক্লোরোফিল) দেহে প্রস্তুত করিয়া উহার সাহায্যে বাতাসের কার্বন-ডাই-অক্সাইড হইতে নিজেদের খাদ্য সংগঠিত করিতে লাগিল। এই শান্তশিষ্ট জীবগুলিই হইল **বর্তমান উদ্ভিদকুলের আদি পূর্বপুরুষ।** আর এক দল এত গণ্ডগোলের মধ্যে না যাইয়া সোজা স্বজাতিদের ভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করিতে লাগিল। এই দস্যুবৃত্তি-পরায়ণ জীবগুলিই হইল **বর্তমান প্রাণিজাতির আদি পূর্বপুরুষ।** এইভাবে **জীবন-বৃক্ষের** দুইটি মূল শাখার উদ্ভব হইল।

জীবন-বৃক্ষ (Tree of Life)—প্রকৃতই আমরা পৃথিবীতে জীবের ক্রমবিকাশের ধারাকে একটি বৃক্ষের বৃদ্ধির ভঙ্গীর সহিত সুন্দরভাবে তুলনা করিতে পারি। দৃষ্টান্তস্বরূপ প্রাণিশাখার কথা ধরা যাক। প্রাণিকুলের উপরোক্ত পূর্বপুরুষটি কিছুকাল অর্থাৎ **কয়েক কোটি বৎসর পরে** কিছু নূতন বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া **প্রোটোজোয়া শাখায়** বিভক্ত হইয়া গেল (ইহার মধ্যেই অ্যামিবা জাতিটি রহিয়াছে, বলা হইয়াছে)। আরও কয়েক **কোটি** বৎসর পরে আরও কিছু নূতন বৈশিষ্ট্য অর্জন করিয়া এই পূর্বপুরুষটি আর একটি শাখায় বিভক্ত হইয়া গেল। প্রোটোজোয়ার ন্যায় ইহাও প্রাণিজগতের আর একটি বড় বিভাগ—**স্পঞ্জ। এই বৃহৎ বিভাগ গুলির নাম পর্ব।** এইভাবে অগ্রসর হইয়া সর্বশেষে অর্থাৎ পৃথিবীতে জীবনের আবির্ভাবের প্রায় দেড় কোটি বৎসর পরে যে শাখাটি বাহির হইল—তাহাই হইল আমাদের সুপরিচিত **মেরুদণ্ডী পর্ব।** এই

পর্বের মধ্যে মানুষের আবির্ভাব এখনও পর্যন্ত সকলের শেষে। মানুষের পরে কি—কে বলিবে?

চিত্র নং ২৫০: জীবন বৃক্ষ (Tree of Life) না প্রাণী, না উদ্ভিদ পৃথিবীর ঐ প্রথম জীবটি হইতে জীবনের বিচিত্র সমারোহের উদ্ভব চিত্রের সাহায্যে আভাস হইতে কল্পনা করা যায়

প্রতিটি মূল শাখায় আবার ঠিক একই প্রণালীতে, একটির উপরে আর একটি প্রশাখা বাহির হইল এবং ইহারাই হইল শ্রেণীবিভাগের ক্রমে পর্বের নীচের ক্ষুদ্রতর বিভাগটি—ইহার নাম শ্রেণী (class)। শ্রেণীর

পর **বর্গ** ইত্যাদি (২৮৭ পৃষ্ঠা)। এইভাবে ক্রমান্বয়ে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া আমাদের এই **জীবন-বৃক্ষটি প্রাণিজগতের শ্রেণী বিভাগের**, এবং ঐ সঙ্গে **পৃথিবীতে বিভিন্ন প্রকার প্রাণীর আবির্ভাবের ধারার** একটি সম্পূর্ণ ও বাস্তব চিত্র উপস্থাপিত করিবে।

প্রাণিজগৎ সম্বন্ধে যাহা বলা হইল উদ্ভিদজগৎ সম্বন্ধেও সেই একই কাহিনী প্রযোজ্য হইবে।

অভিব্যক্তি সম্বন্ধে একটি ভুল ধারণা—এখানে একটি সাধারণ ভুল ধারণা সম্বন্ধে সাবধান হইতে হইবে। সরীসৃপ ও পাখী—মেরুদণ্ডী **পর্বের** এই দুইটি **শ্রেণীর** কথা ধরা যাক। জীবন-বৃক্ষে উহারা পর্বশাখার দুইটি প্রশাখা, প্রথমটি নীচে, দ্বিতীয়টি উপরে। ইহার অর্থ সরীসৃপ **শ্রেণীর** আদি পূর্বপুরুষটি সমগ্র মেরুদণ্ডী **পর্বের** আদি পূর্বপুরুষটি হইতে তাহার নূতন দৈহিক বৈশিষ্ট্য লইয়া প্রথমে উদ্ভূত হইয়াছে এবং তাহার পরে উদ্ভূত হইয়াছে—পাখিশ্রেণীর আদি পূর্বপুরুষটি। উভয় শ্রেণীর মধ্যে এইটুকুই সম্পর্ক। কিন্তু যদি মনে করা যায় যে **বর্তমান যুগে আমরা যে সকল কচ্ছপ, কুমীর ইত্যাদি সরীসৃপ দেখিতেছি তাহারা অভিব্যক্তির মধ্য দিয়া কোনও কালে কাক, চিল প্রভৃতি পাখীতে পরিণত হইবে—তাহা হইলে সম্পূর্ণ ভুল করা হইবে।** তেমনি বর্তমান যুগের বানরও যে কোনও কালে মানুষে পরিণত হইবে না—তাহাও নিশ্চিত। **মানুষ ও বানরের পূর্বপুরুষ এক**—ইহাই সত্য, **বানর মানুষের পূর্বপুরুষ নহে।**
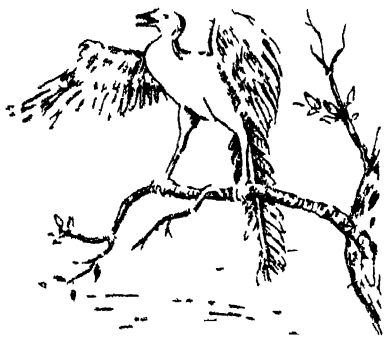
চিত্র নং ২৫১ : আর্কিঅপটেরিক্স—সরীসৃপ ও পাখীর সাধারণ পূর্বপুরুষ

উপরে যাহা বলা হইল তাহা যদি সত্য হয় তাহা হইলে সরীসৃপ ও পক্ষি-শ্রেণীর সাধারণ পূর্বপুরুষটির দৈহিক গঠনে উভয়

শ্রেণীর সহিত যথেষ্ট সাদৃশ্য থাকিবে—ইহা নিশ্চয় অনুমান করা চলে। প্রকৃতই একটি প্রাণীর সন্ধান পাওয়া গিয়াছে (অবশ্য জীবিত অবস্থায় নহে) যাহাকে পাখী বলিলেও চলে, সরীসৃপ বলিলেও চলে। উহার নাম আর্কিঅপ্‌টেরিক্স (archaeopterix)। ইহার কথা নীচে আবার বলা হইতেছে।

এখানে আর একটি কথা আছে: অতীত যুগে কখনও এমন ঘটিয়াছিল যে একজাতীয় প্রাণী বহুকাল নির্দিষ্ট পথে দৈহিক বিকাশ সাধনের দ্বারা আবেষ্টনীর সহিত পূর্ণ সামঞ্জস্য-বিধান করিয়া পৃথিবীতে তাহাদের একাধিপত্য স্থাপন করিল। কিন্তু হঠাৎ এক সময়ে জলবায়ুর এমন প্রচণ্ড তারতম্য বা ঐ জাতীয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা আসিয়া উপস্থিত হইল যাহার সহিত সামঞ্জস্য সাধন করিবার মত দৈহিক যোগ্যতা বা মানসিক বুদ্ধি তাহাদের ছিল না। ফলে তাহারা সবংশে বিনষ্ট হইল, এতকালের ক্রমবিকাশের ফল সহসা বিলুপ্ত হইয়া গেল। এই ভাবেই আমরা **অতীত যুগের অতিকায় সরীসৃপরাজির** (dinosaurs) অস্তিত্বের ব্যাখ্যা দিতে পারি। পৃথিবীতে তাহাদের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিবার এখন কেহই নাই।

অতিকায় সরীসৃপের যুগ (age of dinosaurs)
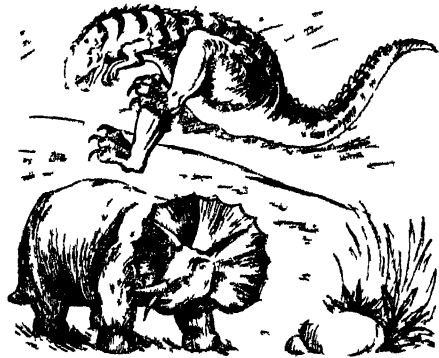
চিত্র নং ২৫২ অতীত যুগের অতিকায় দুইটি সরীসৃপ; উপরে—লম্ফমান অ্যালোসোরস (মাংসাশী) নীচে—ট্রাইসর‍্যাটপ্‌স্ (নিরামিষাশী) ইহারা দৈর্ঘ্যে ৭ ফুট পর্যন্ত হইত (নানা প্রমাণ ও বিচারের ভিত্তিতে অঙ্কিত)

অভিব্যক্তিবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ

এই যে অভিব্যক্তিবাদ অনুযায়ী প্রাণিজাতির প্রাচীন ইতিহাস ব্যক্ত

করা হইল প্রত্যক্ষ প্রমাণ ভিন্ন হয়তো আমাদের মন ইহাতে পূর্ণ সায় দিবে না। কিন্তু প্রথমেই বলা হইয়াছে অভিব্যক্তিবাদের প্রমাণের অভাব নাই—**এমন কি প্রত্যক্ষ প্রমাণ** পর্যন্ত। ইহাদের মধ্যে প্রধান—

(ক) **জীবাশ্মরাজি (fossils)**—জীবাশ্ম হইল গভীর মৃত্তিকায় প্রোথিত কোনও প্রাচীন প্রাণীর দেহাবশেষ। কখনও জীবটির **অবিকৃত দেহ,** (যে অবস্থায় বর্তমান হাতীর পূর্বপুরুষ **ম্যামথ**-এর দেহ পাওয়া গিয়াছে), কখনও বা উহার **প্রস্তরীভূত অস্থিকঙ্কাল,** কখনও বা **পলিপ্রস্তরে তাহার দেহের ছাপ**—ইত্যাদি নানারূপে এই জীবাশ্মগুলি অতীতের লুপ্ত জীবসাম্রাজ্যের জীবন্ত ইতিহাস বক্ষে ধরিয়া আছে। সমুদ্রের জলে পলিমাটি চাপা পড়িয়া, বায়ুর সম্পূর্ণ সংস্রব-বিহীন অবস্থায় মৃত দেহটির

চিত্র নং ২৫৩ : জীবাশ্ম ; প্রস্তরের বুকে আর্কিঅপটেরিক্সের অস্থিকঙ্কালের ছাপ—কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন স্মৃতি !

বিকৃত হইবার সম্ভাবনা খুবই কম থাকে এবং এই ভাবেই জীবাশ্মগুলি সৃষ্টি হইয়া আমাদের গোচরে আসিয়াছে। উপরে যে পক্ষী ও সরীসৃপ শ্রেণীর পূর্বপুরুষ—আর্কিঅপটেরিক্স-এর কথা বলা হইল উহার সহিত এই জীবাশ্ম আকারেই আমাদের পরিচয়।

'ডিম্ব-প্রসবকারী স্তন্যপায়ী জন্তু"—কথাটি 'অশ্বডিম্বের" মতই অদ্ভুত মনে

হয়। কিন্তু সত্যই স্তন্যপায়ী শ্রেণীর একটি পূর্বপুরুষের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে যাহারা ডিম পাড়ে, অথচ শাবক জন্মিয়া মায়ের স্তন্যপান করিয়া 'মানুষ' হয়। একই দেহে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী-সুলভ ধর্মের কি অপূর্ব সমন্বয়! স্পষ্টই বুঝা

চিত্র নং ২০৪. প্লাটিপস 'জীবন্ত জীবাশ্ম', 'একই দেহে সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ী-সুলভ ধর্মের কি অপূর্ব সমন্বয়!"

যাইতেছে ইহা প্রকৃতির খামখেয়াল নহে। সরীসৃপ শ্রেণীর জীবেরা যে অবস্থার ভিতর দিয়া স্তন্যপায়ী শ্রেণীতে পরিণত হইয়াছিল এই প্রাণী তাহারই চাক্ষুষ নিদর্শন। এই মধ্যবর্তী অবস্থার জীব সকলেই প্রায় পৃথিবী হইতে বিদায় লইয়াছে, উহাই স্বাভাবিক। সে হিসাবে বর্তমানকালে ইহার অস্তিত্ব অভিব্যক্তিবাদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম সন্দেহ নাই এবং তাই এই প্রাণীটিকে আমরা পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য সামগ্রী বলিয়া বিবেচনা করিতে পারি। প্রাণীটির নাম তোমরা ভূগোলে পড়িয়া থাকিবে—প্লাটিপস (platypus), অষ্ট্রেলিয়ায় ইহার বাস। প্রাণীটিকে 'জীবন্ত জীবাশ্ম' (living fossil) নাম দেওয়া হইয়াছে এবং এ নাম প্রকৃতই সার্থক।

অভিব্যক্তিবাদে প্লাটিপসের (platypus) তাৎপর্য

আরও দুইটি প্রমাণের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম—

খ। ভেস্টিজিয়াল অঙ্গ (vestigial organs)—বর্তমান যুগের প্রাণীদের দেহে এমন কতকগুলি অঙ্গের সন্ধান পাওয়া যায় যাহা তাহাদের কোনও প্রয়োজনেই লাগে না, উপরন্তু কোনও কোনও ক্ষেত্রে অনর্থের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। জীববিদ্যায় ইহাদিগকে ভেস্টিজিয়াল অঙ্গ (vestige

অর্থ শেষ চিহ্ন) বলে। যেমন মেরুদণ্ডী পর্বের সরীসৃপ শ্রেণী হইতে উচ্চতর সকল শ্রেণীর জীবের দেহে, পূর্ণবয়স্ক অবস্থায় না হইলেও, **ভ্রূণাবস্থায়** (অর্থাৎ জন্মের পূর্বে ডিম্বের মধ্যে বা মাতৃগর্ভে বৃদ্ধিশীল অবস্থায়) **ফুলকা-ছিদ্র** (gill-cleft) (১৪৮ পৃষ্ঠা দেখ) স্পষ্ট দেখা যায়। ইহা হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় যে পৃথিবীর বর্তমান মেরুদণ্ডী প্রাণীদের পূর্বপুরুষ জলচারী ছিল। তেমনি তিমির ক্ষুদ্র অকেজো পাশের ডানা যাহা উহার বর্তমান জীবনে কোনও প্রয়োজনেই লাগে না, ঐ অঙ্গটি উহার পক্ষিশ্রেণীর জীবের সহিত রক্ত-সম্পর্কেরই ইঙ্গিত করিতেছে। তেমনি আমাদের দেহের **অ্যাপেন-ডিক্স** (appendix), (১৬০ নং চিত্র) **অনুত্রিকাস্থি** (cocoyx) (লেজের হাড), চক্ষুর কোণে **তৃতীয় পাতার সামান্য চিহ্ন** ইত্যাদি অপ্রয়োজনীয় অঙ্গগুলি মানুষের অভিব্যক্তির ইতিহাসের প্রতিই অঙ্গুলি-নির্দেশ করিতেছে।
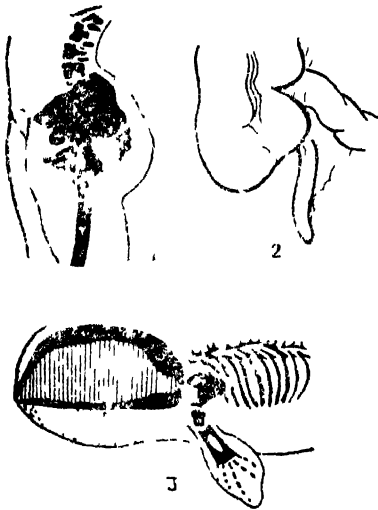
চিত্র নং ২৫৫ : কয়েকটি ভেস্টিজিয়াল অঙ্গের দৃষ্টান্ত ; ১—অনুত্রিকাস্থি , ২—অ্যাপেনডিক্স ; ৩—তিমির পাশের পাখনা (মানুষের হাত, বাদুড়ের ডানা প্রভৃতির ন্যায় গঠন)

গ। **ভ্রূণের সাদৃশ্য**—তৃতীয় প্রমাণটি হইল এই : বর্তমানে সম্পূর্ণ বিভিন্ন জাতির প্রাণীগুলির মাতৃগর্ভে ভ্রূণের বৃদ্ধির ধারা অনুসরণ করিয়া দেখা গিয়াছে যে প্রথম অবস্থায় উহাদের মধ্যে অপূর্ব সাদৃশ্য থাকে। যতই বৃদ্ধি অগ্রসর হইতে থাকে ততই উহাদের স্ব স্ব দৈহিক বৈশিষ্ট্যগুলি পরিস্ফুট হইয়া পরিণামে উহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন আকৃতির জীব হইয়া উঠে। ইহাতেও কি জীবের অভিব্যক্তির তত্ত্বটিই ব্যক্ত হয় না ?

১। অভিব্যক্তির প্রক্রিয়ায় ইহাদের পরস্পরের সম্পর্ক বুঝাইয়া বল—

(ক) পরিব্যক্তি, (খ) প্রাকৃতিক নির্বাচন, (গ) জীবন সংগ্রাম, (ঘ) অভিযোজন। এই প্রসঙ্গে বংশগতির (১) সাধারণ নিয়ম, (২) বিশেষ নিয়মের তাৎপর্য ব্যাখ্যা কর।

২। নিম্নলিখিত বিষয়গুলি যুক্তি-সহ ব্যাখ্যা কর :—

ক। বানর মানুষের পূর্বপুরুষ নহে।

খ। জীবের শ্রেণীবিভাগের সুষ্ঠু কাঠামোটি অভিব্যক্তিবাদের একটি বিশেষ প্রমাণ।

গ। অতিকায় সরীসৃপরাজের বংশধর পৃথিবীতে কেহ নাই।

ঘ। কোটি কোটি বৎসরের পুরাতন জীবেরও দেহাবশেষ বর্তমানে প্রত্যক্ষ করা যায়।

৩। অস্ট্রেলিয়া মহাদেশে প্লাটিপসের ন্যায় আরও কয়েকপ্রকার প্রাচীন প্রাণীর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়; ইহার কি ব্যাখ্যা দিতে পার? প্লাটিপস একাধারে অভিব্যক্তিবাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ ও উহার ব্যতিক্রম—এই উক্তিটির তাৎপর্য বুঝাইয়া দাও। পৃথিবীর প্রথম যুগের জীব অ্যামিবা এখনও পৃথিবীতে বাস করিতেছে— ইহা কিরূপে সম্ভব?

ষষ্ঠ অধ্যায়

কয়েকটি সাধারণ রোগ ও সংক্রামক রোগ

রোগের কারণ ও উহার প্রতিরোধের উপায়

রোগের কারণ

মানুষের দেহে ব্যাধি সাধারণতঃ দুইভাবে সৃষ্টি হয়—(ক) পুষ্টির অভাব, (খ) জীবাণুর আক্রমণ।

প্রথম প্রকার ব্যাধির উল্লেখ আমরা খাদ্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে (১৭৫ পৃষ্ঠা) করিয়াছি। অধিকাংশ ব্যাধিই অবশ্য জীবাণু-ঘটিত এবং ২৭৪ ও ২৭৮ পৃষ্ঠায় রোগ উৎপাদনকারী জীবাণু হিসাবে অ্যামিবা ও ব্যাক্‌টিরিয়ার নাম উল্লেখ করা হইয়াছে।

ভাবিতে আশ্চর্য লাগে যে পৃথিবীতে জীবের জন্মের কোটি কোটি বৎসর পরেও সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ জীব মানুষকে সৃষ্টির আদিম কালের তুচ্ছ, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবগুলির সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে হইবে এবং বহুক্ষেত্রে তাহাদের নিকট হার স্বীকার করিতে হইবে। ব্যাক্‌টিরিয়ার প্রধান বল হইল তাহাদের সংখ্যাবৃদ্ধির অসীম ক্ষমতা। ২০ মিনিট পরে পরে তাহারা এক হইতে দুই, দুই হইতে চার, এইরূপ জ্যামিতিক প্রগতিতে (progression) সংখ্যায় বাড়িয়া চলে। এই ভাবে ২৪ ঘণ্টায় একটি ব্যাক্‌টিরিয়ম (bacterium) হইতে প্রায় ২,৫০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০,০০০ সংখ্যক ব্যাক্‌টিরিয়া সৃষ্টি হইবে। বিশ্বাস না হয়—অঙ্ক কষিয়া দেখ। ইহারা খাদ্য, প্রশ্বাস-বায়ু প্রভৃতি পথে মানুষের শরীরে প্রবেশ লাভ করে এবং পরে (১) শরীরের বিভিন্ন তন্তুগুলি ভক্ষণ এবং (২) নিজেদের দেহ হইতে তীব্র বিষ (toxin) নিঃসরণ করিয়া মানুষের শরীরে প্রবল রোগ সৃষ্টি করে।

রোগ-উৎপাদক জীবাণুগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় :—

ক। ব্যাক্‌টিরিয়া,

খ। প্রোটোজোয়া,

গ। **ভাইরস** (virus)।

ভাইরসগুলি ব্যাক্টিরিয়া হইতেও অনেক ছোট, খর্ব আকারে ইহাদের ২৫-৩০ ভাগ। সাধারণ অনুবীক্ষণে তাই ইহাদের দেখা যায় না। মাত্র ১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে **ইলেকট্রন মাইক্রস্কোপ** (Electron microscope) আবিষ্কারের পর মানুষ প্রথম ইহাদের সন্ধান পাইয়াছে। ইহাদের সহিত সাধারণ ব্যাক্টিরিয়ার প্রভেদ এই যে ইহারা **বাহিরের খাদ্য** খাইয়া জীবনধারণ করিতে পারে না, অন্য কোনও জীবের দেহের **কোষে প্রবেশ** করিয়া ইহার দেহবস্তু খাইয়া প্রাণধারণ করে। **সাধারণ সর্দি, ইনফ্লুয়েঞ্জা, হাম** ও **বসন্ত** রোগের সৃষ্টির কারণ ভাইরস জাতীয় জীবাণু।

রোগ প্রতিরোধের উপায়

এইরূপ, এত সংখ্যাবহুল জীবের গতিবিধি সর্বত্র। আমরা চতুর্দিকে এই অদৃশ্য শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়াও যে বাঁচিয়া আছি ইহাই বোধ হয় আশ্চর্যের বিষয়। কিন্তু তাহা হইলে জানিয়া রাখ, মানুষের দেহের নিজস্ব একটি **ব্যাধি-প্রতিরোধক শক্তি** (immunity) আছে, তাহাই আমাদের রক্ষা-কবচের কাজ করে। কিন্তু শরীর দুর্বল হইলে বা শত্রুর সংখ্যাধিক্য ঘটিলে আমাদের দেহের প্রতিরোধ-শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়ে এবং তখন শত্রু দেহে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া উহার আধিপত্য লাভ করে। এজন্য আবশ্যকক্ষেত্রে পূর্ব হইতেই বিশেষ ব্যবস্থা অবলম্বনের প্রয়োজন হয়। এইগুলির কথা এখন সংক্ষেপে বলা হইতেছে :—

ক। টিকা (**vaccination**)—এখানে, যে ব্যাধির প্রতিরোধ করিতে হইবে উহার সৃষ্টিকারী **মৃত** অথবা **ক্ষীণ শক্তিসম্পন্ন** জীবাণু মানুষের রক্তে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। উহার ফলে শরীরের স্বাভাবিক প্রতিরোধ-শক্তি উদ্দীপিত হইয়া ঐ জীবাণুর শক্তিকে রোধ করিবার জন্য রক্তে **জীবাণু-প্রতিরোধক পদার্থ** উৎপন্ন হয়। এইরূপ পদার্থকে **প্রতিবিষ** (anti-toxin) বলে। এখন শরীরের প্রতিরোধ শক্তি বর্ধিত

হইয়া ঐ রোগের আক্রমণের সম্ভাবনা দূর হইল। বসন্ত, কলেরা, টাইফয়েড ও যক্ষ্মা রোগে এইজন্য টিকা দেওয়ার বিধি আছে।

খ। **সিরাম (serum)**—এখানে, উপরে বর্ণিত ব্যাধি-প্রতিরোধক প্রতিবিষ মানুষেরই দেহে উৎপন্ন না করিয়া অন্য কোনও প্রাণীর দেহে (সাধারণতঃ ঘোড়ার দেহে) বিশেষ প্রক্রিয়ায় উহা উৎপন্ন করিয়া ঐ **পূর্ব-প্রস্তুত প্রতিবিষ** মানুষের শরীরে ইনজেকশন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং **টিকায়** মানুষের দেহ যেন **নিজের শক্তিতে** এবং **সিরামে অপরের শক্তিতে** বলীয়ান হইয়া শত্রু প্রতিরোধ করিতেছে। আমাশয়, ডিপথিরিয়া ও ধনুষ্টঙ্কার (tetanus) রোগের চিকিৎসায় বা প্রতিরোধে এবং সর্পদংশনের চিকিৎসায় সিরামের ব্যবস্থা হইয়াছে।

গ। **ঔষধ**—ঔষধ উদ্ভাবনে বা প্রয়োগে একটি বিষয় মনে রাখিতে হইবে: জীবাণুগুলি সজীব পদার্থ। মানুষের দেহের কোষগুলিও সজীব পদার্থ—কারণ উভয়ের মূল উপাদান হইল প্রোটোপ্লাজম। সুতরাং ঔষধ এমন হওয়া প্রয়োজন যাহা **জীবাণু নাশ করিবে,** অথচ **মানুষের দেহের কোষের** কোনও **ক্ষতি করিবে না।** এরূপ ঔষধের সন্ধান পাওয়া প্রকৃতই কঠিন ব্যাপার। যাহা হউক গবেষণার ফলে বর্তমানে জীবাণুনাশক যে সকল মহৌষধ আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের মধ্যে দুইটি শ্রেণীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য—

১। **সালফা-ড্রাগস (Sulpha drugs)**—এই সকল ঔষধের উপাদানে রাসায়নিকভাবে **সংযুক্ত গন্ধকই** উহাদের শক্তির মূল উৎস। সালফা-গুয়ানিডিন (Sulpha-guanidine), সালফা ডায়াজিন প্রভৃতি নানা নামের এই শ্রেণীর ঔষধ আজকাল ঘরে ঘরে ব্যবহৃত হইতেছে।

২। **অ্যান্টিবায়টিক** ঔষধ (**antibiotics**)- **পেনিসিলিন** (penicillin) এই গোষ্ঠির সর্বশ্রেষ্ঠ ঔষধ। অ্যান্টিবায়টিকগুলি **চিকিৎসা-জগতে যুগান্তর আনিয়াছে** বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইহাদের কার্য-প্রণালীতে কিছু অভিনবত্ব আছে: এখানে একজাতীয় **হিতকারী জীবাণুর** (যেমন পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে—**পেনিসিলিয়ম**) সাহায্যে **উহাদেরই স্বজাতি** আর এক শ্রেণীর **অনিষ্টকারী জীবাণুকে** (রোগ সৃষ্টিকারী

ব্যাকৃটিরিয়া) ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হইয়াছে। আসলে পেনিসিলিন এবং অন্যান্য অ্যান্টিবায়টিকগুলি **ছত্রাক শ্রেণীর** (২৭৮ পৃষ্ঠা) উদ্ভিদ (ভিজা জুতায়, দেওয়াল প্রভৃতিতে যে **ছাতা** পড়ে সেই জাতীয়) এবং প্রায় **সকল প্রকার রোগ-উৎপাদক ব্যাকৃটিরিয়ার পরম শত্রু**, অথচ মানুষের দেহের কোষের কোনও ক্ষতি করে না বলিলে চলে। এই হিসাবে ঔষধের মধ্যে পেনিসিলিনের স্থান অতুলনীয়। এই প্রথম বোধ হয় মানুষ ইহাদের মধ্যে **জৈব ঔষধের** সন্ধান পাইল এবং ইহারা অনেক সময় **দৈব শক্তির** ন্যায়ই কাজ করে।

পরিবেশে জীবাণু প্রতিরোধ—শুধু দেহের প্রতিরোধ শক্তির উপর নির্ভর করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা চলে না, পরিবেশ যথাসম্ভব জীবাণু-শূন্য করিতে হইবে। বায়ুর **অক্সিজেন ও সূর্যালোক** জীবাণুর পরম শত্রু। **ফুটন্ত জলে** অধিকাংশ জীবাণু বিনষ্ট হয়। তা ছাড়া কার্বলিক অ্যাসিড, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট, ব্লিচিং পাউডার প্রভৃতি নানা প্রকার **বীজঘ্ন পদার্থ** (disinfectants) আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবার **আয়োডিন**, হাইড্রোজেন-পারক্সাইড প্রভৃতি কতকগুলি ঔষধ শরীরে ঘায়ে বা ক্ষত স্থানে জীবাণুর আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে ব্যবহার হয়—**ইহাদের বীজবারক** (antiseptics) বলে।

রোগ সংক্রমণ ও তাহার প্রতিকার

সাধারণতঃ চার প্রকারে রোগের সংক্রমণ হয়—(ক) বায়ু, (খ) জল ও খাদ্য, (গ) কীটপতঙ্গ, (ঘ) সাক্ষাৎ সংস্রব (contact)

বায়ু-বাহিত রোগ

সাধারণ সর্দি—সহসা বিশ্বাস না হইলেও ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য যে সামান্য সর্দিও জীবাণু ঘটিত ব্যাধি। ইহার জীবাণু **ভাইরস** শ্রেণীভুক্ত। নাসাপথ, গলার ভিতর ও শ্বাসনালীতে প্রদাহ, নাক, চোখ দিয়া জল পড়া, হাঁচি, সামান্য কাশি, গলায় ব্যথা, মাথাধরা, জ্বরভাব প্রভৃতি ইহার লক্ষণ। বদ্ধ বা ধূলিধূমপূর্ণ বায়ুতে উষ্ণতার হঠাৎ পরিবর্তনে সর্দি হইতে দেখা যায়। ইউক্যালিপটাস তৈল আঘ্রাণ বা সেবন, অ্যামোনিয়া-যুক্ত কুইনাইন সেবন,

গরমজলে পা ডুবাইয়া রাখা (**foot bath**) প্রভৃতি ব্যবস্থায় ব্যাধির তীব্রতা ও কষ্ট লাঘব হয়। প্রথম অবস্থায় কাঁচা পেঁয়াজ খাইলেও অনেক সময় বেশ ফল পাওয়া যায়। সর্দিতে শরীরের প্রতিরোধ-শক্তি কমিয়া যায়, তখন অন্ত ব্যাধি সহজে আক্রমণ করিতে পারে, সুতরাং সে দিক দিয়াও সাবধান হওয়া প্রয়োজন। বায়ু-বাহিত সংক্রামক রোগ বলিয়া আক্রান্ত ব্যক্তির হাঁচিবার ও কাশিবার সময় সর্বদা রুমাল ব্যবহার করা উচিত।

ইনফ্লুয়েঞ্জা (**Influenza**)—ইহাও শ্বাসযন্ত্র-সম্পর্কিত, ভাইরস-ঘটিত একটি অতি সংক্রামক ব্যাধি, সর্দিরই কিছু রূপ। সাধারণতঃ মারাত্মক না হইলেও ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে কোনও কারণে সারাবিশ্বে ইহা ভয়াবহ আকারে দেখা দিয়াছিল এবং সে বৎসর শুধু ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশেই **৫০ লক্ষ** লোক ইহার আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

সর্দি ও কাশি ব্যতীত সর্বশরীরে বেদনা ও অতীব অবসন্নতাবোধ, খাদ্যে অরুচি ইহার বিশেষ লক্ষণ। ইহার প্রধান কারণ ইনফ্লুয়েঞ্জা নার্ভতন্ত্রকে হীনবল করে।

এই প্রসঙ্গে জীবাণু-ঘটিত ব্যাধি সম্পর্কে একটি সাধারণ তত্ত্বের কথা বলিয়া রাখি। দেখা গিয়াছে শরীরে জীবাণুর আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই কোনও ব্যাধির প্রকাশ ঘটে না, **বিভিন্ন রোগে বিভিন্ন** সময় অতিবাহিত হইবার পর ব্যাধি প্রকাশিত হয়। এই নির্দিষ্ট সময়কে ব্যাধির **incubation period অর্থাৎ অপ্রকাশ কাল** বলে। তাই সংক্রামক রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে এরূপ কোনও স্থান হইতে আগত ব্যক্তিকে নূতন কোনও দেশে প্রবেশ করিতে দিবার পূর্বে তাহাকে নির্দিষ্টকাল পৃথক করিয়া তত্ত্বাবধানে (observation) রাখিবার রীতি আছে—ইহাকে **কোয়ারেন্টাইন** (Quarantine) করা বলে। উদ্দেশ্য—দেহে ব্যাধি সংক্রমিত হইয়া থাকিলে অপ্রকাশকাল অতিক্রান্ত হইলেই উহার প্রকাশ ঘটিবে, নচেৎ সংক্রমণ ঘটে নাই বুঝিতে হইবে। ইনফ্লুয়েঞ্জার অপ্রকাশকাল মাত্র ২ দিন।

ব্যাধির অপ্রকাশকাল (incubation period)

সম্পূর্ণ বিশ্রাম, রোগীর ব্যবহৃত বাসনপত্র, শয্যাদ্রব্য প্রভৃতি নির্বীজন (disinfection), **মেলামেশা বর্জন**, কোনও বীজবারক (antiseptic)

মিশ্রিত জলে **গলায় কুল্লি করা** (gargle) ইত্যাদি ব্যবস্থা রোগের দ্রুত উপশমে ও সংক্রমণ নিবারণে সাহায্য করে। সুস্থ হইয়া উঠিবার পরও বেশ কিছুদিন এই সকল সাবধানতা পালন করা উচিত এবং স্নায়ুর শক্তিবর্ধক ঔষধ সেবন বিধেয়।

জল-বাহিত রোগ

কলেরা (**cholera**)—এই রোগ অতীব সংক্রামক ও মারাত্মক। **কলেরার জীবাণু-দুষ্ট** জল ও খাদ্যের মাধ্যমে এই ব্যাধি সংক্রমিত হয়। পেটে প্রচণ্ড ব্যথা-সহ ঘন ঘন চাউল-ধোওয়া জলের ন্যায় বর্ণহীন দাস্ত ও বমি এই রোগের প্রধান লক্ষণ। দেহের জল প্রচুর পরিমাণে নিষ্কাশিত হওয়ার কারণে শরীর দ্রুত শুখাইয়া অস্থি-চর্মসার হইয়া যায় এবং সম্পূর্ণ অবসন্ন হইয়া পড়ে, রক্তপ্রবাহ ক্ষীণ হইয়া হাত-পা ঠাণ্ডা হইয়া যায় এবং দেহের নানা স্থানে, বিশেষ করিয়া পায়ে পেশী আকুঞ্চিত হইয়া **"খাল** (cramp) **ধরে"**। এই অবস্থায় উপযুক্ত চিকিৎসা না হইলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর মৃত্যু ঘটে। ইহার প্রধান চিকিৎসা হইল—রক্তরসে (plasma) লবণের (common salt) যে ঘনত্ব সেই ঘনত্বের লবণ-দ্রবণ ধীরে ধীরে, একাদিক্রমে আবশ্যক পরিমাণে ইনজেকশন করিয়া শরীরে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া এবং এইভাবে শরীরের বল অটুট রাখা, যাহাতে উহা নিজের প্রতিরোধশক্তি দিয়া জীবাণুর সহিত যুঝিতে পারে। ইহা **Saline injection** নামে সুপরিচিত। এখানে মনে রাখিতে হইবে—Saline injection-এর **জীবাণু-নিবারক কোনও গুণ নাই**। এরূপ ভয়ঙ্কর সংক্রামক রোগে রোগীর পরিবেশ সম্পূর্ণ নির্বীজিত (sterilise) করিবার আবশ্যকতা যে কত গুরুত্বপূর্ণ তাহা বোধ হয় না বুঝাইয়া বলিলেও চলে। কলেরা সন্দেহ হইলেই সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে হাসপাতালে স্থানান্তরিত করিতে হইবে, কারণ গৃহে সুচিকিৎসা ও অন্যান্য ব্যবস্থাদি অবলম্বন প্রায় অসম্ভব এবং বাঞ্ছনীয়ও নহে।

নিকটে কলেরার প্রাদুর্ভাব ঘটিয়াছে জানিতে পারিলেই খাদ্যদ্রব্য বিশেষ-ভাবে মাছির সংস্রব হইতে রক্ষা এবং খাইবার পূর্বে উত্তপ্ত (অর্থাৎ

জীবাণুশূন্য) করিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। মন যথাসম্ভব প্রফুল্ল ও ভয়শূন্য রাখিলে রোগ-প্রতিরোধে বিশেষ সাহায্য করে।

কলেরার প্রতিষেধক সিরাম (সাধারণত টাইফয়েড-প্রতিষেধক সিরামের সহিত মিশ্রিত আকারে T.A.B.C. নামে ইহা পরিচিত) মোটামুটি ৫-৬ মাস কার্যকরী থাকে।

টাইফয়েড (typhoid)—এই রোগের প্রধান আক্রমণ-স্থল হইল অন্ত্র। অল্প জ্বর হইয়া রোগের সূচনা হয়। জ্বর ক্রমশঃ সপ্তাহকাল ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে এবং পেটের গণ্ডগোল শুরু হয়। রোগের উপশম না হইলে অন্ত্রে ক্ষত হইয়া মলের সহিত রক্তক্ষরণ হইতে থাকে এবং ক্ষত ক্রমশঃ গভীর ও ব্যাপক হইয়া অন্ত্র সর্বত্র ছিদ্রযুক্ত হইয়া যায় ও ইহার কার্যশক্তি হারায়, এবং এইভাবে সাধারণতঃ তিন সপ্তাহের মধ্যে রোগী মৃত্যুমুখে পতিত হয়। অনেক সময় মূল রোগের উপশম হইবার অবস্থায় নিউমোনিয়া প্রভৃতি অন্য মারাত্মক ব্যাধির আক্রমণে রোগীর মৃত্যু ঘটিয়া থাকে। কোনও রোগে বোধ হয় টাইফয়েডের ন্যায় এরূপ সুচারু ও সুব্যবস্থিত শুশ্রূষার প্রয়োজন করে না। শুশ্রূষার ত্রুটীতে অনেক সময় রোগী প্রায় সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিবার কালে রোগের দ্বিতীয় বা তৃতীয় আক্রমণে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে—দেখা গিয়াছে। বর্তমানে **ক্লোরোমাইসেটিন** (chloromycetin) নামক অ্যান্টিবায়টিক ঔষধটি টাইফয়েডকে প্রায় সম্পূর্ণ আয়ত্তে আনিয়াছে বলা চলে।

আমাশয় (dysentery)—ইহা আর এক প্রকার অন্ত্র-সম্পর্কিত ব্যাধি। ইহা দুই শ্রেণীর হয়—(ক) অ্যামিবা-ঘটিত, (খ) ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত। হঠাৎ গরম বা ঠাণ্ডা লাগা, কাঁচা ফলমূল বা অধিক মসলা-যুক্ত বা অর্ধ-সিদ্ধ তরিতরকারী ভক্ষণ ইত্যাদি কারণে অনেক সময় রোগের আক্রমণ সহজ হয়।

তলপেটে ছুরি দিয়া কাটার ন্যায় যন্ত্রণা-সহ ঘন ঘন পায়খানার বেগ অথচ **সামান্য মল**-সহ শ্লেষ্মা (কখনও রক্ত-মিশ্রিত) নির্গম—ইহার প্রধান লক্ষণ। সামান্য জ্বরও প্রায় বর্তমান থাকে। ব্যাকটিরিয়া-ঘটিত আমাশয়ই বেশী গুরুতর, এমন কি মারাত্মক পর্যন্ত হয়। অ্যামিবা-ঘটিত আমাশয়ে **এমেটিন**

(emetine) ইনজেকশন ও ব্যাকৃটিরিয়া-জাত আমাশয়ে সিরাম ইনজেকশন প্রায়ই ব্যর্থ হয় না। সম্প্রতি কয়েকটি **সালফা-ড্রাগও** এই রোগে বিশেষ সাফল্যের সহিত প্রযুক্ত হইতেছে। বিরেচক হিসাবে **ক্যাষ্টর অয়েল** (castor oil) বা ম্যাগ-সালফ্ (১১৭ পৃষ্ঠা) প্রথম অবস্থায় কোষ্ঠ-পরিষ্কারক হিসাবে খাইতে দেওয়া হইয়া থাকে।

পতঙ্গ-বাহিত রোগ

ম্যালেরিয়া (malaria)—বাংলা দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা এই ব্যাধির নামের সহিত পরিচিত। malaria কথাটি mal (দূষিত), air (বায়ু) অর্থাৎ দূষিত বায়ু হইতে আসিয়াছে—কারণ এক সময় ধারণা ছিল যে দূষিত বায়ুই ম্যালেরিয়া রোগের হেতু।

রোগ সংক্রমণ—এই রোগের জীবাণু কিন্তু উপরোক্ত রোগগুলির ন্যায় **সরাসরি মানুষের দেহে প্রবেশ করিতে পারে না**; কোনও পতঙ্গের দেহ আশ্রয় করিয়া ও উহার মধ্যে পরিপুষ্ট হইয়া পরে উহার রক্ত হইতে মানুষের শরীরে প্রবিষ্ট হয়। **স্ত্রী অ্যানোফেলিস** মশা ম্যালেরিয়া-গ্রস্ত রোগীকে দংশন করিয়া রক্ত শোষণ করিবার কালে রোগীর দেহ হইতে ম্যালেরিয়ার জীবাণু মশকীর দেহে প্রবেশ করে ও সেখানে পরিণতি লাভ করে। এইবার মশকী যখন কোনও সুস্থ ব্যক্তিকে কামড়ায় তখন রক্ত শুষিয়া লইবার পূর্বে কিছু **মুখের লালা ক্ষতস্থানে ঢালিয়া দেয়** যাহাতে রক্ত জমাট বাঁধিতে না পারে। এই লালার সহিতই ম্যালেরিয়ার জীবাণু সুস্থ ব্যক্তির দেহে সংক্রমিত হয়।
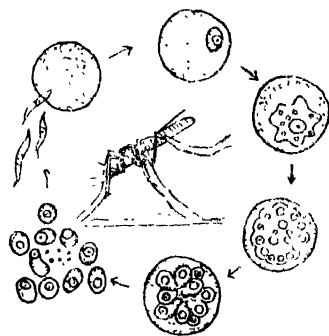
চিত্র নং ২৫৬ : প্লাসমোডিয়ম ও তাহার বাহক অ্যানোফেলিস মশকী; একটি প্লাসমোডিয়ম লোহিত রুধির-কণিকাকে ধ্বংস করিয়া এক হইতে বহু হইয়া বাহির হইতেছে

ম্যালেরিয়ার জীবাণু হইল অ্যামিবারই ন্যায় প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত একটি প্রাণী—নাম **প্লাসমোডিয়ম** (plasmodium)।

প্রতিরোধ—ম্যালেরিয়া প্রতিরোধ করিতে হইলে সর্বপ্রধান কর্তব্য হইল—মশককুল ধ্বংস করা। মশা বদ্ধ জলে ডিম পাড়ে এবং জলেই শূককীট ও মূককীট অবস্থায় কাটায়। উভয় অবস্থায় মশা উহাদের দেহ-সংলগ্ন একটি নলের খোলা মুখ জলের উপরিভাগে রাখিয়া শ্বাসকার্য চালায়। সুতরাং জলের উপর কেরোসিন ছড়াইয়া দিলে ঐ তৈল শ্বাসনালীতে ঢুকিয়া **মশকের শূককীট** বা **মূককীট** দমবন্ধ হইয়া মারা পড়ে। এ ছাড়া D. D. T. প্রভৃতি নানা কীটঘ্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে **মশক বিনাশ** করা যায়।
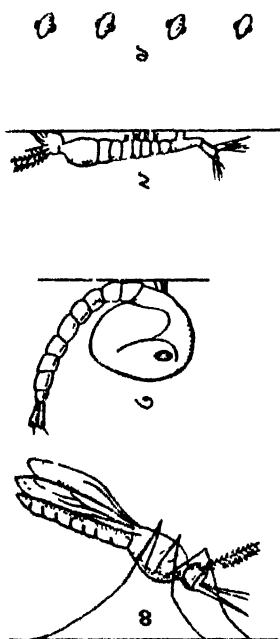
চিত্র নং ২৫৭ : অ্যানোফেলিস মশার রূপান্তর, ২, ৩– শূককীট ও মূককীটের শ্বাসনালী লক্ষ্য কর

রোগ আক্রমণ করিলে কুইনাইন, মেপাক্রিন (mepacrine), প্যালুড্রিন (paludrine) ইত্যাদি ঔষধগুলি ব্যাধি **নিরাময়ে** বা অল্প পরিমাণে নিয়মিত সেবন করিলে ব্যাধি **প্রতিরোধে** সাহায্য করে।

বর্তমানে ভারতবর্ষে উপরোক্ত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বনের ফলে দেশ হইতে ম্যালেরিয়া প্রায় বিতাড়িত হইয়াছে বলা চলে।

প্লেগ (plague)—ইহা এক বিশ্ব-বিশ্রুত, ভয়াবহ ব্যাধি। ১৪০০ খৃষ্টাব্দে ইহা ইওরোপ ও ইংলণ্ডের অর্ধেকেরও উপর জনসংখ্যা নির্মূল করিয়াছিল; ইহাই ইতিহাসে Black Death নামে প্রসিদ্ধ। এরূপ মারাত্মক ও হৃদয়ের ত্রাস-সঞ্চারক ব্যাধি আর নাই। সৌভাগ্যের কথা অধ্যাপক

হাফকিন (Prof Haffkine) আবিষ্কৃত সিরাম চিকিৎসার ফলে ইহার প্রকোপ দ্রুত হ্রাস পাইতেছে।

রোগ সংক্রমণ—কোনও অঞ্চলে প্লেগের প্রাদুর্ভাবের সূচনায় স্থানীয় ইঁদুরের মধ্যে মড়ক সৃষ্টি হইতে দেখা যায়, অর্থাৎ ইঁদুরই হইল এই ব্যাধির প্রথম আশ্রয় স্থল। পরে মাছি জাতীয় এক প্রকার পতঙ্গ (rat flea) [illegible] মশার ন্যায় পদ্ধতিতে ইহার জীবাণু ইঁদুরের রক্ত হইতে মানুষের [illegible] সংক্রমিত করে।

এই [illegible] কয়েকটি জাতি আছে—সবগুলিই মারাত্মক। **নিউবনিক** (Bubonic) [illegible] কুঁচকি ও বগলের লসীকা গ্রন্থিগুলি (১৭৬ পৃষ্ঠা) ফুলিয়া উঠে, [illegible] কম্প, মাথাব্যথা ইত্যাদি উপসর্গ-সহ অতি অল্প সময়ে রোগী [illegible] অবসন্ন হইয়া প্রাণত্যাগ করে। **নিউমোনিক** (Pneumonic) [illegible] লক্ষণাদি নিউমোনিয়ারই ন্যায় তবে আরও প্রচণ্ড, অর্থাৎ [illegible] বেদনা ও রক্তমিশ্রিত শ্লেষ্মা-উদ্গারী কাশি প্রভৃতি। ইহার [illegible] নিউমোনিয়ার ন্যায় সরাসরি বায়ুর মাধ্যমে রোগীর দেহ-নিঃসৃত [illegible] পদার্থ হইতে সংক্রামিত হয়।

[illegible] **প্রতিরোধের উপায়** হিসাবে ইঁদুরকুল ধ্বংস, রোগীর সকল প্রকার [illegible] ও পরিবেশ নির্বীজন এবং সিরাম ইনজেকশনের ব্যবস্থা করা [illegible] প্রয়োজন।

ছোঁয়াচে রোগ

দাদ (**ring worm**)—ছত্রাক জাতীয় এক প্রকার সূক্ষ্মদেহী উদ্ভিদ এই [illegible] জীবাণু—ভিজা জুতা, বস্ত্র প্রভৃতিতে যে ছাতা পড়ে তাহারই সমগোত্রীয়। শরীরের এমন স্থান নাই যেখানে এই ব্যাধি আক্রমণ করে না। আক্রান্ত স্থানে **চাকা চাকা** দাগ সৃষ্টি হয় (এজন্যই ring—আংটি, worm নাম) এবং প্রবল, দুর্দমনীয় চুলকানি রোগীকে অস্থির করিয়া তোলে, স্বস্তি-শান্তি ও নিদ্রা বিদায় লয়, ফলে রোগী হীনস্বাস্থ্য হইয়া পড়ে।

নানাপ্রকার মলম অ্যান্টিবায়টিক ঔষধ, রঞ্জন-রশ্মি (X-rays) প্রভৃতি

দাদের চিকিৎসায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সকলের উপরে অবশ্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত প্রয়োজন।
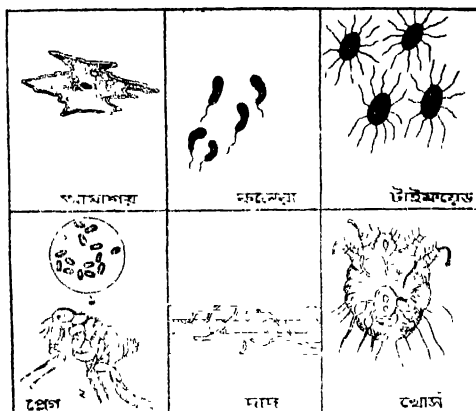
চিত্র নং ২৫৮ : বিভিন্ন রোগ-উৎপাদনকারী সূক্ষ্মদেহী উদ্ভিদ ও প্রাণী ; (কোনগুলি উদ্ভিদ বল); প্লেগবাহী পতঙ্গটিকেও লক্ষ্য কর

খোস-পাঁচড়া—উকুন জাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র **কীট** (mite) এই নোংরা ব্যাধির উৎপত্তির কারণ। চেষ্টা করিলে ইহাদের খালি চোখেও দেখা যায়। ইহারা ত্বকের নীচে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সুড়ঙ্গ করিয়া উহার মধ্যে বাসা বাঁধে এবং ডিম পাড়ে। ডিম হইতে নূতন কীট জন্মিয়া আবার চর্মকে প্রবলভাবে আক্রমণ করে এবং তখন চর্মের উপরিভাগ ফুসকুড়িতে ভরিয়া যায়। পরে ক্রমাগত চুলকানির ফলে ক্ষত সৃষ্টি হয় এবং বায়ুর মধ্যস্থ অন্যান্য জীবাণুও আক্রমণে যোগ দিয়া ক্ষতস্থান রস ও পুঁজে ভরিয়া ফেলে।

খোসের চিকিৎসায় গন্ধক-ঘটিত ও অন্যান্য নানা প্রকার মলম ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু একটি কথা মনে রাখিতে হইবে : শরীরের যে কোনও স্থানে এই কীট থাকিলে উহা পুনরায় ব্যাধি সৃষ্টি করিবে। তাই পূর্ণ আরোগ্যলাভের জন্য কয়েক প্রকার প্রলেপ সারা অঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ লেপন করিয়া রাখিয়া পরে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবার নির্দেশ দেওয়া হয়।

SYLLABUS IN GENERAL SCIENCE

Class—IX

Objective : To provide an elementary scientific classification and interpretation of some everyday phenomen

COURSE CONTENTS	DEMONSTRATION AND EXPERIMENTS
A. MECHANICS	
1. What makes work hard ; Weight, friction, intertia.	
2. General notion of gravitation, Newton's Law of attraction. Simple explanation of movement of moon and of artificial Satellites, Simple explanation of tides.	
3. Simple machine to make work easier . inclined plane, pulleys (simple pulleys).	Demonstration and experiments with inclined plane and pulleys.
B. LIGHT	
1. Light travels in a straight line , shadows ; eclipses.	Construction of a pinhole camera.
2. Light travel with finite velocity (Simple statement) ; Light from the sun takes 8 mins. to reach us. Light travels faster than sound. Lightning is seen before thunder is heard.	
3. Reflection of light at plane and spherical mirrors ; convex and	Construction of a periscope. Formation of images by mirrors.

	concave (focus and focal length). Real and virtual images (no mathematical formulae).	
4.	Refraction ; convex lens. Focus and focal length (no mathematical formulae).	Experiments on refraction through glass and water. Formation of images by lenses.
5.	The eye as a lens (simple explanation).	Demonstration of principal parts of telescope and of simple and compound microscope. Demonstration of model of an eye.
6.	The Prism, dispersion of colours.	Use of prism to show formatation of specuum.
	C. HEAT	
1.	Main sources of heat ; Sun, mechanical action (friction), chemical reactions (burning of fuels), electricity.	
2.	Effects of heat : Expansion of solids liquids, gases, (examples and applications), land and sea breezes.	Ball and ring experiment. Expansion of different metals, of liquid and gases.
3.	Heat and Temperature : Thermometers : fixed points and scale ; maximum and minimum thermometer ; clinical thermometer.	
4.	Change of state : Melting, freezing ; evaporation, boiling, condensation ; heat is required for melting and evaporation.	Melting and boiling points of different substances ; preparation of ice by rapid evaporation of ether.

5. How heat travels; conduction (clothing and body covering), convection (heating and ventilation), Radiation	Conduction experiments; Convection of liquids and gases.
D CHEMICAL REACTIONS	
1. Acids, bases and salts (to be treated mainly by examples).	Hydrochloric, sulphuric, nitric and carbonic acids; caustic potash, caustic soda and barium hydroxide; common salt.
2. Chemical composition and principal uses of common salt, sodium carbonate, caustic soda Hpdrochloric acid	
3 Nitrogen Cycle and Nitrogen compounds in agriculture Fertilisers—Ammonium sulphate and Nitrates: Bacterial action nodules of leguminous plants · crop-rotation.	
4. Lime and its products, Chalk; Lime-burning; quick lime and slaked lime.	Action of water on quick lime, action of carbondioxide on lime water.
5. Hard water and soft water—methods of softening water.	Use of soaps in different kinds of water before and after boiling).
E. LIVING BEINGS	
1. Outline of internal and external structure of toad or frog and of commou fish.	Demonstration of principal sttucture by dissection.

F. THE HUMAN BODY

	Topic	Activity
1.	Human blood ; the blood circulation, pumping action of the heart ; arteries; capillaries ; veins ; -feeling of pulse ; red and white corpuscles.	Charts on blood circulation. Demonstration of first-aid in case of bleeding including use of tourniquet.
2.	Digestive system of man ; mouth ; teeth ; tongue , gullet ; stomach ; small intestine ; pancreas ; liver. Action of enzymes in aiding digestion.	Charts on digestive system.
3.	Food ; source of energy for Man ; our food needs balanced diet (protein, fat, carbohydrate, salt, water, vitamin, roughage).	

CLASS X

Objective : Same as in Class IX

A. SOUND

	Topic	Activity
1.	Producation by a vibrating body.	Vibrating tuning fork : sonometer ; working of sound box of gramophone.
2.	Material medium necessary for transmission of sound.	Demonstration with vacum pump and bell.
3.	Reflection, echoes	
4.	How we hear ; the human ear.	Demonstration of model of the ear.

B. ELECTRICITY

	Topic	Activity
1.	Electric current and voltaic cell ; idea of electric potential (compare with waterfall) ;	Working of simple voltaic cell.

2.	Effects of electric current ; magnetic, heating, chemical ; Electric bell.	Construction of electro-magnet, assembling an electric bell ; electrolysis.
3.	Idea of intensity (like flow of water per unit time : some thing pushed). Idea of resistance (compare flow of water through pipe ; pipe offers resistance to flow).	
4.	Interaction of electricity and magnetism.	Simple experiments to show action of magnet on current and current on magnet.
5.	Electromagnetic induction (Faraday).	Experiments on electro-magnetic induction.
6.	Daniel Cell, Leclanche Cell and Lead accumulators ; (no explanation of chemical reaction required).	Handling of Daniel cell and Leclanche cell (dry and wet) and lead accumulator.
7.	Electricity as energy ; Motors, Heating and lighting ; Electric lamps.	Working models ; handling ; an electric iron, stove and heater ; study of a fan regulator.
8.	Electricity for communication . telegraph, telephone.	Model of telegraph.
	C. METALS	
1.	Study of the natural occurrence and properties and uses of the following metals and alloys : iron, copper, aluminium, zinc, steel, brass, bell-metal. (Details of methods of extraction not required)	

D. LIVING BEINGS	
1. Elementary idea about structure and life history of amoeba, spirogyra (algae), yeast and ferm.	Demonstration by charts and specimens.
E. GENERAL IDEAS ABOUT :	
1. (a) Evolution, (b) Heredity (c) Adaptation	Demonstration by charts.
F. COMMON DISEASES AND EPIDEMICS	
Brief and elementary statement of main symptoms causes, treatment and prevention in each case.	Demonstrtion by charts
(i) Air-borne diseases . common cold, influenza	
(ii) Water-borne diseases cholera, typhoid, dysentery.	
(iii) Insect-borne diseases Malaria, plague.	
(iv) Diseases by contact , Ring worm, scabies	